ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সম্পাদনা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বিমলকুমার ঘোষ

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ নেতাজী সুভাষ রোড
হাওড়া ৪

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ" গ্রন্থের লেখক
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের জীবনে ও সৃষ্টিতে
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ব্যাপক সংক্রমণের
ইতিহাস রচনা করেছেন।
গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণায় তিনি এখন ব্রতী।
তাঁর সাধনাতুল্য প্রয়াসকে আমরা গ্রন্থ সম্পাদনাকালে
গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি।

নিবেদন

গিরিশচন্দ্রের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের সেই অংশটিকে স্পর্শ করেছিলেন যার সম্বন্ধে বলা যায়—উপভোগ্য এবং ঘৃণ্য। রামকৃষ্ণের লোকপাবন ব্যক্তিত্বের অসংশয়িত প্রমাণ এখানেই মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনীপাঠকেরা অল্পবিস্তর এসব কথা জানেন তবু আমরা মনে করেছি—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সঙ্গে গিরিশের সম্পর্ক বিষয়ে সংবাদগুলি একত্র সংগৃহীত থাকা প্রয়োজন। আমরা যথাসাধ্য সে চেষ্টা এই গ্রন্থে করেছি। এই গ্রন্থে অধ্যাত্মরসিকেরা যেমন আস্বাদ্য বস্তু পাবেন, তেমনি গিরিশ-সাহিত্যের আলোচকরা জানবেন—কোন রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দকে গিরিশ তার নাটকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সংগ্রহকালে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মায়া বসু ও শ্রীমতী অনিতা কর। এঁদের ধন্যবাদ। হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম গ্রন্থাগার এই কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বিমলকুমার ঘোষ

সূচীপত্র

ভূ মি কা

গিরিশচন্দ্র ঘোষের বহির্গত ও অন্তর্গত জীবন

বার্তা 'চৈতন্য হোক !'

নির্মল আকাশপটে ধ্রুবতাবাব মতো জ্বলছে একটি আশীর্বাদ—'চৈতন্য হোক !' চৈতন্য দিতে রামকৃষ্ণ 'কল্পতরু !' 'চৈতন্য হোক'—তাঁর এই উচ্চাবণ ভেঙে দিয়েছিল ভক্তি ও জ্ঞানের সীমাবেখা। ভক্তিব শেষ কথা চৈতন্য, জ্ঞানের শেষ কথা চৈতন্য, প্রেমেব শেষ কথা চৈতন্য।

গভীব আনন্দেব সঙ্গে বর্তমান সংকলন পাঠকসমাজে উপস্থিত কবাব কালে সূচনাতেই বলে নিতে পাবি—এই গ্রন্থেব সর্বাংশে ধ্বনিত একটি বার্তা—চৈতন্য হোক। চৈতন্যেব সন্ধান ও তাব প্রাপ্তিব কাহিনীই এতে লিখিত আছে। এব মধ্যে পাওয়া যাবে সেই পুরুষকে—যিনি চৈতন্য দানে আবিভূর্ত, পাওয়া যাবে সেই পুরুষকেও—যিনি গহনতম অন্ধকারের মধ্যে আলোকচৈতন্যেব জন্য সংগ্রাম কবে গেছেন। বামকৃষ্ণ এবং গিবিশ।

গিবিশ—জগাই মাধাই ?

গ্রন্থ সম্পাদনাসূত্রে গিবিশচন্দ্র ঘোষেব জীবন, সাধনা ও সৃষ্টিব বিশেষ অনুধাবনেব সময়ে, তাঁব সম্পর্কে একটি ঘোব অবিচারেব বিষয়ে ক্রমেই অধিকতব সচেতন হযে উঠেছি। রামকৃষ্ণ লীলায় গিরিশ ঘোষ নাকি জগাই-মাধাই! রামকৃষ্ণ-সাহিত্যেব সর্বত্রই এই কথাটি লিখিত আছে। গিবিশেব বামকৃষ্ণ-পূর্ব জীবনের উচ্ছৃংখলতা ও পানাসক্তি, এবং রামকৃষ্ণ উত্তর জীবনে ক্রমপাবিবর্তন, যা শেষ-পর্যন্ত অপূর্ব রূপান্তবে পর্যবসিত—এই তুলনাব কাবণ। শ্রীবামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে সাধারণভাবে ঐ কথাটা বলেছিলেন, আব সেটাকে ভক্তবৃন্দ প্রচন্ড ভঙ্গিতে আঁকড়ে ধবে বহুভাবে তাব সত্যতা প্রমাণ করাব চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছেন। তাঁরা মনে করেছেন গিরিশেব পতনেব কথা যত বিশদীকৃত করা হবে ততই বৃহত্তীকৃত রূপ ধববে গিবিশকে উদ্ধারের জন্য বামকৃষ্ণেব পাবনশক্তির আকার। কিন্তু অনেকেই ভেবে দেখেন নি—ঐ তুলনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাটত্বকে আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বাড়ায়নি। অথচ গিরিশ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের বিরাটত্ব কল্পনাতীত। চৈতন্যজীবনী থেকে আমরা জেনেছি—জগাই মাধাই নিতান্ত বর্বর লম্পট ছাড়া কিছু নয়, শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকদুটির মধ্যে বঙ্গজাতির গুরুত্ব ভিন্ন আর কোনো গুরুত্ব ছিল না। ব্রাহ্মণবংশজাত তারা, অধিকন্তু চুরি ডাকাতি, মারপিট, গৃহদাহ

ইত্যাদিতে সদর নিমন্ত্রণ। উল্টোপক্ষে গিরিশ সমকালীন বাংলার এক প্রধান পুরুষ, শক্তিতে ও সৃষ্টিতে অসাধারণ—যুগের উদ্দীপ্ত রূপের অন্যতম প্রতিভূ। গিরিশ নিজেই চৈতন্যলীলায় জগাই-মাধাইকে এঁকেছেন। প্রশ্ন করা যায়—তাদের সঙ্গে নিজের কতটুকু মিল তিনি দেখতে পেয়েছিলেন? নহে নহে। বৈষ্ণব ঐতিহ্যের গুহেন দুটি আকাট বিকট মানুষের প্রতিরূপ গিরিশ কদাপি হতে পারেন না। তাই বলে গিরিশের মধ্যে জগাই-মাধাইয়ের অবস্থিতি ছিল না, একথা মোটেই বলছি না। সেটা কি অদ্ভুত কিছু যখন জানি অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই ওঁরা বর্তমান—হয়তো অল্পাকারে, মার্জিত ও ভীরু প্রকারে। এক্ষেত্রে ভীরু ও সাহসীর পার্থক্য হল এক রূপে দেখি, গলায় ঢকঢক ঢেলে বাসনার থাবার ঝাপট—অন্য রূপে, মৃদু মৃদু পানরসে জড়িত কণ্ঠে লালসার আবেদন। গিরিশ পুরুষ ছিলেন, কাপুরুষ নন। যখন চেয়েছেন—চেয়েছেন প্রবলভাবে। তাঁর কণ্ঠস্বরে অস্পষ্টতা ছিল না। তাঁর অবিশ্বাসের কথা জেনেছি তাঁরই উদ্ধত কণ্ঠ থেকে। আবার তাঁর বিশ্বাসের ঘোষণা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাঁর বুকভাঙা কণ্ঠের আর্তনাদে।

কেবল ভক্তগণই গিরিশের মর্যাদানাশ করেন নি স্বয়ং গিরিশও তা যথাসাধ্য করেছেন—নিজেই নিজেকে বারবার জগাই-মাধাই আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আত্মনিন্দা—আধ্যাত্মিক আত্মপীড়ন ছাড়া কিছু নয়। এসব ক্ষেত্রে মানুষ নিজ পাপের ঘোষণার উত্তেজনায় থাকে। এখানে এইটুকু স্মরণ রাখলে ভালো হয়—পাপবোধ এবং পাপকার্যের পরিমাণ সমানুপাতিক হয় না। অসাড় অনুভূতিহীন মানুষ অজস্র কুকীর্তির মধ্যেও নির্বিকার থাকতে পারে, আবার স্পর্শকাতর মানুষ সামান্য অন্যায়কে বিস্তারিত দেখে। ভুললে চলবে না—গিরিশ ছিলেন স্পর্শকাতর প্রতিভাবান শিল্পী। তাই তিনি যত উচ্চকণ্ঠে নিজ পাপের ঘোষণায় ব্যাপৃত, ততখানি পাপগ্রস্ত ছিলেন কিনা সন্দেহ। অথচ আমরা সরল আনন্দে তাঁর পাপ-ঘোষণাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি।

গিরিশ যখন তাঁর স্খলিত জীবনের পথে জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে চলেছিলেন, তখনি তিনি অনুভব করেছেন—কোনো এক অকরুণ নিয়তি তাঁকে এই অনুচিত জীবনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। রামকৃষ্ণের উদ্দেশে দৈবাহত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গিরিশ বলেছেন এ কি নিষ্ঠুরতা তোমার! কেন কেবলই আমাকে যুগে-যুগে তোমার লীলায় জগাই-মাধাইয়ের ভূমিকায় নামতে হবে! এখানেও গিরিশ অর্ধসত্যকেই প্রকাশ করেছেন। তিনি বুঝতে পারেন নি গিরিশরূপী জগাই-মাধাই নিজের মধ্যে প্রকাশানন্দ, সার্বভৌমকে অংশতঃ পুরে নিয়েছিলেন, নিত্যানন্দের উদ্বুদ্ধ উদ্ধারের প্রেরণাতেও কম্পিত ছিলেন। জগাই-মাধাইয়ের ক্ষীণ আচ্ছাদনের অন্তরালে নবচেতনায় উদ্দীপ্ত কিন্তু প্রকাণ্ডভাবে বিদ্রোহী

যে মানুষটি বর্তমান ছিলেন—শক্তিধর ও সৃষ্টিশীল—তাঁরাই [illegible] মূর্তিতে ধরেছিলেন। রামকৃষ্ণ তুচ্ছ একটা পথহারা মানুষকে উত্তোলন [illegible] কীর্তিনাশাকে পুণ্যস্রোতা সাগরবাহিনী করেছিলেন—সেই তাঁর শক্তির মহিমা।

গিরিশের প্রথম জীবন উজ্জ্বল দিনগুলি

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকার উপরে এখানে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র যে-কালে সক্রিয় ছিলেন, তখন কলকাতা ছিল বাংলার রাজধানী, ভারতেরও রাজধানী—এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত এই প্রদেশ "ভারতের এথেন্স" নামে কথিত। ভারতে তখন নবচেতনার ধারা বইতে শুরু করেছে—কলকাতাই ছিল তার উৎস।

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১২৫০ সালের ১৫ ফাল্গুন সোমবার, শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে) গিরিশের জন্ম। পিতা সম্ভ্রান্ত কায়স্থ নীলকমল ঘোষ, মাতা রাইমণি। বাল্যে সেকালের অনেক বালকের মতোই গিরিশ [খুল্ল-] পিতামহীর কাছে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণকথা শুনেছেন। কথকদের মুখেও শুনেছেন কথকতা বৈষ্ণব ভিখারীদের মুখে ভক্তির গান। সে-সকল কল্পনাপ্রবণ বালককে মোহিত করেছিল। অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় সেগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

গিরিশের এগারো বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে গিরিশের বাল্যশিক্ষা। সেখানে দু'বছর পড়েন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন, "গিরিশবাবু যে, একটা জিনিয়াস, আমার ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ধারণা ছিল।"[১] গিরিশ তারপর পড়েন হেয়ার স্কুলে। এরই মধ্যে গিরিশের ১৪ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা উপযুক্ত সংস্থান রেখে গিয়েছিলেন বলে অবশ্য আর্থিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন নি। জ্যেষ্ঠা বিধবা-দিদি কৃষ্ণভাবিনী গিরিশের অভিভাবিকা হন। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশের বিয়ে দিয়ে দেন —গিরিশের বয়স তখন ১৫। শ্যামপুকুরের নবীনচন্দ্র দেব-সরকারের কন্যা প্রমোদিনী গিরিশের বধূ। হেয়ার স্কুল ছেড়ে গিরিশ এর পরে ফিরে আসেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, ফেল করেন, পড়াশোনায় মতি ছিল না বলে। সেখানেই বিদ্যালয়গত শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি।

---

১ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিরিশচন্দ্র', পৃ ২২।

অধ্যাপক স্বপন মজুমদার-সম্পাদিত অবিনাশচন্দ্রের এই গিরিশ-জীবনী থেকেই জীবনী-ঘটিত অধিকাংশ সংবাদ আমি সংগ্রহ করেছি। যেখানে বিশেষভাবে অন্য সূত্রের উল্লেখ না থাকবে সেখানে ধরে নিতে হবে—সংবাদ-উৎস অবিনাশচন্দ্রের গ্রন্থ।

শিক্ষায় সমাপ্তি অবশ্য হয়নি। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল, কবিতা রচনা শুরু করেন। গণ্যমান্য ধনীসমাজ দীনবেশী ঈশ্বর গুপ্তের খাতির দেখে কবি হবার বাসনা জেগেছিল। ইংরাজিচর্চাও করতে থাকেন। বিয়ের যৌতুকের টাকায় ইংরাজি বই কিনেছিলেন। ইংরাজি কবিতার অনুবাদে হাত দেন। মাতুল নবীন কৃষ্ণ বসু ছিলেন প্রদীপ্ত ছাত্র এবং মেধাবী পণ্ডিত, তাঁর সান্নিধ্য গিরিশের চিন্তা-শক্তি ও তর্কশক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়। [পরবর্তীকালে গিরিশকে অসাধারণ তার্কিক হিসাবে দেখা গেছে, কথামৃতের সংকলিত অংশে তার কিছু পরিচয় পাঠক পাবেন।]

গিরিশের সংসারে দিদির অভিভাবকত্ব ছিল—এবং নারীর অভিভাবকত্বকে অগ্রাহ্য করার মতো পুরুষাভিমানও গিরিশের ছিল। দ্রুত বয়ে গেলেন। ব্যাপারটা মারাত্মক দেখে তাঁর শ্বশুর মহাশয় তাঁকে অ্যাটকিনসন টিলটন কোম্পানিতে বুক কিপারের কাজ ঢুকিয়ে দেন। গিরিশ কিছুটা প্রশমিত হলেন, কিন্তু সর্বাংশে নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সাংসারিকতার সহাবস্থান ঘটিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

নায়কের আবির্ভাব

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, গিরিশের বয়স যখন ২৫, তখন তাঁকে এমন একটি ভূমিকায় দেখা গেল—যা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর জন্য বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের একাংশে তাঁকে নায়কত্ব দান করবে। প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ঐ বৎসর শারদীয়া পূজার রাত্রে, দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র থিয়েটার-অভিনয়ে গিরিশ নামলেন—নিমে দত্তের ভূমিকায়। সে ঘটনা যুগসৃষ্টিকারী। নমস্কার করে অমৃতলাল বলেছেন

মদমত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।"

নাটকের ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য কারণ ঐ ভাবেই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সিংহাসনে অর্ধশতাব্দীকালের সম্রাটের আরোহণ ঘটেছিল।

এই ঘটনার বছরখানেক আগেই গিরিশ অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সেকালে অভিনয় ব্যাপারটি ছিল প্রধানতঃ ধনীদের প্রমোদসহায়। ধনী-গৃহে তখন নানা ধরনের অভিনয় হত সেখানে সাধারণের সহজ প্রবেশ ছিল না। বাগবাজারের কিছু বঞ্চিত ক্ষুব্ধ যুবক গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৮৬৭ সালে একটি শখের যাত্রাদল খুলে বসেন (যাত্রা করায় খরচ কম বলে), তাঁরা মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'কে যাত্রায় নামান, তার জন্য গিরিশ গান বেঁধেছেন—বাংলা নাট্য জগতে লেখক হিসাবে সেই তাঁর প্রথম সংযোগ। গিরিশ ঐ পালায় অভিনয়ও

করেছিলেন। কিন্তু অতৃপ্ত ছিলেন কারণ ওটা থিয়েটার ছিল না। অথচ সঙ্গতিহীন যুবকেরা থিয়েটার করবে কি করে, বিশেষতঃ তা যদি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের মতো ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়। মুশকিল আসান গিরিশই করলেন—দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীকে নির্বাচন ক'রে—যে সামাজিক বইটির অভিনয়ে সজ্জাবাহুল্য নেই বলে খরচ অল্পই হবে। গিরিশ ঐ নাটকের জন্য গান লিখলেন, অভিনয় শেখালেন, (তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি) স্বয়ং অভিনয় করলেন। দেওয়ান রামপ্রসাদ মিত্রের শ্যামবাজারের বাড়িতে বইটির চতুর্থ অভিনয়ে উপস্থিত দীনবন্ধু অভিনয়শেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন "তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনয় হত না। নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্য লেখা হয়েছিল।" ঐ দিন অভিনয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত বিচারপতি ও সাহিত্যরসিক সারদাচরণ মিত্র। তিনি বহুদিন পরে বিস্ময়স্মৃতি নিবেদন করেছেন এই বলে "বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব। ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধহয় কখনো ভুলিব না।" গিরিশের দেহান্তের পরে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সুবিখ্যাত বেঙ্গলী কাগজ উক্ত "অননুকরণীয় অভিনয়ের" উল্লেখ ক'রে বলেছিল "পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, তিনি—অভিনেতা।"

ইতিহাসের চাকা তারপর দ্রুত ঘুরতে লাগল। সধবার একাদশী অভিনয়-করা এই দলটি (যাদের মধ্যে সুবিখ্যাত অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন), গোড়ায় নাম নিয়েছিল বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার। সে নামে আটকে না থেকে তারা পরমোৎসাহে নতুন নাম নিয়ে ফেলল—"দি ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল থিয়েটার" (পরে "ক্যালকাটা" শব্দ বর্জিত হয়)—যখন তারা নামাল দীনবন্ধুর লীলাবতী। এতেও গিরিশ গান বাঁধলেন, অভিনয় করলেন। অভিনয়শেষে দর্শকাসন থেকে উঠে এলেন দীনবন্ধু —গিরিশকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন "এবার [বঙ্কিমকে] চিঠি লিখবো—দুয়ো বঙ্কিম!" এমন বলার কারণ—এর আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ার একটি দল লীলাবতী অভিনয় করে কিছু নাম কুড়িয়েছিল। দীনবন্ধু সে অভিনয় দেখেছিলেন। এখন গিরিশের দলের অভিনয় দেখে দীনবন্ধুর মনে হল, ওটা তুচ্ছ ব্যাপার। এমনকি তুলনায় ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ও মার খেল কিছু বিদ্বজ্জনের চোখে। "সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কানাইলাল দে" গিরিশাদির অভিনয়ের উল্লেখ করে ঠাকুরবাড়িতে বলে আসেন "আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা।"

এরপর দলটি উদ্যোগী হলো দীনবন্ধুর নীলদর্পণ অভিনয়ে। গিরিশই প্রধানাংশে নাট্যশিক্ষা দিলেন। (অর্ধেন্দুশেখরও শেখালেন)। বইটি নামাবার আগে

কিন্তু গিরিশের সঙ্গে দলের মতভেদ হয়ে গেল। দল বলল, টিকেট বিক্রয় করে অভিনয় করা হবে। গিরিশ বললেন, ওটা করা ঠিক নয়। আমাদের নাটকের এই দীন সজ্জা, নামটি আবার বৃহৎ—ন্যাশন্যাল থিয়েটার। এর উপর যদি টিকেট বিক্রয় করা হয় তাহলে লজ্জার শেষ থাকবে না। বিশেষতঃ যদি বিদেশী কেউ বাংলার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এসে হাজির হয়, এবং এই চেহারা দ্যাখে—সে হেসে অস্থির হবে। দল কিন্তু নেতার কথা শুনল না। সুতরাং গিরিশ বিদায় নিলেন। দু'মাস পরে অবশ্য ফিরে এলেন "বিশিষ্ট অপেশাদারু" হিসাবে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে "গিরিশ যুগ।"

সাধারণ রঙ্গালয়ের সেই "গিরিশ যুগের" কাহিনী বলা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল গিরিশচন্দ্রের দানের সর্বাঙ্গীণতার দিকে সংক্ষেপে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

সমকালের প্রধান অভিনেতা

প্রথমত এই পর্বে তিনি রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রধান অভিনেতা। সমকালে অর্ধেন্দু শেখর-সহ বহু অসাধারণ অভিনেতা (এবং অভিনেত্রী) পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছেন কিন্তু গিরিশই নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র। একথা ডা দেবীপদ ভট্টাচার্যের মতো সতর্ক লেখকও স্বীকার করেছেন।[২] গিরিশ উত্তর যুগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ি গিরিশকে তাঁর জীবনের উপান্তে মঞ্চে দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন "গিরিশবাবুর কিন্তু তুলনা হয় না। একবার Combined night এ 'ভ্রান্তি' দেখেছিলুম—রঙ্গলাল গিরিশবাবু। দেখে মনে হয়েছিল Girish Babu first and everybody else nowhere"[৩]

যেখানে শিশিরকুমারের মতো সর্বোচ্চস্তরের অভিনেতা, অসামান্য যাঁর বিদ্যা বৈদগ্ধ্য, এমন কথা বলেন, সেখানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত সংকলন বাহুল্য, তবু নাট্যকার ডি এল রায় কিংবা কবি নবীন সেনের মুগ্ধতার উল্লেখও করতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশের করুণাময় ভূমিকায় অভিনয় দেখে বলেছিলেন, 'তুলনা হয় না।' 'পাণ্ডব গৌরবে' তাঁর কঞ্চুকীর ভূমিকা দেখে নবীন সেন বলেছেন, 'গিরিশের আমরা গোলাম হইয়া রহিলাম।' গিরিশের প্রথমজীবনে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহ ভূমিকায় তাকে দেখে স্বয়ং মধুসূদন 'অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া গিরিশবাবুর নাট্যপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন।'

অভিনেতা গিরিশ প্রায় সর্বদাই সংবাদপত্রে সর্বোচ্চ প্রশংসার পাত্র। দক্ষযজ্ঞ

২। গিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১।
৩। ঐ পৃঃ ২৪-২৫।

নাটকে দক্ষ ভূমিকায় গিরিশের অতুলনীয় অভিনয় সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মিরার বলেছিল "His impersonation, was to a apply the remarks of Victor Hugo on Lamaitre's Ruy Blass, 'not a transformation, but a transfiguration'[৪] হিন্দু পেট্রিয়ট গিরিশের দ্বারা অনূদিত ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁকে 'Father of the modern stage of Bengal' এই অভিধায় ভূষিত করার পরে বলেছিল—যেখানে তিনি নাট্য পরিচালনা করেছেন, মঞ্চসজ্জা তাঁর নির্দেশে হয়েছে, পোশাক-পরিচ্ছদও তাই, সেখানে সাফল্য অবধারিত, বিশেষত যখন 'বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।'[৫] গিরিশ যখন ম্যাকবেথ করেন তখন তাঁর বয়স ৪৯। আর 'ছত্রপতি শিবাজী'তে যখন আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় নামেন তখন বয়স ৬৩। তখনও অভিনয় দেখে বঙ্গবাসী লিখেছিল 'তাঁহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ডলে।'

পিছিয়ে যাই গিরিশের প্রবল প্রতিভার দিনগুলিতে। তেমনি একদিনে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিজের হাতে গড়া শিষ্য, শক্তিশালী অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ ভূমিকা নিয়ে। স্টারে ঐ ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্রকে দেখে লোকের মনে হয়েছিল, 'এমন যোগেশ অমৃতবাবু ভিন্ন আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই।' কয়েক বৎসর ধরে তাঁর সেই দাবি নিয়ে তর্ক ছিল না। তারপর মিনার্ভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় প্রফুল্ল নামাবার আয়োজন শুরু হল—যোগেশের ভূমিকা পেলেন 'ট্রাজেডিয়ান' মহেন্দ্রলাল বসু। এই সংবাদ এক বহির্গত নূতন নাটকের সূচনা করল। অমৃতলাল গিরিশের উদ্দেশ্যে ভক্তির বাণ ছুড়ে বললেন, 'তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।' এবার ভয় পেয়ে গেলেন মহেন্দ্র বসু, তিনি 'বুড়ো বয়সে অমৃতের কাছে হেরে' যেতে রাজী হলেন না। অগত্যা গিরিশকে নামতে হল যোগেশের পার্টে। অমৃতলাল এবার কিন্তু জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত থাকতে পারলেন না। বললেন 'যদি হারি, গুরুর কাছেই তো হারব, তাতে গৌরবই অধিক।' এবং তিনি—হারলেন। প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাংলা অভিনয়-আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠা রচনা করেছেন—উভয়ের যোগেশ ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনায়।—''গিরিশচন্দ্র যোগেশ সাজিয়া যে-দৃশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন, মনে হইত যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। মনে হইত, রঙ্গমঞ্চের উপর কী যেন একটা হইয়া গেল—যাহা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের স্পন্দন আপনি দ্রুততর তালে নাচিতেছে, সহজ নিঃশ্বাস মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাসে

৪। গিরিশ রচনাবলী, ২য়, পৃঃ ২২।
৫। ঐ, ৪র্থ, পৃঃ ৩১।

পরিণত হইয়াছে, কণ্ঠ কখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, চক্ষে অবিরল জলধারা, জ্ঞান ও চৈতন্য যেন কোনো অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে 'মরছ মরো, আমিই তোমার লাথি মেরে—মেরে ফেলেছি'—সমস্ত বিয়োগান্ত নাটক যেন এই কয়টি অক্ষরের ছাঁদে মূর্তি লইয়া দর্শকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তারপর 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি। [সে অভিনয়] মৃত্যুদিন পর্যন্ত মনে থাকিবে। এ বিচিত্র অভিনয়প্রবাহে অমৃতলাল ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা অমৃতলালের গৌরব, কারণ গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিলে এ পর্যন্ত অমৃতলালের মতো যোগেশ আর দ্বিতীয় দেখি নাই।"[৬]

গিরিশচন্দ্রের জীবনাবসানও কার্যতঃ অভিনয় করেই হয়। রঙ্গমঞ্চে দর্শকই দেবতা, যাদের তুষ্টি করতে হয় অভিনেতাদের দেহ-নিংড়ানো রসের পাত্র তুলে ধরে। গিরিশের শেষ অভিনয় মিনার্ভা থিয়েটারে, ৩০ আষাঢ়, ১৩১৮, বলিদান নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায়। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, তা সত্ত্বেও বেশ-কিছু দর্শক এসেছিল গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখার জন্য। থিয়েটারের মালিক মহেন্দ্রবাবু ভগ্নস্বাস্থ্য গিরিশকে নামতে নিষেধ করলেন, কারণ তাঁকে এই ভূমিকায় প্রায়ই নামতে হবে নগ্নগাত্রে। গিরিশ তখন দারুণ হাঁপানিতে ভুগছেন। ভীষণ দুর্যোগে মুষলধারায় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন'—গিরিশ উত্তরে বলেন—'আমি তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিব না ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহার আর উপায় কি?' স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল—যা শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। নটরাজ তাঁর রাজ্যপাট রাখতে আত্মবলি দিয়েছিলেন।

গিরিশের অভিনয়প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সেকালের মানুষ তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান জানাবার বাসনায় তুলনীয় নাম সন্ধান ক'রে, ইংলণ্ডের অভিনয়জগতের প্রবাদ-পুরুষ 'গ্যারিক' শব্দটি পেয়ে গিয়ে, সেটি গিরিশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। আবেগে বলা হত, তিনি বঙ্গের গ্যারিক। এই অভিধাটি নাকি গিরিশকে প্রথম দেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (ড দেবীপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন), 'সাধারণী' পত্রিকায় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮, গিরিশের 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের আলোচনাকালে। উক্ত অভিনয়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে প্রাজ্ঞ লেখক মন্তব্য করেন 'ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনো গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।'[৭] অক্ষয় সরকার গিরিশের অভিনয়ে ক্ষেত্রবিশেষে 'অভিনয়-

৬। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর (স্বপন মজুমদার সম্পাদিত), পৃ ৭৮-৭৯।

৭। গিরিশ রচনাবলী, ২য়, পৃ ৩০।

পট্তার চন্দ্রসীমা' দেখেছিলেন।

'বঙ্গের গ্যারিক'—এই স্বীকৃতি প্রথম পাবার সময়ে গিরিশের বয়স ৩৪। পরবর্তী কালে গিরিশের নামের সঙ্গে গ্যারিক শব্দটি প্রায় অচ্ছেদ্য হয়ে যায়, (ও-রকম বিশেষণ দেগে দেবার সুবিধা হল—ওর দ্বারা প্রতিভার বিস্তারিত ব্যাখ্যার দায় এড়ানো যায়)। যথা, অমৃতবাজারে ৩০ জুলাই, ১৮৮১, 'রাবণবধ' অভিনয়ের আলোচনায় বলা হয়েছে 'A new drama *Rabon Badh* written in verse by the 'Garric of the Hindu stage'[৮] গিরিশের জীবনের একেবারে শেষভাগেও তাঁর 'শঙ্করাচার্য' অভিনয় প্রসঙ্গে বেঙ্গলী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল (১১ মার্চ, ১৯১০) 'Our Indian Garric Girish Chandra'

গিরিশের গ্যারিক উপাধি কেবল অভিনেতা হিসাবে নয়, 'অভিনেতা শিক্ষক-পরিচালক'—এই সম্মিলিত ভূমিকার জন্যই—একথা গ্যারিকের (১৭১৭-৭৯) বিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আঠারো শতকে ইংলণ্ডের উক্ত বিখ্যাত অভিনেতা পরিচালক এমন সর্বাত্মকভাবে রঙ্গমঞ্চের সেবা করেছিলেন যে, কবি পোপ তাঁর বিষয়ে বলেন 'অতীতে ঐ তরুণের সমান কেউ ছিলনা, ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হবে এমন সম্ভাবনাও নেই।' ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'গিরিশচন্দ্র সম্পর্কেও এই একই মন্তব্য প্রযোজ্য।'[৯]

গিরিশচন্দ্র, তুলনার ঝোঁকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক হলেও গ্যারিকের অধিক। সেইজন্যই অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পূরক কাব্যছত্রটি লিখেছিলেন '[সে যে] বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের শেক্সপীয়ার।' অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র অধিকন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। প্রতিভা হিসাবে শেক্সপীয়ারের সঙ্গে একত্রে তাঁর নাম অবশ্যই উচ্চারণ করা যায় না—কিন্তু বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ভূমিকার সমরূপতার দিক দিয়ে তুলনাটি অগ্রাহ্য করা সম্ভবও নয়।

সমকালের প্রধান নাট্যকার

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে গিরিশকে নাট্যকার হতে হয়েছিল। দর্শকদের নাট্যক্ষুধা জেগেছে—অথচ উপযুক্ত নাটক নেই। গিরিশ নিজের ভিতরে দারুণ বাসনায় আলোড়িত—দিতে হবে—ঐ উৎসুক মানুষগুলির সামনে দেহপটে প্রতিবিম্বিত করতে হবে জীবনের চিত্রমালা—কিন্তু কোন বস্তু অবলম্বনে?—নাটক কই? গিরিশ সাহিত্যের মঞ্চে নামলেন। প্রথম কিছুদিন মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য বা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে চালালেন, কিন্তু তাও যখন ফুরিয়ে গেল—

৮। গিরিশ রচনাবলী, ২য়, পৃঃ ২৪।

৯। ঐ ১ম পৃঃ ১১-১২।

তখন নিজের প্রতিভাকে আকর্ষণ করে সাহিত্যে বর্ষণ করলেন—হয়ে উঠলেন নাট্যকার।

নাট্যকার হিসাবে গিরিশের অবিলম্ব সাফল্য এবং পরবর্তী সমালোচনার কারণ এখানেই নিহিত। তাঁর অন্তর্গত প্রতিভার তাগিদকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু তাঁর নাট্যরচনার সাক্ষাৎ কারণ—রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন। প্রয়োজনের দাসত্ব তাঁকে করতে হয়েছে। দর্শকদের রুচির হিসেবও নিতে হয়েছে, কারণ দর্শক প্রভুর দাক্ষিণ্যে রঙ্গমঞ্চের দেহরক্ষা, তাদের সদ্য তোষণের আয়োজন সেখানে রাখতে হয়। সেকথা মনে রেখে গিরিশ ড্রামাটিস্ট অপেক্ষা প্লে-রাইটের কাজ বেশি করেছেন। অবশ্য সব ড্রামাটিস্টকেই অংশতঃ প্লে-রাইট হতে হয় যদি তিনি মনে করেন, তাঁর নাটক অভিনীত হবার জন্য লেখা হয়েছে, কেবল পঠিত হবার জন্য নয়, কিংবা যদিনা তিনি ভেবে বসেন, অরসিক-বহিষ্কৃত ভাবীকালেই কেবল অভিনীত হবার জন্য তিনি নাটক লিখছেন!! বেদনার বিষয়, গিরিশের মধ্যে ড্রামাটিস্টের তুলনায় প্লে-রাইটের অংশ বেশি হয়ে পড়েছিল কালপ্রভাবে। তাকে দ্রুত লিখতে হয়েছে, এমনকি কলম ধরে তিনি লেখেন নি, মুখে অনর্গল বলে গেছেন, লিপিকর তা লিখে নিয়েছেন। তার দ্বারা গিরিশের অসামান্য মেধা, প্রতিভার স্বতস্ফূর্ততা, মনঃসংযোগের বিরল ক্ষমতা প্রমাণিত—কিন্তু একইসঙ্গে স্বীকার্য, কলম ধরে লিখলে লেখায় যে ধীরতার সংযম থাকে, আত্মশোধনের সক্রিয় সম্ভাবনা থাকে, তা গিরিশ নিজ লেখার ক্ষেত্রে পাননি। সাফল্যের তুঙ্গ চূড়া থেকে অন্য চূড়ায় যখন লাফ দিয়ে এগিয়েছেন, তখন পশ্চাৎদৃষ্টি সম্ভব ছিলনা। কিন্তু হায় সরস্বতী নাম্নী অভিমানিনী দেবী যে সামনে প্রণাম, পিছনে প্রণাম, উঠিতে প্রণাম বসিতে প্রণাম ভিন্ন পরিতুষ্ট হন না!!

তাই বলে নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশ ভাব ও বিষয়ের ব্যাপারে সর্বদা আপস করেছেন, এমনও সত্য নয়। দর্শকরুচি সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর বিতৃষ্ণা ছিল। তাঁর অনবদ্য-অনূদিত ম্যাকবেথ—সকল প্রকার নাট্যসম্পদ সত্ত্বেও দর্শকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণসূত্রে প্রাপ্ত গভীর অধ্যাত্মভাবনা যখন নাটকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, তখনো বিরূপ সমালোচনা হয়। 'কালাপাহাড়' ও 'মায়াবসান' তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ বলে মঞ্চমহলে কানাকানির বিষয় হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, যাকে সত্যবস্তু বলে জানেন নি, তা কখনো লেখেন নি, আর যেটুকু সত্যবস্তু তিনি নাটকে পরিবেশন করেছেন, তারও থেকে অনেক গভীর ব্যাপার তাঁর অভিজ্ঞতা পরিধির মধ্যে আছে, কিন্তু দর্শক-মনের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের কথা ভেবে তা দিতে পারেন নি। প্রশান্ত গর্বে বলেছিলেন "ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য বেশ্যা ও লম্পট হইতে জগৎপূজ্য অবতার-চরিত্র পর্যন্ত দর্শন করিয়াছি।" নাট্যকার হিসাবে সঙ্গত

স্বার্থপরতায় বলেছিলেন "যতপ্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং শ্রেষ্ঠ।" আর বলেছিলেন সাহিত্যের চরম কথাটি, যার সাধনা তিনি নিজে করেছেন : "জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তার বিড়ম্বনা—বিশেষ নাটক রচনা।" আমাদের দুঃখ এই, গিরিশ মঞ্চ-নিরপেক্ষ নাট্যকার হবার সুযোগ পেলেন না (যে দুঃখ নবীন সেন করেছেন), তিনি কলম ধরে ধীর-স্থির হয়ে বসে লিখলেন না। যদি তা করতেন তাহলে সেই নাটকগুলি হয়ত ভাবীকালে সানন্দে অভিনীত হত। অন্ততঃ গৃহীত হত গভীর অনুভূতির উৎস হিসাবে।

এতৎসত্ত্বেও এই প্লে রাইটই অন্ততঃ গোটা-দশ উত্তম নাটকের লেখক। নাটক সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার গণ্ডরজ্জুতে যদি বাঁধা না পড়ি তাহলে জনা বা পাণ্ডব গৌরবের মতো পৌরাণিক নাটক, বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব চরিত বা শঙ্করাচার্যের মতো অধ্যাত্ম নাটক, বলিদান, প্রফুল্ল, শাস্তি কি শান্তির মতো সামাজিক নাটক, সিরাজদৌলা, মীরকাশিম বা ছত্রপতি শিবাজীর মতো ঐতিহাসিক নাটকের গুণ গৌরব স্বীকার করতে দ্বিধা হবে না। যাঁরা প্রগতিশীলতার জন্য উৎকণ্ঠিত তাঁরা প্রায়শ ইতিহাসসত্য সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁরা ভুলে যান যে, কোনো নির্দিষ্ট কালে সেকালের হিসাবে শ্রেয় আদর্শকে প্রকাশ করার মধ্যে যথেষ্ট প্রগতিশীলতা থাকে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, করুণা—জীবনের এই ধরনের কতকগুলি মহৎ আদর্শকে অসামান্যভাবে প্রকাশ করেছে। সেকাজ গিরিশ করেছেন জাতীয় ভাবধারার আনুগত্য করে। ধর্মাদর্শকে যে তিনি অনেক নাটকের বিষয়বস্তু করেছিলেন তার হেতু—ধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক জনসমষ্টির জীবনসত্য। ধর্মোৎপাটনে উৎসাহী গিরিশ-বিরোধী সমালোচকেরা একথা জেনে খুশি না হতে পারেন, তবু সত্য—গিরিশ জাতীয় জীবনের উন্নতিমুখী পরিবর্তন ঘটাবার জন্যই শ্রেয় ধর্মাদর্শকে নাটকে উপস্থাপিত করেছিলেন।

গিরিশ সেখানেই থামেন নি। তৎকালীন সমাজ তার সর্ববিধ কলুষের আবর্জনা এবং অব্যাহতি কামনা নিয়ে গিরিশের নাটকে উদ্‌ঘাটিত। শুচিবাগীশ সংস্কারকেরা গিরিশকে সহ্য করতে পারেন নি, যেহেতু তিনি থিয়েটারে অভিনেত্রীরূপে বারাঙ্গনা নামিয়ে ছিলেন (কুলকন্যা বা কুলবধূদের ঐকাজে নামানো সম্ভব বা সঙ্গত মনে করেন নি বলে)। আর সেই পাপের সাক্ষাৎ দর্শন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সমাজসচেতন সম্পাদক-লেখক কিভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন তা দেখা যায় গিরিশের দেহান্তের পরে প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে। রামানন্দ লিখেছিলেন : "আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই, বাংলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারে কখনো যাই নাই।" এই ধরনের লেখা-লেখির সময়ে তিনি বা তাঁর মতবাদীরা ভাবতে ভুলে গিয়েছিলেন—অনেক সমাজ সংস্কা-

রকের অপেক্ষা গিরিশ অধিক সক্রিয় সংস্কারক। বারাঙ্গনা নিয়ে অভিনয় করাটাই একটা বিরাট সংস্কারকার্য। যাঁরা কেবল ঘৃণাবর্ষণ করেই সমাজশোধন করতে সচেষ্ট, তাঁদের উদ্দেশ্যে গিরিশ প্রশ্ন করেছিলেন, এইসব মেয়েদের তো আমি অন্ততঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে খরিদ্দার পাকড়াবার চেষ্টা থেকে সরিয়ে, মঞ্চে তুলে দিয়ে, রোজগারের একটা পথ দেখিয়েছি, কিন্তু তোমরা এদের জন্য কী করেছ? এখানে গিরিশ নিজ কার্যের পক্ষে আরও যা বলেন নি, তা আমরা যোগ করতে পারি— তিনি তাদের মধ্যে 'মানবত্ব' জাগিয়েছিলেন। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সেই মানবত্ব, গিরিশের হাতে-গড়া অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপরে অসামান্য শক্তির বিকাশ দেখিয়েছিলেন।

এইসঙ্গে স্মর্তব্য, গিরিশ তাঁর নাটকের দ্বারা ভাবভক্তির প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই চৈতন্যলীলার মধ্য দিয়ে সেকাজ শুরু করেন। সে নাটক বাংলাকে পাগল করে দিয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চৈতন্যলীলা দেখে উন্মত্তের মতো নৃত্য করেছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত মথুরানাথ কবিরত্ন নাট্যকারের পদধূলি নেবার জন্য আকুলি ব্যাকুল করেছিলেন। "যথার্থ নট ও অর্থাৎ নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্মপ্রচার হইল"—এই বিচিত্র বিস্ময়কর কাণ্ড সম্বন্ধে অমৃতলাল তির্যকভাবে লিখেছিলেন—"ছি ছি! একথা মনে আসিলেও স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহাপাপ আছে।" তারপর তিনি ঐ নাটকের কুলপ্লাবী রূপ সম্বন্ধে বলেছেন "নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল; গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া গেল।" অমৃতলাল তাঁর ঐ বক্তব্য কবিতাকারেও প্রকাশ করেছেন:

"লিখিলা চৈতন্যলীলা হীরক হইল শিলা
নাট্যশালা হল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার।
বাজে শিঙা বাজে খোল রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নত শির আঁখিজলে ভেসে যায়।"

যে কোটি-কোটি মানুষ এখনো ভক্তিরসে নিমজ্জিত হন অকুণ্ঠচিত্তে—তাঁরা অন্ততঃ অল্প কিছুসংখ্যক যুক্তি-অভিমানীর বিরক্তিকে উপেক্ষা করে এইক্ষেত্রে গিরিশের সামনে নতশিরে দাঁড়াবেন।

গিরিশের রামায়ণ মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকগুলির চরিত্রায়ন যে, ঠাকুরবাড়ির কাছেও একদা সমাদরযোগ্য মনে হয়েছিল তা ভারতী [illegible] নাটকের উপর কয়েকটি আলোচনা থেকে দেখা যায়। ভারতীতে [illegible] মাঘ সংখ্যায় [illegible] রাবণবধ ও অভিমন্যুবধের একত্র সমালোচনা [illegible]। মধুসূদনের [illegible] কিশোর রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল—তিনি [illegible] কাব্যে রামচন্দ্র ও [illegible] মহিমানাশ করেছেন। ভারতীর ঐ আলোচনায় [illegible] গিরিশচন্দ্রের নাটকের [illegible]

ক'রে বলা হয়েছে—গিরিশ সেই অপকার্য করেন নি।—"ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়, যে-লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্যের আদর্শস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, যে-লক্ষ্মণকে আমরা কেবলমাত্র মূর্তিমান ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিনয় বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধকাব্যে একজন ভীরু ও স্বার্থপূর্ণ 'গোঁয়ার' মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কি আঘাতই লাগে! কেনই বা তা হইবে না? সুখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যুবধ, কি তাঁহার রাবণবধ—এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়িকাদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।" এর পরে এই বক্তব্যকে কেবল অধিকতর বিশ্লেষণে নয়, অলংকারের বিকীর্ণ আলোকেও উজ্জ্বল করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে "একখণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক তো প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু খণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফটিকগুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিকখণ্ড এবং তাঁহার অভিমন্যুবধ ও রাবণবধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ।"

অত্যুচ্চ এই প্রশংসা। এই লেখায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ছাপ আছে, কিন্তু ভাষাভঙ্গিতে এটি তাঁর রচনা মনে হয় না। কিন্তু ঠিক পরের মাসে ভারতীতে গিরিশের সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণ বর্জনের উপর যে আলোচনা করা হয়, তা ড দেবীপদ ভট্টাচার্যের অনুমান—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনা।[১০] রচনাটির ভাষা ও বিশ্লেষণরীতি বিচার করে মনে হয় ড ভট্টাচার্য ঐ অনুমান করেছেন, এবং সঙ্গত তাঁর অনুমান। রাম ও লক্ষ্মণের মহান চরিত্রের মর্যাদা গিরিশচন্দ্র কেমন উপযুক্তভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন এবং লক্ষ্মণের বীরত্বের উৎসমুখে রামচন্দ্রের প্রতি 'প্রেম' কোন অখণ্ড আকারে বর্তমান ছিল—সে সকলই সুন্দর শালীন ভাষায় এই সমালোচনায় প্রকাশিত। গিরিশচন্দ্রের রচনাংশ উদ্ধৃত করে লেখক নিজ বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁর মোট কথা "গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্য কাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেকস্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

এই সমালোচনার ঠিক আগের মাসে (মাঘ, ১২৮৮) ভারতীতে গিরিশচন্দ্রের ছন্দের উপর যে-আলোচনা বেরোয়, সেটিও রবীন্দ্রনাথের বলে ছান্দসিক অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন।[১১] ভারতীতে এই বিষয়ে লেখা হয়েছিল

[১০] রচনাবলী, ৩য়, পৃ. ১৬।

[১১] রচনাবলী, ২য় পৃ. ১৭।

"আমরা গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার-শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

প্রবোধচন্দ্র সেনের মতো মনস্বী লেখক বিনা কারণে অনুমান করেন না। গিরিশচন্দ্র 'হৃদয়ের ছন্দ' মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি সহায়ক-শক্তি হয়ে থাকেন, (প্রবোধচন্দ্র যা অনুমান করেছেন), তাহলে তাঁর সে কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। আমরা এখানে গৈরিশ ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় উদ্যোগী নই, এই ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল সমকালীন প্রশস্তি আছে তাদের উল্লেখেও বিরত থাকতে চাইছি, কিন্তু একথা বলতেই হবে—এই ছন্দ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের মহৎ একটি দান। যখন মঞ্চে স্বরবর্ধনের যন্ত্র ছিল না কণ্ঠস্বরের তরঙ্গগতির দ্বারা অভিনেতাদের নিজ বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হত রঙ্গমঞ্চের দূরপ্রান্ত পর্যন্ত, সে অবস্থায় এই ছন্দ যে কতখানি সহায়ক ছিল, তা সেকালের অভিনেতামাত্রই বুঝেছিলেন। মধুসূদন তাঁর অমিত্রাক্ষরে অন্ত্যমিলের বাঁধন থেকে ছন্দকে মুক্ত করলেও প্রতি ছত্রে চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন রেখেছিলেন, আট ছয় অক্ষরের পর্ববিভাগও বলবৎ ছিল—সেখানে গিরিশচন্দ্র আরও অগ্রসর হয়ে ছন্দস্পন্দকেই ছন্দোবন্ধনের ভিত্তি করলেন এবং তাঁর সেই মুক্তির ডাক একদিকে অভিনেতাদের কণ্ঠপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে, অন্যদিকে স্বাধীনতার আবেগ এনে দিল বাংলা কাব্যের রূপের জগতে। গিরিশচন্দ্রের এই কীর্তির সাহিত্যিক তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১২]

[১২] রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে অনুমিত ভারতীর লেখাদুটির কথা বাদ দিলে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নীরব। গিরিশচন্দ্রকে লেখা নবীনচন্দ্র সেনের এক চিঠি থেকে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৃপাপূর্ণ মনোভাবের কিছু পরিচয় পেয়ে যাই। নবীন সেনের বালক পুত্রের মুখে একটি গান শুনে সেটি গিরিশের রচনা জানবার পরে, রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, 'শুনিয়াছি লোকটা বেশ গান বাঁধিতে পারে।' শুনে নবীন হতবাক, কেননা গিরিশ তখন বাংলাদেশকে মাতোয়ারা করে রেখেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু সংবাদ রবীন্দ্রনাথের কানে প্রবেশ করেছিল, এটা বিস্ময়কর বটে! নবীন সেনের রিপোর্ট যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে—ঐকালে রবীন্দ্রনাথ মাত্র একটি অংশেই গিরিশকে কিছু মূল্য দিতে (তাও মৌখিক আলাপে) প্রস্তুত ছিলেন। যে-রবীন্দ্রনাথ একদা সম্ভবত গিরিশের পৌরাণিক নাটক বা ছন্দের প্রশংসা করেছিলেন—তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন—এবং গিরিশকে তিনি কি জীবন ও ধর্মনীতিতে, কি নাট্যরীতিতে, বিপরীত প্রান্তের মানুষ ভাবছেন। গিরিশ কর্তৃক রঙ্গালয়ে

পৌরাণিক নাটকের সাহায্যে গিরিশচন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে সমকালের মানুষের চিত্তের যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন—একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তিনি অতীত-গুহায় সমাধিস্থ ছিলেন না। নিকটস্থ বাঙালীসমাজের, বিশেষতঃ তার নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অংশের প্রত্যক্ষদর্শী লেখক তাঁর তুল্য সেকালে অল্পই ছিলেন। সে সমাজ প্রধানাংশে সুন্দর ছিল না। আত্মত্যাগের প্রতিমা সে সমাজে ছিল—স্বার্থপরতা ও নীচতার প্রতিমূর্তিও ছিল। এই সমাজকে গিরিশচন্দ্র উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। নির্মম ছুরিতে যখন সমাজদেহকে কেটে-কেটে দেখিয়েছেন তখন তাঁর সেই কাজ অনেকসময়ে শিল্পসম্মত হয়নি, এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি বস্তুত কাজটিকে ব্রতরূপে নিয়েছিলেন, ক্ষেত্রবিশেষে তাই শিল্পীর ভূমিকাকে আচ্ছন্ন করেছিল সমাজসংস্কারকের কর্তব্যবুদ্ধি। মামলা-মোকর্দমা, জাল-জুয়াচুরি, কন্যাদায়, মদ্যাসক্তি, গণিকাবিলাস—সমাজের এই কদর্য দিকগুলির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন—তাতে অসামান্যভাবে সফল হয়েছেন। তাঁর সামাজিক নাটকের ট্রাজিক চরিত্রগুলি যথার্থ ট্রাজিক কিনা, সে

বারাঙ্গনা নামানোর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মমহলে যে সমালোচনার স্রোত বইছিল, তাও তাঁকে সতর্ক করে দিতে পারে। ইতিহাসের পরিহাস—গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই রঙ্গমঞ্চে নারীকে অবতীর্ণ করানোর জন্য রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মমহলে নিন্দিত হয়েছেন। একজনের বিরুদ্ধে সমালোচনা এই—তিনি নষ্ট নারীকে মঞ্চে নামিয়ে পুরুষ দর্শকদের চরিত্র খারাপ করে দিচ্ছেন। অন্যজনের বিরুদ্ধে বক্তব্য—তিনি ভদ্রনারীকে স্টেজে নামিয়ে নষ্ট হবার পথ দেখাচ্ছেন। এই ধরনের সমালোচনা আমি নিজে বাল্যকালে যথেষ্ট শুনেছি।

সংস্কারপন্থী শুচিবাদীদের বিচিত্র আত্মখণ্ডনের চেহারাটা একবার আমাদের কাছে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, খুলে ধরেছিলেন অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী। বিশ্বপতিবাবু সবুজপত্র গোষ্ঠীর অন্তর্গত, স্বয়ং শিল্পী ও লেখক। একবার কোনো এক বিখ্যাত বাঈজী গায়িকার মৃত্যু হলে (তাঁর নাম তখন শুনেছিলুম, এখন ভুলে গেছি) বিশ্বপতিবাবু প্রমুখ সবুজগণ স্থির করলেন—এতবড় শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সভার আয়োজন করা অবশ্য প্রয়োজন। সে সভায় সভাপতিত্ব করবেন কে?—সবুজতম প্রমথ চৌধুরী—আবার কে? তদনুযায়ী এঁরা হাজির হলেন প্রমথ চৌধুরীর কাছে। প্রস্তাব শুনেই তিনি চমকে উঠলেন—বলা চলে, আতকে উঠলেন।—সর্বনাশ! ও-কাজ করতে পারি কখনো? শুনলে আমার শ্বশুরবাড়ির (অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির) লোক কি বলবেন! বলাবাহুল্য ছোট সবুজগণ স্তম্ভিত। তাঁরা অগত্যা গেলেন চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে। তিনি রাজী হলেন। এবং প্রকাশ্য সভায় যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল

ঐসব মহামানী ব্যক্তিগণ স্বদেশীয় শিল্পীকে মর্যাদাদান করতে প্রস্তুত নন—কেননা শিল্পীর চরিত্র শুচি নয়। কিন্তু এঁদেরই আবার যদি ইংলণ্ডের লম্পটচূড়ামণি বায়রনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে আহ্বান করা হয় তাহলে উদ্বাহু হয়ে সেখানে ছুটবেন।

বিশ্বপতিবাবুর এই কথাগুলি আমি স্মৃতি থেকে লিখছি। এক্ষেত্রে বিকৃত স্মৃতির ফাঁদে পড়লে,[১] দোষ আমারই।

গুলিতে বিশ্বাস্যতার সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা—এইসব প্রশ্ন উঠেছে। সমকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে তাদের চিরায়ত সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করার সময়ে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ছে। কিন্তু একথা কি করে অস্বীকার করা যাবে—গিরিশচন্দ্র কতকগুলি সামাজিক পাপের বিষয়ে তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে যে-চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন—তা সমাজসংস্কারকদের সাধ্যাতীত ছিল। এইসঙ্গে একথাও আমাদের স্মরণ করতে হবে—সমকালে তিনি শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের দায় আমাদের আছে।

আমরা জেনেছি : নবীনচন্দ্র সেন গিরিশের 'ভ্রান্তি' ও 'বলিদান' নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন 'স্বর্ণলতার পূর্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙ্গালার অধঃপতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি নাই।' 'বলিদানে'র বিষয়বস্তু শোচনীয় কন্যাদায় ('বাংলায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান।')। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন 'যদি বলিদানের ন্যায় সামাজিক নাটক লিখিতে পারি, তবেই সামাজিক গ্রন্থ লিখিব।' একই নাটক বিষয়ে বঙ্গবাসীর মন্তব্য "বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে, দর্শকের হৃদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে—বলিদান অভিনয় দেখিবার পূর্বে আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।" 'হারানিধি' নাটকে গিরিশ অর্থকলুষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যারা অতিরিক্ত অর্থ জুটিয়েছে, সেই ধনমদমত্তরা কিভাবে 'সতীর সতীত্বনাশে, পরধন অপহরণে' সর্বদা উত্তেজিত, তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 'শাস্তি কি শান্তি'র মধ্যে এনেছেন বিধবাবিবাহের সমস্যা। কোনো সুলভ সমাধান দেননি—বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নিরপেক্ষভাবে বক্তব্য সন্নিবেশ ক'রে, প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছেন বস্তুনিষ্ঠ নাট্যকারের রীতিতে। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'র অসামান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখ্য বস্তু। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন 'বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবনে দুঃখের যে বিরাট কালো মেঘ সর্বদাই বিভীষিকা উৎপাদন করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব লিপিচাতুরীর বলে এই শোক-পূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এমন মর্মভেদী বিয়োগান্ত নাটক বাংলা ভাষায় বুঝি আর নাই।"

সমাজজীবনের উপর গিরিশের প্রভাবের প্রসঙ্গে তাঁর নাটকগুলির অসীম জনপ্রিয়তার উল্লেখ অতি অবশ্যই করতে হবে। এই ক্ষেত্রে গিরিশ অনতিক্রান্ত, সেহেতু তাঁর নাটকের সামাজিক প্রভাবও ব্যাপক।

গিরিশের সমাজসচেতনতা কেবল সমাজের পঙ্কোদ্ধার প্রচেষ্টাতে নিঃশেষিত হয়নি—স্বাদেশিকতার মতো চেতনাঋদ্ধ বিষয়কেও গ্রহণ করেছিল। গিরিশ তাঁর পরিণত বয়সে মহোৎসাহে জাতীয়তার ভাবপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে

ছিলেন—তা দেখিয়ে দেয়, তিনি কতখানি কালপ্রয়োজন বুঝতেন এবং যুগগতির সঙ্গে অগ্রসর হতে পারতেন। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের কালে তাঁর তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক, 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' বিপুল-সংখ্যক দর্শক আকৃষ্ট করেছিল, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তার অনুরূপ সংবর্ধনা কদাচিৎ মিলেছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলির উচ্ছ্বাসের সীমা ছিল না। তিলক এসেছিলেন তাঁর সিরাজদ্দৌলা দেখতে, অভিনয়ান্তে অভিনন্দিত করেন নাট্যকারকে। শিবাজী চরিত্রকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করবার জন্য যিনি প্রধান উদ্যোগী, এবং বাংলায় শিবাজী উৎসবের প্রবর্তক, সেই সখারাম গণেশ দেউস্কর খুশি হয়েছিলেন—নাটকের মধ্যে শিবাজীর ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে দেখে। গিরিশচন্দ্র সস্তা জনপ্রিয়তার প্রলোভনে ধরা দিয়ে এই নাটকগুলি লেখেন নি, এদের লেখার জন্য প্রচুর ইতিহাস পড়েছিলেন, এবং নাটকে ঐতিহাসিক বাস্তবতারক্ষায় যত্নবান ছিলেন। নবীন সেন সঙ্গতভাবে দাবি করেছেন, তিনিই প্রথম সিরাজদ্দৌলাকে হৃদয়গ্রাহী করে বাঙালীর কাছে উপস্থিত করেছেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে 'বাঙালীর মধ্যে বোধহয় আমিই গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্যে একফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।" সেই তিনি গিরিশের সিরাজদ্দৌলা পাঠের পরে অকুণ্ঠে লিখেছেন 'তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।' আত্মাভিমানী নবীন সেনের কাছ থেকে এই প্রশংসালাভ কম কথা নয়। ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে অধিক মূল্যবান ছিল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মন্তব্য, যিনি প্রথম সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিমের জীবনেতিহাসকে বিদেশী ঐতিহাসিকদের কলঙ্কলাঞ্ছন থেকে মুক্ত করবার ব্যাপক প্রয়াস করেন। ইতিহাসের বিবরণকে গিরিশ 'প্রত্যক্ষবৎ' ফুটিয়েছেন, 'ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন'—একথা অক্ষয় মৈত্রেয় স্বীকার করেছেন। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন "সিরাজদ্দৌলা নাট্যজগতে যুগপরিবর্তন করিয়াছিল।" সত্যই যুগপরিবর্তন করেছিল কিনা তা নাটকের ঐতিহাসিকদের বিবেচ্য, কিন্তু কোনোই তর্ক নেই এই মন্তব্য সম্পর্কে এই নাটকের উচ্চ প্রশংসাধ্বনিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ধ্বনিত হইয়াছিল।" এই নাটকটি, তৎসহ মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজীর বিষয়ে সংবাদপত্র ও লেখকগণ যেন প্রতিযোগিতা করে প্রশস্তি করেছিলেন, যা জীবনের উপান্তে উপস্থিত কোনো নাট্যকার ও পরিচালকের পক্ষে লাভ করা বহু ভাগ্যের বিষয়। "জাতীয় সাহিত্যে এগুলির অতুলনীয় স্থান", "অসাধারণ মঞ্চসজ্জা ও পরিচালনা", "অনন্যসাধারণ অভিনয়"—এইসব মন্তব্য কেবল বেঙ্গলী বা বঙ্গবাসী বা বসুমতীর মতো দেশী সংবাদপত্র করেনি—স্টেটসম্যানের মতো সাহেবী কাগজও কার্যত তাই করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী নাটকগুলির বিস্তৃত প্রভাব সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রশংসা বোধহয় করেছিল ইংরাজ সরকার—তিনখানি নাটককেই

বাজেয়াপ্ত ক'রে এবং নাট্যাভিনয় বন্ধ ক'রে দিয়ে।

জনমতগঠনে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর নেতৃত্বাধীন নাট্যশালার ভূমিকা বিষয়ে অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন

"লোকমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য ইংরাজের অনুকরণে এদেশে দেশীয় সংবাদপত্র যে-কাজ করিয়াছে—গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা তদপেক্ষা যে কত অধিক কাজ করিয়াছে, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসজ্ঞ সুধীমাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাংলায় এই দেশাত্মবোধ, এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে শত শত বৎসরের মোহপসারণের চেষ্টা, ইহাতে অপাংক্তেয় বাংলার নাট্যশালার কতখানি দাবি আছে বাঙালীর প্রথম সাধারণ নাট্যশালার নাম নির্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার প্রথম নাট্যশালার নাম ন্যাশন্যাল থিয়েটার! ন্যাশন্যাল কংগ্রেস—ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পরে সৃষ্ট। হেম বন্দ্যোর 'ভারত বিলাপ', 'ভারত মাতা'—এই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের মঞ্চ হইতে গিরিশচন্দ্রের [দ্বারা] শিক্ষিত অভিনেতৃমুখে উচ্চারিত হইয়া দর্শকহৃদয়ের যে লুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগাইয়া তুলিত—কে বলিতে পারে তাহারই ফলে সেই দর্শকবৃন্দের উত্তরপুরুষগণ আজ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী হইয়াছেন কিনা? যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতি সন্তান সম্প্রদায় উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত—যদি গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া তাহারা দর্শকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ না করিত—তাহা হইলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র এত সহজে, এত অল্পায়াসে আজ কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্যন্ত আলোড়িত করিতে পারিত কিনা কে বলিবে?

"এইরূপ বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙালী জাতির, তাহার প্রাণের তারে যে সুর অনাহত অবস্থায় ছিল, সে সুরে সুর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছেন মাতাইয়াছেন আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাই যেমন বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র—দুই যুগাবতার।"

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের পিতা তিনি

সামাজিকভাবে অপাংক্তেয় গিরিশ সবলে সমাজের প্রশংসা লুণ্ঠন করে নিতে পেরেছিলেন। অবশ্য দেশের তৎকালীন বিজ্ঞজনেরা তাঁর সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করতেন। গোপন পাপের উপরে সভ্যতার প্রলেপ দিয়ে গিরিশ সমাজে হাজির হতেন না—তাঁর প্রমত্ত অট্টহাস্য প্রকাশ্য নটনটী সংসর্গে বিচরণের মধ্যে ফেটে পড়ত। এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি পরিহার্য। তথাপি তাঁকে অস্বীকার করা যায়নি। ইতিপূর্বে বিখ্যাত ব্যক্তিদের তাঁর বিষয়ে যেসব মন্তব্য উপস্থিত করেছি,

তার সঙ্গে যোগ করা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি। তিনি বলেছিলেন "গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যসেবার অন্যপন্থা অবলম্বন করিলাম।" যে-গিরিশ "কলিকাতার বঙ্গালয়ের বৃহৎ উদরটি লইয়া" বর্তমান, যিনি সর্বদাই "নূতন খেয়াল লইয়া নিজে নাচবার ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায়" থাকেন—সেই তিনি তাঁর শেষ বয়সেও, নবীনচন্দ্র সেনের কাছে "ক্ষণজন্মা পুরুষ" কারণ "এই বয়সেও [নবীন সেন পত্রে লিখেছেন] যেন তোমার প্রতিভা দিন দিন আরও বর্ধিত হইতেছে।" স্বদেশী যুগে গিরিশচন্দ্র তার স্বদেশী নাটকের নব ভূমিকার দ্বারা বিরাট প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন। নবীন সেন ইচ্ছা করেছিলেন—গিরিশ স্বাদেশিকতার সমস্ত রস পান করে উদ্‌গিরিত করুন এমন একটি নাটক যা 'দেশোদ্ধারের উপায়' দেখিয়ে দেবে। "আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া এত কাঁদিয়াছি এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন, এবং দেশের হৃদয়ে এই নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি যেরূপ স্থায়ী ও বর্ধিত করিতে পারিবে আর কেহ পারিবে না। উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অভিনীত হইয়া দেশের নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবনব্রত উদযাপন কর।'

শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্র থিয়েটার পছন্দ করতেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন তাঁর উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করেছিলেন, তখন গিরিশের প্রতিভাকে স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন "আপনার ন্যায় সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা আপনার হাতে আমার উপন্যাসের যথার্থ আদর হইবে আমি বিশ্বাস করি।" গিরিশচন্দ্রের লেখা গান শুনে মোহিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "ভূয়সী প্রশংসা" করেন। রাজনারায়ণ বসু গিরিশের একটি অধ্যাত্মসঙ্গীত শুনে বলেছিলেন "রচয়িতা একজন উচ্চস্তরের কবি হইবে এবং তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।" দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রথম দিকে, সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকাররূপে গিরিশের বিষয়ে প্রসন্ন ছিলেন না কিন্তু শেষে তিনিও গিরিশের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। বঙ্গালয়ের অপর প্রধান নাট্যকারগণ—অপরেশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল প্রভৃতি তো গিরিশকে গুরু বলেই মনে করতেন। গিরিশ স্কুলের গণ্ডি পেরোননি, কিন্তু তাঁর বিপুল অধ্যয়ন ও স্বীকরণ সমকালে সর্বত্র প্রশংসিত ছিল, স্বীকৃত হয়েছিল তাঁর মনস্বিতা। নাটকে কেবল তিনি ধর্মভাব দেননি, যথার্থ ইতিহাস দিয়েছেন, উচ্চ দর্শন দিয়েছেন, বিজ্ঞানচেতনাও সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন (শেষোক্ত

বিষয়ে ড° দেবীপদ ভট্টাচার্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন), এমনকি ফরাসি বিপ্লবের ছায়াপাতও আছে নাট্যকাহিনীতে। বিদেশী সাহিত্যের মর্মবস্তুকে নিজ ভাষায় পরিবেশন করার দুর্লভ ক্ষমতা গিরিশ দেখিয়েছেন ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের মধ্যে, যা একালের বিদগ্ধ লেখকদের মতেও অদ্যাবধি কৃত ম্যাকবেথের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ। সমকালের সাহেবী কাগজ এই নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিল, তা আগেই বলেছি। ইংরাজি সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত লেখক সম্পাদক এন এন ঘোষের মতে, ম্যাকবেথের ফরাসি অনুবাদের অপেক্ষা এই বাংলা অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর। এই অনুবাদ মূলের মর্যাদা যথার্থই রক্ষা করেছে, একথা সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে জি গুপ্ত বা পি এল রায়ের মতো বিখ্যাত মনস্বী ব্যক্তিরা। বিজ্ঞানবিদ যুক্তিবাদী ডা মহেন্দ্রলাল সরকার গিরিশের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন রক্ষণশীল বিহারীলাল সরকারও, নাতি রক্ষণশীল বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রও। অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ ও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে গিরিশচন্দ্র "কেবল একজন মহাকবি নন—মহাভাগবত।" চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে—'মহাকবি"ও"মহাভাগবত"—এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোনো ভেদরেখা ছিল না গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যার কবিতায় যার রচনায় জাতীয়তা আছে, ধর্ম আছে—তাহাকেই মহাকবি বলি।" সাহিত্যের এই জাতীয় ভাব [চিত্তরঞ্জন বলেছেন] চণ্ডীদাসে শুরু হয়ে প্রবাহিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গিরিশচন্দ্রের রচনায় তারই বিশেষ প্রকাশ গিরিশবাবুর কবিতায়, গানে আমরা জাতীয়তা পাই প্রাণ পাই দেশের একটা স্বরূপমূর্তি দেখতে পাই—এই তার রচনার বৈশিষ্ট্য। তার কবিতা যাচাই করতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড যেতে হবে না। গিরিশচন্দ্র খাঁটি দেশী কবি। তিনি দেশীয় ভাবে দেশমাতৃকার সেবা করেছেন দেশের প্রাণের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন—এইজন্য তিনি মহাকবি, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।' বিপিনচন্দ্র পাল গিরিশচন্দ্রের দেশীয়তাকে একটু অন্যভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে হল বাস্তব সংসারের স্বীকৃতি ও অভিব্যক্তি। গিরিশ 'ব্যোমচারী উড্ডীয়মান কবির ন্যায়" আকাশ থেকে মর্ত্যে প্রতিভার ধারাবর্ষণ করেননি, তিনি "এই সংসারের মানুষ সংসারের ধূলো খেলায় মলিন হইয়াও উন্নতি সোপানে দিন দিন আরোহণ করিয়া শেষে বহু উচ্চে উঠিয়াছিলেন—এবং উন্নতির চরম সীমায় তাঁহার সেই সংসার ধূলিরাশি সুসংস্কৃত হইয়া সুবর্ণকণা বৃষ্টির ন্যায় সংসারবাসীগণের উপর পতিত হইয়াছিল।" 'সাহিত্য' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতে, গিরিশচন্দ্র এক 'যুগান্তকারী শক্তি।" গিরিশ বহু ভাবের আধার। "পরস্পর-বিরোধী বহু ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানব জীবনে প্রায় দেখা যায় না।" "ভক্তবীর গিরিশ হাসিতে-হাসিতে সংসারের হলা-

হল স্বয়ং পান করিয়া গুরুর কৃপায় নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, জীবের দুঃখে কাঁদিতে-কাঁদিতে গুরুদত্ত অমৃত বাংলাদেশের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।" সমাজপতি গিরিশের মধ্যে প্রতিভা ও মনীষার সমন্বয় দেখেছিলেন। "গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র—তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। তাঁহার ভূয়োদর্শন ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হইত। বিতর্কে যুক্তিবিন্যাসে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক পটুতা ছিল। মনীষার এমন অভিব্যক্তি এ জীবনে আর দেখিব কি?" গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বহু বৎসরব্যাপী পরিচয়ের পরেই সমাজপতি একথা বলেছেন, এবং সমাজপতির কঠোর সমালোচনাবুদ্ধির কথা স্মরণ রাখলে এই প্রশংসার বিশালত্ব উপলব্ধ হবে। সমাজপতি এইসঙ্গে অসন্দিগ্ধ ভাষায় বলেছেন, অভিনয় প্রতিভার দিক দিয়ে গিরিশ "নট সম্প্রদায়ের আদর্শ," এবং 'পিতার মতো বাংলার বঙ্গভূমির লালন পালন এমন কি শাসন পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন।" গিরিশ চন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার চরিত্র সম্বন্ধেও সমাজপতি কিছু গভীর কথা বলেছেন 'গিরিশচন্দ্র কখনও মিনিয়েচার চিত্রকরের ন্যায় বর্ণফলকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র তুলিকা ঘর্ষণ করিতেন না। তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গের মুকুর জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। গিরিশচন্দ্র অনায়াসে অবলীলায় বিশাল পটে স্বর্গের, মর্ত্যের ও নরকের—দেব, মানব ও দানবের—বাহ্য প্রকৃতির, অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।' এই প্রতিভা সমাজপতির মতে "বিশ্বামিত্রের ন্যায়", যিনি 'সাহিত্যে নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।"

যথেষ্ট না হলেও গিরিশচন্দ্রের কিছু নাটক ভাষান্তরিত হয়েছে। বিল্বমঙ্গল পড়ে নিবেদিতার মনে ইবসেনের Brand নাটকের কথা জেগেছিল। রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ করলে নিবেদিতা তা সংশোধন করে দেন। সেটি বহু বিদেশীর প্রশংসা অর্জন করে। বুদ্ধদেব চরিত 'ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হইয়া লণ্ডনের কোর্ট" থিয়েটারে বহুদিন অভিনীত হইয়া লক্ষ-লক্ষ নাট্যামোদীর অজস্র সাধুবাদ লাভ করিয়াছে।" নল দময়ন্তীর ফরাসি অনুবাদও অভিনীত হয়েছে।[13] হিন্দীতে অনূদিত 'বিষাদ' ও 'শঙ্করাচার্য'—প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। সেকালের বিখ্যাত ইংরাজ প্রশাসকগণ—লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড অনারেবল স্কাইন বা অনারেবল স্কোবল—গিরিশের গুণমুগ্ধ ছিলেন। গিরিশের নাটকে বিপজ্জনক জাতীয়তা থাকা সত্ত্বেও ইংলিশম্যানের মতো জবরদস্ত সাহেবী কাগজ লিখেছিল 'আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চ তাঁর প্রচেষ্টার

১৩ উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৬৭।

ফলেই বর্তমান অবস্থায় উপনীত। তিনি সাধারণের লেখক, সেইসঙ্গে শক্তিশালী অভিনেতা। বাঙালীদের মধ্যে যেমন তেমনি ইউরোপীয়দের মধ্যেও তাঁর অনেক অনুরাগী ছিলেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মি স্ক্রাইন এই মানুষটির বিষয়ে একদা বলেছিলেন 'হায়, এই পৃথিবী তার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের কত কম চেনে'।"

গিরিশচন্দ্রের মহত্ত্ব ছিল আবার মহৎ অহংকারও ছিল। তাঁর নাটকগুলির উৎসর্গপত্রের কোনো কোনোটিতে বরেণ্য ব্যক্তিদের বিষয়ে গম্ভীর ভাষায় মহনীয় শ্রদ্ধা প্রকাশিত। স্মরণ করতে পারি 'সীতার বনবাসের' উৎসর্গপত্রে বিদ্যাসাগরের প্রতি, 'শাস্তি কি শান্তির' উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধুর প্রতি 'তপোবলের' উৎসর্গপত্রে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার কথা। বঙ্গমঞ্চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে তাঁর চমৎকার কয়েকটি লেখা আছে। সেগুলিতে একদিকে মেলে ধীর মূল্যবিচার, অন্যদিকে প্রশান্ত কৃতজ্ঞতা। বঙ্গালয়ের পিতা—ঐ সকল রচনায় কখনো বন্ধুবৎ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাঁধে হাত রেখেছেন, কখনো উত্তোলিত হস্তের আশীর্বাদ জানিয়েছেন। এগুলির অধিকাংশই লেখা হয়েছিল বঙ্গালয়ের বিভিন্ন ব্যক্তির লোকান্তরে। এদের মধ্যে গিরিশের সাহিত্যবোধ ও মূল্যবোধের বিশেষ প্রকাশ আছে। তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে তিনি প্রাধান্য দেননি (যা করাই সাধারণ রীতি) পরিবর্তে সমকালীন প্রেক্ষাপটে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চারিত্রায়ণ ও কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সংশয়াতীত সাফল্যের জন্য পরবর্তীকালে নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকদের কাছে তাঁর এইশ্রেণীর রচনা অপরিহার্য উপাদানের স্বীকৃতি পেয়েছে। আরও আছে—নাট্যশালা নাট্যপাঠকলা নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর উৎকৃষ্ট কিছু প্রবন্ধ, যেগুলি বাংলা নাট্য-ইতিহাসের ক্ষেত্রে সম্পদ।

নিজের মধ্যে বিপুল শক্তি গিরিশ সর্বদাই অনুভব করেছেন। যৌবনে মেঘনাদবধ' নাটকের প্রথম রজনীতে এই গর্বোক্তি কাব্যাকারে প্রকাশ করেছিলেন "'আসি এই রঙ্গস্থলে কত লোকে কত বলে, সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন। যার মনে ওঠে যাহা তিনি বলিবেন তাহা আমার যা কার্য আমি করিব এখন।" এই গর্বের সপক্ষে নিজ অধিকারকে তিনি পরবর্তী কয়েক দশকে প্রমাণ করে গিয়েছিলেন। ফলে জীবনপ্রান্তে পৌঁছে যখন নিম্নের কথাগুলি বলেছিলেন, তখন তা আর গর্বোক্তি নয় সত্যোক্তির রূপ ধরেছিল

"আমার মুশকিল হয়েছে কি জানো—আমার আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বঙ্গালয়কে জীবনের অবলম্বন ক'রে সাধারণের তুষ্টিসাধনের জন্য ব্রতী হয়েছেন—এমন নাট্যকার উপস্থিত বঙ্গ বঙ্গালয়ে কেউ নেই—কেবল আমিই আছি। আমায় প্রতিবার উদ্যম করতে হয়—আপনাকে আপনি কেমন করে হারাব—যে নাটক লিখব, তা পূর্ব রচিত নাটককে কেমন করে উঁচিয়ে যাবে।'

গর্ব করবার অধিকার তাঁর অবশ্যই ছিল, কারণ বাংলা নাট্যশালার প্রায় অর্ধ-

শতাব্দীর ইতিহাস—গিরিশচন্দ্রের নড়াচড়ার ইতিহাস। তাঁর এবং বাংলা নাট্যশালার দুর্ভাগ্য—তিনি উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দে ও সাচ্ছল্যে কোনো একটি নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন নি। নানা প্রয়োজনে তাঁকে মঞ্চ বদল করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। যে স্টার রঙ্গমঞ্চ প্রধানত তাঁর দানে আবারিত সেই মঞ্চ থেকে তাঁকে অপমান করে বিতাড়িত করা হয়েছে। আবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতেও হয়েছে। সকল রঙ্গমঞ্চই তাঁকে নিয়ে টানাটানি করেছে—কারণ গিরিশ মানেই সফলতা—গিরিশ না থাকলে শিবহীন যজ্ঞ। তাকে বিদায় দিয়ে কিভাবে ফিরিয়ে আনা হত, তা প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যায়। ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশকে ফিরিয়ে আনার সূত্র প্রকাশিত হ্যান্ডবিলে (৬ অগ্রহায়ণ, ১৩০৭) অমর দত্ত লিখেছিলেন

নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাংলায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত। তাহার মধ্যে আমি একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার স্নেহময় কোল আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন।”

এর পরেই যদি গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বহুল উদ্ধৃত রচনাংশটি পুনশ্চ উদ্ধৃত করি তার বক্তব্য বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হবে বলেই মনে হয়

'নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার [উপযুক্ত নাটকের অভাবগ্রস্ত নাট্যশালার] সেই মৃতকল্প দেহে জীবনসঞ্চার করিলেন। তাহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবলমাত্র অভিনয়প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায়না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ ইহার প্রাণ, ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহার মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল। যে অমৃতপানে বাংলার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিককাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়া-

ছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাংলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।"[১৪]

গিরিশচর্চার প্রয়োজন

অত্যন্ত পরিতাপের কথা—এমন একজন আংশিক যুগন্ধর পুরুষের বিষয়ে উপযুক্ত চর্চা বর্তমানে হচ্ছে না। এদেশে যাঁরা মাপে বাঁধা নাট্য-ঐতিহাসিক, তাঁরা অত্যন্ত ভদ্রলোক, যে কথা একবার শুনে ফেলেন বা শিখে ফেলেন, তাকে কদাচ বিদায় দিতে পারেন না। সুতরাং গিরিশের বিচার দাঁড়িয়েছে—তিনি পৌরাণিক নাটক লিখেছেন, সামাজিক নাটকও লিখেছেন, তাদের মধ্যে সমাজছবি আছে, তবে সেগুলি খাঁটি ট্রাজেডি হয়ে ওঠেনি, খুব প্যাথেটিক, তিনি সাহেবী থিয়েটারের চরিত্রনাশ ঘটিয়েছেন তার সঙ্গে দেশী যাত্রার সহবাস ঘটিয়ে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে পড়েছিলেন তার ফলে তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি ভক্তিরসে মাখামাখি। এসব কথা যারা বলেন তারা কিন্তু সহানুভূতিশীল। অপরপক্ষে অতিবিদগ্ধ একদল আছে যারা দারুণ জীবনরসিক আর তারই তাড়নায় জটিল সাংকেতিক নাট্যের অভিপ্রায়ে নেমে পড়েন, তার আগে শিক্ষিত টুসকিতে গিরিশকে ছাইদানে ঝেড়ে ফেলতে ভোলেন না। অপরদিকে বৈপ্লবিক প্রগতিশীলেরা যে তাঁদের নাটকীয় হুংকার কিংবা প্রতীকী কাকুতির মধ্যে বোকা ভক্ত গিরিশের কথা চিন্তা করার চিন্তাও করতে পারবেন না তা বলাই বাহুল্য। বিস্ময়কর হল যে মহলে গিরিশের চর্চা সর্বাধিক হবার কথা সেই রামকৃষ্ণপন্থীদের কাছেও তিনি অবহেলিত, কারণ তিনি যে ঠাকুরের দীনভক্ত মোটে শুদ্ধসত্ত্ব নন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক খারাপ খারাপ কথা শোনা গেছে এক্ষেত্রে তাঁকে ঠাকুরের অনুসরণ। কৃপা না করে (এবং কৃপাভরে সরিয়ে না দিয়ে) উপায় আছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে গিরিশ তাঁর জীবনকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কেবল নয় সমগ্র বঙ্গদেশের এক প্রধান পুরুষ তিনি পরবর্তীকালে কার্যত উপেক্ষিত। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে রচনার প্রকার ও পরিমাণের কথা স্মরণ রেখেই একথা বলছি।

সুখের বিষয়, গিরিশচর্চা নূতনভাবে শুরু হবার কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক সহায়ক ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত পাঁচ খণ্ড গিরিশ রচনাবলীর প্রকাশ—যার প্রত্যেক খণ্ডের সূচনায় ড. ভট্টাচার্য প্রচুর তথ্যপূর্ণ বিচারশীল ভূমিকা লিখেছেন। গিরিশচন্দ্রের আকর জীবনী অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র', নাট্যালয় এবং গিরিশচন্দ্র বিষয়ে আর একটি আকর গ্রন্থ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—এই দুটি বই সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক স্বপন মজুমদার। মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ লিখেছেন ড. অরুণ

১৪ অপরেশ, ২৯।

মিত্র অমৃতলালের বিষয়ে। আর রামকৃষ্ণ গিরিশ সম্পর্কের উপর অপূর্ব আলোক-পাত করেছেন বহু নূতন তথ্যসহ—অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থে।

গিরিশের রচনায় নিত্যরস

এই সকল গ্রন্থ প্রয়োজনীয় এই কাজটি করেছে—গিরিশ-কৌতূহল দারুণ ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হয়েছে, গিরিশ প্রতিভাকে আমরা কী না অসম্পূর্ণ ভাবে জেনেছি। নচেৎ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় দেখাই যায় না কেন? এবং কি অদ্ভুত, এখনো পর্যন্ত গিরিশ সঙ্গীত বলে একটি পৃথক সঙ্গীত-ধারার সূত্রপাত হল না। অথচ নিঃসন্দেহে গিরিশ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার। গানের স্রোতে তিনি একদা দেশকে ভাসিয়েছিলেন। সে সকল গানে মাধুর্যের অতোই বৈচিত্র্য। সঙ্গীতগুণের জন্য গিরিশ বাংলার গণ্য কবিও বটেন। এদের মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য লিরিক সুর গভীরতায় নিবিড়তায় জড়াজড়ি। গিরিশের গানে ভক্তিরঙ্গ কিংবা অনির্বচনীয় অধ্যাত্মরসের কথা স্বীকৃত কিন্তু গিরিশ যে এইসকল গানের দ্বারা [illegible] এক প্রেমের কবি—সে বিষয়ে আমরা সচেতন নই। পরবর্তী গীতিকারদের অনেকেই বিনা স্বীকৃতিতে গিরিশের ভাব ও সুর গ্রহণ করেছেন (সে বিষয়ে রাজ্যেশ্বর মিত্রের উক্তি নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন। সম্প্রতি শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের কিছু কীর্তনাঙ্গ গানে গিরিশচন্দ্রের প্রভাবের কথা বলেছেন দেশ ১৫ আগস্ট, ১৯৮১) সেই অকৃতজ্ঞতার কটুতা হ্রাস পেতে পারে কেবল এই চিন্তায়—ও হল অসজ্ঞান চৌর্য—গিরিশের জনপ্রিয় নাটকগুলি আকাশ-বাতাস ভরে গান ও তার সুর ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা হয়ে উঠেছিল সাধারণ সম্পত্তি, আর সাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠনের অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে।

যথার্থ গিরিশচর্চা শুরু হলে বিচারমুখে প্রকাশ পাবে—তাঁর রচনায় সাময়িকতা ও নিত্যতার আনুপাতিক পরিমাণ কী? গিরিশকে সমকালের দাসত্ব করতে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য—নিত্যজীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার তিনি ভুলতে পারেন নি। অনেক সময়ই তাঁর রচনায় দেখা যায় নিত্যতা সাময়িকতার উপর আক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গভীরে বিচলিত করেছে। সর্বত্র সামঞ্জস্য ঘটেছে এমন নয়। তথাপি স্বীকার্য, তিনি সেই মহৎ কালাতিক্রমী দোষে আক্রান্ত ছিলেন, যার দ্বারা বৃহৎ লেখকেরা প্রায়শই অধিকৃত হন। ধারা-বাহিকতাকে নবপ্রবাহে গতিশীল করার কাজে যাঁরা নিযুক্ত—নবপুরাণ সৃষ্টিতে যারা ব্রতী—তারা কালাতিক্রমণ দোষ এড়াতে পারেন না। গিরিশচন্দ্রও পারেন নি।

গিরিশ শ্রদ্ধেয়, যেহেতু তিনি পরানুবাদ ও পরানুকরণকে প্রগতিশীলতা মনে করেন নি। জাতীয় জীবনের গভীরে অবতরণ করে জেনেছিলেন, কোথায় আছে তার দুর্বলতা, কোথায় তার শক্তি। জাতির অধ্যাত্মপিপাসাকে কেবল ঐহিকতার মুখের ঔদ্ধত্যে লাঞ্ছিত করার চপলতা দেখান নি। আবার আধ্যাত্মিকতা বলতে কদাপি নিছক আনুষ্ঠানিকতা বোঝেন নি। এখানেও এনেছেন নবচেতনার স্রোত। যাঁরা মুখ-চলতি এই কথাটায় বিশ্বাস করে বসে আছেন যে, রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে গিরিশ ভক্তিরসের নাটক লিখে গেছে—তাঁদের কতকগুলি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। প্রথমত গিরিশের সর্বাধিক ভক্তির নাটক 'চৈতন্যলীলা'—রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই রচিত ও অভিনীত। সেখানে পূর্বাগত ভক্তির আকুল প্রবাহ। বাংলাদেশে ভক্তির অতি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। চৈতন্য-আন্দোলন এখানে অনিঃশেষ ভক্তি-উৎসকে অবারিত করেছে। তার রসধারা ছড়িয়ে দিলেই হয়। গিরিশ সেই কাজই করেছে। তার উক্ত নাটক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চৈতন্য লীলায় পূর্বসঞ্চিত সম্পদের পরিবেশনের অতিরিক্ত কিছু করা হয়নি।

রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য আসার ফলে গিরিশের নাটকে ভক্তিরসে নূতন মাত্রা দেখা গেল—এবং তা কেবল ভক্তিও রইল না। গিরিশ তাঁর পরবর্তী নাটকগুলিতে ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ করলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে। তার ফলে সেগুলি ভক্তি নাটক না হয়ে দাঁড়াল অধ্যাত্ম নাটক বহুলাংশ রূপকও—কারণ অন্য রূপে মিশে রইল গিরিশের রূপ। এমনকি এগুলি অংশত সাংকেতিক নাটক, কোনো অজ্ঞাত বাস্তবের ইশারা যে রয়েছে। গিরিশ লেখক থেকে হয়ে দাঁড়ালেন প্রফেট।

রামকৃষ্ণই গিরিশের রূপান্তর ঘটালেন। গিরিশের চেতনায় গভীরতার সঙ্গে তিনি এনেছিলেন ব্যাপকতা অনুভব করিয়েছিলেন জ্ঞান ও প্রেমের সম উৎসের সত্যতা, জীবনের সহজ ছন্দে দুলিয়েছিলেন অনন্তের ঢেউ। একদিকে রামকৃষ্ণ দৈনন্দিনের সুখী সুস্থ ও আবদ্ধ অস্তিত্বে আনলেন পাগলামির ঝড় অন্যদিকে মর্মান্তিক কান্নার গভীরে ফেটে পড়লেন নিষ্করুণ অট্টহাস্য নিয়ে। রামকৃষ্ণ গিরিশের খণ্ড ধারণার প্রাচীর ভেঙে তাঁকে অসীমের প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে দেখালেন—পৃথিবীর যে মানুষ নিকট রূপে কালের কালিমাখা সে মানুষই অন্তর্ভাবে নিরঞ্জন।

গিরিশের নাটকের আলোচকেরা প্রায়শই কোন কোন নাটকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রভাব আছে সে বিষয়ে উল্লেখ করে থাকেন। তাদের সেই সাধু চেষ্টা একটি মারাত্মক ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে—বিশেষত তাঁদের মনে যাঁরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবাহিত নন। ঐসব পাঠক মনে করে বসেন—তাহলে এই নসীরামই হলেন রামকৃষ্ণ। ঐ চিন্তামণি রামকৃষ্ণ ছাড়া কেউ নন, ইত্যাদি। লেখক গিরিশ কিন্তু অমন ভ্রান্তিতে ছিলেন না। তাঁর কাছে ঠাকুর

অনন্ত ভাবময। যাঁকে গিবিশ অবতাব মনে কবেছেন, তাঁকে কখনো নাটকের কল্পিত কোনো চবিত্রেব মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাবতে পাবেন? এক্ষেত্রে পবিষ্কাব মনে বাখতে হবে—বামকৃষ্ণ। (বিবেকানন্দেবও) চবিত্র বা উক্তিব ঈষৎ আভাসেব বেশি কিছু ঐসব নাটকে নেই। গিবিশেব এই জাতীয় সব কটি নাটকেব কিবণ-বেখাগুলিকে একত্র কবলে বামকৃষ্ণ-সূর্য বিষযে গিবিশেব ধাবণাব কিছুটা আভাস হযত পাওযা যাবে। কিন্তু তাও যে সম্পূর্ণ নয গিবিশই তা জানিযে গেছেন। আগেই দেখেছি তিনি বলেছেন বত বা গভীব কথা তাঁব মনে জাগছে, কিন্তু তাদেব নাটকে প্রকাশ কবা সম্ভব নয। যেটুকু প্রকাশিত হযেছে তাদেব কোথাও আছে ঈশা উন্মত্ততা ভক্তি। চঞ্চলতা বা যোগসমাহিতি, কোথাও উচ্চ দার্শনিকতা কিংবা আশ্চর্য লোকপ্রজ্ঞা বালগোপাল লীলাব পাশে ঈশ্বরেব পতিতপাবন রূপ গার্হস্থ্য শিক্ষা ও লোকশিক্ষা ত্যাগব্রত সেবাধর্ম, সংসাবধর্ম সংসাব-বিবাগ, জড ও অধ্যাত্মবাদেব সামঞ্জস্য সাকাব নিবাকাব—সবকিছুই বযেছে নাটকগুলিতে। বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দেব মধ্যে এই সকলই গিবিশ দর্শন কবেছিলেন। তাব বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কেবল কালাপাহাড বা বিদ্যাবসান পূর্ণচন্দ্র, নসীবাম বিল্বমঙ্গল প্রভৃতিতেই আছে। নিমাই সন্ন্যাসেব নিমাইযে বুদ্ধদেব চবিতেব বুদ্ধদেবে শংকবাচার্যেব শংকবে। কর্মবাদ নিবসনকাবী বুদ্ধদেবও বামকৃষ্ণ, আবাব ভাবত থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎসাদনকাবী শংকবাচার্যও বামকৃষ্ণ।

পাশ্চাত্য প্রচলিত ভক্তিব চোখে বামকৃষ্ণকে দেখলে গিবিশ শংকবাচার্যই তাব চবম পবিণাম। এই নাটকেব উৎসর্গপত্রে তিনি পবিষ্কাব বলেছেন, "দক্ষিণেশ্ববে শংকবাচার্যকে" তিনি দর্শন কবেছিলেন। শংকবাচার্য নাটকে বিবেকানন্দ কেও পাওযা যায় (গিবিশ বামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে অখণ্ড অস্তিত্ব মনে কবতেন), গিবিশ তা স্বীকাবও কবেছেন। গিবিশ কবি এই লেখাটিকে ইনস্পিবেশন এব সৃষ্টি মনে কবতেন। সমালোচকেব প্রজ্ঞ ব্যক্তিবা সবিস্ময়ে ভেবেছিলেন—শংকবাচার্যেব জীবনেব কাঠামোব মধ্য একখানি নাটকেব সম্ভাবনা গিবিশ কিভাবে আবিষ্কাব কবলেন? কোন শক্তিতেই বা তিনি কঠিন বেদান্তকে লোকগ্রাহ্য কবতে পাবলেন? এই কঠিন তত্ত্বাশ্রযী নাটকটিব অভিনয অভূতপূর্ব জনপ্রিযতা অর্জন কবেছিল। গিবিশচন্দ্রেব বিজযী প্রতিভাব রূপ বর্ণনা কবতে গিযে বেঙ্গলী পত্রিকা (১৯ মার্চ, ১৯১০) চৈতন্যলীলাব সঙ্গে শংকবাচার্যেব তুলনা কবেছিল। চৈতন্য লীলাব সাফল্য সহজতব কাবণ তাব বিষযবস্তু চিত্তোন্মাদী ভক্তি ও প্রেম, অপবপক্ষে শংকবাচার্যেব বিষয, শুষ্ক জ্ঞান।— হিন্দু দর্শনেব ছাত্র সবিস্ময়ে ভাবতে পাবে, শংকবাচার্যেব জীবন ও মতবাদ কিভাবে নাট্যবিষয হতে পাবে, বিশেষত এখন যখন লঘুতাই বঙ্গমঞ্চেব আশ্রয। কিন্তু আমাদেব গিবিশচন্দ্র বাহাত অসম্ভবকে সম্ভব কবেছেন, শুষ্ক বস্তুব মধ্যে প্রবেশ কবিযেছেন সজীব প্রাণবস, সর্পপ্রবাব

সুচির কাছে তা সমাদরের বস্তু হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই নাট্যাভিনয় সর্বাত্মকভাবে মাস্টারপিস, অজস্র শিরোভূষণ ভাবগ্রস্ত নাট্যকারের শিরে অর্পিত আর একটি নব অলংকার।" বিহারীলাল সরকার বঙ্গবাসী কাগজে প্রায় একই কথা লিখেছিলেন "যিনি জ্ঞানযোগী শঙ্করাচার্যের চরিত্রাবলম্বনে নাট্যরচনা করিতে পারেন, আর সেই নাট্যরচনার অভিনয়ে যিনি বঙ্গের লক্ষ-লক্ষ লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারেন, ধন্য তাঁহার লেখনী। জ্ঞানযোগীর জ্ঞানকথা সাধারণে কয়জন বুঝিতে পারে? কিন্তু গিরিশবাবু সেসব জ্ঞানকথার যেরূপ সহজ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে।" বিহারীলাল প্রশ্ন করেছিলেন, "ইতিহাসে শঙ্কর চরিত্রের বৈচিত্র্য কোথায়?" সেই বৈচিত্র্য—ঔচিত্য বজায় রেখে গিরিশ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই নাটকের ঐ অভূতপূর্ব সাফল্য। সে বৈচিত্র্যের রূপ গিরিশ কোথায় দেখেছেন তার উত্তর কিন্তু বিহারীলাল দেন নি। উত্তর খুঁজে পাই নাটকটির উৎসর্গপত্র থেকে। দক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্তকে দেখে তিনি দক্ষিণ ভাবের মূর্তিমান বেদান্তকে এঁকেছেন, আর দক্ষিণেশ্বরের বেদান্ত-বিগ্রহের আচার আচরণে বৈচিত্র্যের অন্ত ছিলনা। তার মধ্যে ছিল কঠিনতম বিষয়ের সহজতমভাবে প্রকাশের অলৌকিক ক্ষমতা। গিরিশচন্দ্র এই পরমাশ্চর্য সত্যটি রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের ফলে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শঙ্করাচার্যের দাব হতো দর্শন একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ধর্ম আর যা প্রত্যক্ষ ধর্ম তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এইসব দিক লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব রামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে ভক্তিসরোবরে গিরিশকে ডোবান নি, তিনি তাঁকে চৈতন্যময় করেছিলেন।

দুই বিদেশী লেখকের চোখে গিরিশ

গিরিশ রামকৃষ্ণকে কি করে পেলেন তার খণ্ড কাহিনী বর্তমান সংকলনে আছে—সে কাহিনী অসামান্য নিখিল অধ্যাত্মসাহিত্যের অনবদ্য রচিত কয়েকটি অধ্যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণলাভের পূর্ববর্তী আরও কিছু সংবাদ আছে—গিরিশের যন্ত্রণাজীবনের সেই বিবরণ ভূমিকারূপে উপস্থিত করা প্রয়োজন। যেমন জ্বালা তেমন কান্নার তুল্য কিছু আমরা অল্পই জেনেছি। গিরিশ তার হাহাস্বর তুলে দিয়েছিলেন তাঁর একটি গানের প্রথম ছত্রে—"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।" এরই বিপরীত দিকে ছিল আর এক সকরুণ আহ্বান—'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়! আয়!" এই দুই স্বর মিলিত হয়ে গিরিশ রামকৃষ্ণ গাথাকাব্যের সৃষ্টি। এই কাব্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণ নরেন্দ্র কাব্যের পার্থক্য আছে, যার ব্যঞ্জনা মেলে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম রামকৃষ্ণ সাক্ষাতে নরেন্দ্রের গাওয়া গানের প্রথম ছত্রে "মন চলো নিজ নিকেতনে।" সংসার বিদেশে আবদ্ধ নরেন্দ্র তার চিরদিনের

আবাসে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কারণ তিনি, রামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, অন্তরে মুক্ত। অপরপক্ষে গিরিশ আবদ্ধ এই সংসারে, তার কলুষে কর্দমে নিমজ্জিত সহস্র দংশনে ক্ষতবিক্ষত, তাই হাহাকার—"জুড়াইতে চাই।" সমুদ্র-ঈগলের মতো নরেন্দ্রর আকাশবিহার বিস্ফারিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, কিন্তু পৃথিবীবদ্ধ গিরিশের সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনীর মধ্যে মানুষ পায় সহমর্মিতার আশ্বাস। ইংরাজ সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ইশারউড গিরিশের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে বলেছেন

'শ্রীরামকৃষ্ণের সকল ভক্তের মধ্যে একজনের প্রতি সহানুভূতি আমি বিশেষভাবে অনুভব করেছি, তাঁর বিষয়ে পড়ামাত্র তাঁকে আমি পছন্দ করে ফেলেছি তিনি আমাকে গভীর আশ্বাস ও প্রেরণা দিয়েছেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কয়েকদিন আগে এক রাত্রে [ইশারউড তখন কলকাতায়] স্টার থিয়েটারে তীর্থযাত্রা করেছিলাম। থিয়েটারবাটির সম্মুখভাগ এবং ভিতরের দর্শকাসন পুনর্নির্মিত হয়েছে, কিন্তু মঞ্চের পিছনে দেখা যাবে পুরোনোকালে থিয়েটারের চেহারা কী ধরনের ছিল। যে থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ আসতেন সে থিয়েটারে এখনো পর্যন্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চে প্রবেশের আগে তাঁর ছবির সামনে প্রণাম করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ আমার মনে সাড়া জাগান কারণ তিনি আমার মতোই লেখক ছিলেন, আর অধিকাংশ লেখকই যা হয়ে থাকেন তিনি তাই—বোহেমিয়ান। বেশ 'রেসপেক্টেবল' বলতে সংস্কারবদ্ধভাবে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। কঠোর সন্ন্যাসীবাদী ব্যক্তিদের তিনি স্বেচ্ছা কলঙ্কাবীতে বিচলিত করতেন। তাদের তিনি শিউরে দিতেন। সেটা এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি যখন পড়ি যে গিরিশচন্দ্র বেহেড মাতাল হয়ে মধ্যরাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসেছেন—তাঁর সঙ্গে নাচতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণও একটুও রাগ না করে, বা গিরিশকে সামান্যতম তিরস্কার না করে তাঁর সঙ্গে নেচেছিলেন। আমরা পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে কত না প্রশ্রয় দিয়েছেন স্নেহ ভালবাসা ও রসিকতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন গিরিশ ঐ অপূর্ব মানুষটির ভালবাসা ও সাহচর্যের প্রভাবে ক্রমে বদলে গেছেন পরিবর্তনের মধ্যেও নিজের পুরোনো রূপ বহুলাংশে বজায় রেখেছেন—সর্বদাই সেই একই জমকালো ঝলমলে ব্যক্তিত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্পর্কের এই রূপটি আমার মন কেড়ে নেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তাঁর বহুধা ব্যক্তিত্বের এক অংশে মঞ্চের গৃহদেবতা কোনো-কোনো দিক দিয়ে সকল শিল্পেরই দেবতা তিনি। যাইহোক লেখক আমি—গিরিশের যে অসাধারণ ভক্তি অধ্যাত্মজীবনে তাঁকে উদ্ধার করেছিল, তার একাংশও আমি দাবি করতে পারি না, গিরিশের প্রতিভা বা মদ্যপানের ক্ষমতার অর্ধেকও আমার নেই, তথাপি আমরা কোনো কোনো দিক দিয়ে আত্মীয়, আর তাই শ্রীরামকৃষ্ণের অপরাপর কঠোর তপস্বী ভক্তদের কাছে নয়, গিরিশের

কাছেই প্রেরণার জন্য উপস্থিত হই।"[১৫]

ঈশারউড গিরিশের যে রূপ এঁকেছেন সেখান থেকে গিরিশ কিন্তু আরও সরে গিয়েছিলেন। বর্ণোজ্জ্বল আতিশয্যে পূর্ণ গিরিশ প্রশান্ত গভীর হয়ে কোন মহনীয় আকার ধারণ করেছিলেন, তার একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন মিসেস গ্রে হ্যালক নাম্নী বিদেশিনী মহিলা। ইনি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে গিয়েছিলেন এক আমেরিকান ডাক্তারের সঙ্গে—সেখানে ভিড়ের মধ্যে গিরিশকে দেখেন, এবং অবিলম্বে আকৃষ্ট হন। 'সর্বত্র উত্তাপ, ধূলি, বাঙালিদের ভাবভঙ্গি কথাবার্তা, চেঁচামেচি। এমনই পরিবেশে প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখি। এই শব্দ ও দৃশ্যের বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমাকে এক বন্ধু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু দূরে একদল লোকের মধ্যে এক বয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে—প্রচণ্ড প্রভাবশালী ভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব তাঁর। রোমান ধরনের মুখ। গাছতলায় সমবেত দলটি তিনি আকর্ষণের কেন্দ্র। নিশ্চয়ই তখন কোনো দীপ্ত সরস প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, ফলে সকলে হেসে উঠেছে। হাসিমুখে সিল্কের চাদর হাতের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে কাঁধে ফেলে (রোমান টোগার মতো) লোকটি আবারের পরিষাচ সেখান থেকে চলে গেলেন।' "উনি কে?" উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মিসেস হ্যালক। 'উনিই গিরিশচন্দ্র ঘোষ যাঁকে দেখাব বলে তোমাকে আনছিলাম কিন্তু উনি নিজেই চলে গিয়েছে'—সঙ্গী আমেরিকান ডাক্তার বলেছিলেন। ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচিত হতে মিসেস হ্যালকের আগ্রহের সীমা ছিল না কারণ বাঙালি চেহারার মধ্যে ওঁকে নাটকীয় মহিমা পূর্ণ কল্পনাতীত ছিল। 'তার পরেই আবার ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু আমার মনে রয়ে গেল এক অতৈত অবয়ব ও মর্যাদার আত্মচেতনা যার তুলনা ভারতে কদাচিৎ পেয়েছি। হিন্দু অপেক্ষা সে মুখ রোমের তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ, লৌহধূসর বর্ণ, কেশ এবং অস্বাভাবিক বৃহৎ কর্ণ।"

গিরিশের বাড়িতে মিসেস হ্যালক গিয়েছিলেন এরপর অনেকবার। গিরিশের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। প্রথম যে জিনিসটি তাঁকে আকৃষ্ট করে তা হল মহিলার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে গিরিশের সহজ স্বাভাবিক সৌজন্য সম্মত আচরণ, যা ভারতীয়দের মধ্যে তিনি সচরাচর দেখতে পান নি। শেষোক্ত ব্যাপারে অভিযোগ করলে গিরিশ ভারতীয় কুণ্ঠার কারণ বুঝিয়ে বলেন। গিরিশের চমৎকার ইংরেজির কথাও ইনি বলেছেন। কিন্তু সর্বদাই ঘুরে ফিরে এসেছে গিরিশের ব্যক্তিত্বের কথা, কুড়ি বছর পরেও যা লেখিকার চেতনায় প্রখর উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ।" শক্তি!—শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি!—তারই

ছাপ প্রধানাংশ তিনি মনে এঁকে দেন। নম্র হিন্দু' কথাটা কোনোভাবে তাঁর বিষয়ে প্রয়োগ করা যাবেনা যা অধিকাংশ হিন্দু পুরুষের মেয়েলি আচরণের মধ্যে দেখা যায়।" ভারতবর্ষে সদবস্তুর সন্ধানে এসে এই মহিলা অনেকসময়ে আশাহত হয়েছেন, তার নৈরাশ্যের মধ্যে গিরিশ তাঁর কাছে বরেণ্য আকার ধারণ করে কিভাবে আশাপূরণ করেছিলেন, তার বিস্তৃত উৎকৃষ্ট বর্ণনা ইনি করেছেন। তার কিছু অংশ

ভারত অনেক ঋষির জন্ম দিয়েছে কিন্তু স্বল্পসংখ্যক 'মানুষের।' এখানে সবাই দেখলাম একজন মানুষকে—জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছেন—তথাপি পৌরুষ শক্তি মাধুর্য ধৈর্য এবং অব্যাখ্যভক্তিতে পূর্ণ। এঁর বাঁধনছেঁড়া যৌবন সম্বন্ধে কাহিনী শুনে থাকলে একবার এই মনোহর বৃদ্ধ রোমক মুখের দিকে তাকালে ভাবতে পারব কী না সুপুরুষ ছিলেন ইনি যৌবনে। কী অপূর্ব প্রেমিক ছিলেন—উজ্জ্বল স্থির সুকুমার, ধীর সুকোমল এবং বিজয়ী—নারীর স্বপ্ন-কা... । সে নারীকে এবং তার প্রেমকে যেন ... আধিকার করেন আ... কিন্তু নীচ উদ্দেশ্য নেই পেমের শক্তিবা... নয়, যখন ধা... সে ... কদাপি অধিকারের লোলুপতায় নয়। এই বৃদ্ধের প্রতি ... শ্রদ্ধাবোধ ... মধ্যে ত্যাগ ... মতো সম্পদ ছিল ছিল শা... । ... কাছে পরে এরই গতিতে ঈশ্বর সমীপে। ... এই ঋষি ... দিব ... শব্দ—ঋষির দেশ যে ঋষিকে আ... । ভাবতে ... মধ্যে কে যে ... । ... ভারতে ... মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার বিপদে ... দাঁড়িয়ে থাকে ... এখানে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলাম যাঁর মধ্যে আছে প্রতিভা ও ... অর্জিত ... যিনি পৃথিবী সম্ভোগ ও ... ত্যাগ ... তথাপি এঁনে ... মধ্যে আছে ... শবপ্রচণ্ডতা ... সমকাল ও স্বদেশবাসীদের জন্য নিজের প্রতিভা ... সবকিছুই জেনেছেন, খ্যাতি বা ... ছাড়া ... খ্যাতিকে ... ঈশ্বরের পায়ে ...।"[১৬]

মৃত্যুর শিয়রে ছল এবং নাস্তিকতার কুঠার

যে ... নাবারব ছেড়ে আসছি এবার তাতে প্রবেশ করব—রাত্রি অন্ধকারে এক মানবযাত্রীর আলোকাভিযানের সেই কাহিনী। গিরিশের সম্বন্ধে স্মৃতিকথায় এবং গিরিশের জীবনীতে ছড়িয়ে আছে সেই বিবরণ। আমি কয়েকটি স্থলে রেখায়

১৬ Mrs Gray Hallock *Reminiscences of Girish Chandra Ghose Prabuddha Bharata* Oct 1936

সেই কাহিনী বলবার চেষ্টা করব।

গিরিশের চেয়ে দুর্ভাগা জীবন অল্পই সম্ভবপর। মানুষ তাঁর বাইরের উন্মত্ত ভোগের জীবনকে দেখবার কালে গভীরে সন্ধান করেনি—যদি করত দেখতে পেত, সেখানে আছে নির্যাতির অন্ধকার। সংক্ষেপে বলা চলে, এই মানুষটি সর্বদাই মৃত্যুর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত। পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত গিরিশ—জীবন জড়ানো কালো ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধরত। গিরিশের জীবনের আলোকিত প্রহরগুলোকে যাঁরা দেখছিলেন, তাঁরা জানেন নি যে, সেগুলি কালিন্দীতে ভাসিয়ে দেওয়া প্রদীপের মতো—নিমজ্জনের আগে মরণ-হাসিতে বাঙ্কিম।

পূর্বকথায় ফেরা যাক।

আমরা জেনেছি, অনেকগুলি কন্যার পর পুত্র গিরিশের জন্ম হয় ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী তিথিতে। তিনি অষ্টমগর্ভের ছেলে নিচাঁদা ছেলে। এমন সন্তানকে পেয়ে বাড়িতে আনন্দের অবধি ছিলনা, কিন্তু—মা, ছেলেটি মাতৃস্তন্য পেল না—মা অসুখে পড়লেন। ফলে যশোদা মাতার ভূমিকা নিলো বাড়ির বাগদিনী দাসী।

মা কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হলেন, কিন্তু যে মাতা পুত্রকে স্তন্যদানে অপারগ, তিনি স্নেহদান করতেও রাজি হলেন না। গিরিশকে তিনি অত্যন্ত অবহেলা করতেন, অকারণ তিক্ত শাসনের মধ্যে রাখতেন। গিরিশ বাল্যে জানলেন না মাতৃস্নেহ কাকে বলে। মায়ের ব্যবহারের রূপ ও তার কারণ গিরিশ পরবর্তীকালে স্বয়ং বলেছেন

"আদর প্রত্যাশায় যদি কখনো মার কাছে যাইতাম—মা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। যদি কখনও মিথ্যা কথা বলিতাম বা কাহাকেও গালি দিতাম, মা মুখের ভিতর গোবর টিপিয়া দিতেন। মার মুখে কখনও মিষ্ট কথা শুনিতে পাইতাম না, এজন্য মনে বড় কষ্ট হইত। একদিন আমার গায়ে ফোলা ফুলিয়া জ্বরে অঘোরে পড়িয়া আছি, শুনিলাম, মা বাবাকে বলিতেছেন, অতি ব্যাকুল হইয়াই বলিতেছেন 'তুমি যেমন করে পারো বাঁচাও।' বাবা জানিতেন, মা আমায় আদর করেন না বোধহয় তেমন ভালও বাসেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন 'তুমি যে এত ব্যাকুল হচ্ছ?' মা অতি কাতর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমি রাক্ষসী, এক সন্তান খেয়েছি [ইহার পূর্বে গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিত্যগোপালের মৃত্যু হইয়াছিল] এটি অষ্টম গর্ভের ছেলে, পাছে আমার দৃষ্টিতে কোনো অমঙ্গল হয়, তাই আমি একে কাছে আসতে দিতুম না, এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম, কোলে করিনি কখনো একটি মিষ্টি কথা বলিনি আমার হেনস্তায় কত কষ্ট পেয়েছে, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে'।"

মাতার গোপন স্নেহের কথা গিরিশচন্দ্র বড় দেরীতে জেনেছিলেন। এই জানার

কয়েক মাসের মধ্যে মায়ের মৃত্যু হয়। গিরিশের বয়স তখন এগারো।

গিরিশ অপরপক্ষে ভ্রাতৃস্নেহ কাকে বলে জেনেছিলেন। তাঁর বড় ভাই নিত্যগোপাল গিরিশকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। গিরিশের শিক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। পিতার উপযুক্ত সন্তান তিনি বিবাহিত, সংসারের আশা-ভরসার স্থল। তিনি মারা গেলেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে—মায়ের মৃত্যুর এক বছর আগে—গিরিশের বয়স তখন দশ।

পিতার স্নেহ গিরিশ অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছিলেন। সে অপরিমেয় স্নেহের প্লাবনে গিরিশ নিমজ্জিত থাকতেন। পিতা গিরিশকে কোনোদিন শাসন করেন নি তাঁর কোনো ইচ্ছায় তিনি বাধা দেননি। বিশেষত পত্নীর মৃত্যুর পরে পুত্রের প্রতি তাঁর বাধাবন্ধহারা ভালবাসা। গিরিশ আমৃত্যু তা স্মরণ করেছেন। পিতার নাম—নীলকমল নাটকের পর নাটকে গিরিশ শব্দটিকে পুজাপুষ্প করে তুলেছিলেন। কখনো লিখছেন, রাখি নীলকমলে হৃদকমলে—হবে ভোলা ভাবে ভোলা।' কখনো বা আকুল স্বরে "সংসারে মোরে সকলে—নীলকমল আঁখি খোলে।

পিতার যখন মৃত্যু হল তখন গিরিশের বয়স মাত্র চৌদ্দ।

গিরিশের নিতান্ত শৈশবে আরো একটি মৃত্যু ঘটেছিল, যা তাঁর চেতনায় অলক্ষ্য কিন্তু অনপনেয় ছায়াবিস্তার করে। গিরিশের থেকে দু'বছরের বড় এক বোন প্রসন্নবালী—শৈশবে ছোট ভাইটিকে সে অত্যন্ত ভালবাসত। গিরিশচন্দ্রকে সে আদর করিয়া 'গিরিভাই' বলিয়া ডাকত। গিরিভাইকে একবার কোলে করিতে পারিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। ছাতে গিরিশচন্দ্রের শুইবার কাঁথা শুকাইতেছে, হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়াছে, পাছে গিরিশ ভাইয়ের কাঁথা ভিজিয়া যায় বালিকা কাঁদিয়া আকুল। গিরিশকে কোলে লইবার জন্য বালিকা সতত সুযোগ খুঁজিত। কিন্তু পাছে কোলে তুলিয়া ফেলিয়া দেয়—এ নিমিত্ত বাটীর সকলকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত।" নানা কারণে বাড়ির সকলের ধারণা হয়েছিল বালিকা শুভসংস্কার সম্পন্ন। গিরিশের শৈশবে এই বালিকার মৃত্যু হয়। গিরিশ পরিণত বয়স পর্যন্ত এই বালিকার ভালবাসাকে নিজের ক্ষীণ শৈশব স্মৃতিতে এবং কল্পনায় লালন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। বারবার এই দিদিটির দেখা পেতে চেয়েছেন—কঠিন স্নেহহীন সংসারের মধ্যে 'স্বপ্নে যদি তুমি দেখা দাও একদিন—বলি, দিদি তোমায়—সংসার কি কঠিন।" মৃত্যুসমুদ্রের এপার থেকে ওপারের উদ্দেশে বৃদ্ধ গিরিশের কান্নার বার্তা "মনে পড়ে, কবে ধরে বলিতে আমায়— তুমি মার কাছে যাও, আমারে বিদায় দাও'।"

পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরে যখন কিশোর গিরিশের বিয়ে দিলেন তাঁর অভিভাবিকা বড়দিদি—তখন সে কাজ করেছিলেন ভ্রাতার সুখ ও শান্তির কাম-

নায়। তিনি চেয়েছিলেন অমঙ্গলের কালো ছায়া যেন দূর হয়ে যায় মঙ্গল প্রদী-পের আলোকে। *কিন্তু মঙ্গলদীপ নয়—গিরিশের জীবনে দাবানলই সত্য।* বিয়ের দিনের ঘটনা এইপ্রকার

'বিবাহের দিন কলিকাতায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। নিমতলায় একটি কাঠগোলায় আগুন লাগে। সেই আগুন ভীষণাকারে জ্বলিতে-জ্বলিতে বাগবাজার অভিমুখে ধাবিত হইয়া গিরিশচন্দ্রের বাটীর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোথায় বিবাহের আমোদ, আর এই আসন্ন সর্বনাশ! চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ। 'সর্বনাশ হল! গেল গেল!' শব্দে সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠে রাজপথ মুখরিত। 'জল আনো। জল আনো!' বাড়ির লোক ভয়ে কম্পমান। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিতেছেন। গৃহদেবতা শ্রীধরজীর দ্বারে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেছেন—'ঠাকুর রক্ষা করো! রক্ষা করো'!"

গিরিশচন্দ্রের বাড়ি 'আশ্চর্যভাবে" রক্ষা পেয়েছিল। তাঁদের বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিমে এক বৃহৎ তেঁতুলগাছ ছিল 'সেই বৃক্ষে অগ্নিনাশ আসিয়া প্রতিহত হয়" এবং তার শক্তি নিঃশেষিত" হয়ে যায়।

জীবনের দুর্ধর্ষতম কল্পনার রাত্রের এই অগ্নিকাণ্ড বাহ্যত নিঃশেষিত হলেও নিঃশেষিত হয়নি। এক দেড় বছরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের পঞ্চমা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর মৃত্যু হল। গিরিশের বয়স যখন তেইশ তখন জন্মাল তাঁর প্রথম পুত্র। প্রথম পুত্র!—পিতামাতার স্বপ্ন সাধের মূর্তি। সে পুত্র বছেক মাসের বেশি বাঁচেনি। পরের বছর গিরিশের মেজদাদার মৃত্যু হল। গিরিশের বয়স এখন ছাব্বিশ। অল্প বাহিত পরে মারা গেলেন গিরিশের তৃতীয় ভ্রাতা কানাইলাল। গিরিশের সঙ্গে এই ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান ছিল অল্প, ইনি গিরিশের প্রিয় সুহৃদের মতো ছিলেন। মৃত্যুর সামান্য আগে এঁর বিয়ে হয়।

এর পরে গিরিশচন্দ্র ছয় বছরের জন্য অব্যাহতি পেলেন—মৃত্যুযন্ত্রণার হাত থেকে। এই সময়েই, ১৮৬৮ সালে গিরিশের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়—যাঁর মৃত্যু গিরিশকে দেখে যেতে হয়নি, অভিনেতা হিসাবে পরে যিনি গিরিশের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। সে পুত্র সুবিখ্যাত—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—দানীবাবু নামেই পরিচিত। এই ছয় বছর গিরিশচন্দ্র অব্যাহত গৃহশান্তি এবং বহির্গত খ্যাতি পেয়েছিলেন।

গিরিশ ত্রিবিশে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অপেক্ষায় অস্থির দুর্ভাগ্য দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ শুরু করে দিল। সন্তান প্রসব করে তাঁর পত্নী সূচিকায় আক্রান্ত হলেন। সন্তানটি বাঁচল না। অল্পদিন পরে গিরিশের ছোটভাই ক্ষীরোদচন্দ্র মারা গেলেন—একুশ বছর বয়সে। কয়েকমাস পরে মারা গেলেন গিরিশের তৃতীয় ভগিনী—চল্লিশ বছর বয়সে। তার কয়েকমাস পরে মারা গেলেন গিরিশের পত্নী দীর্ঘ রোগভোগের

পরে। গিরিশের বয়স তখন—তিরিশ বছর নয় মাস।

গিরিশ তাঁর পত্নীকে বিশেষ ভালবাসতেন (উচ্ছৃঙ্খলতা পত্নীপ্রেমকে নষ্ট করতে পারেনি), পত্নীর যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। পত্নীর মৃত্যু তাঁকে দিশাহারা করে ফেলেছিল। চারিদিকে শুধু অন্ধকার। অন্ধকারই আশ্রয়—অন্ধকারই অবলম্বন। গাঢ় প্রেমে সর্পচুম্বন করার মতো অন্ধকারকে আলিঙ্গন করে গিরিশ লিখলেন 'তোমায় জানে না যবে তাই তো তোমারে ডরে অসময়ে তুমি সখা কেহ নাহি আর।" যখন—'জ্বলে শুধু স্মৃতি চিতে চিতানল প্রায়"—তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।"

তিরিশ বছর বয়সে এই গভীর চিত্তসংকটের কালে গিরিশের কাছে কেন 'অন্ধকার" একদিন সখা" হয়ে উঠেছিল তার হেতু গিরিশের আত্মকাহিনী এবং জীবনকথাতে পাওয়া যায়। আমরা দেখি, গিরিশ একালের আগে ঈশ্বরকে ডাকার ইচ্ছা স্বেচ্ছায় বর্জন করেছেন। গিরিশ তখন নাস্তিক।

গিরিশের ধর্মজীবনকথাকে পূর্বাপর অনুসরণ করলে দেখব বাল্যকালে সে কালের হিন্দু বালকদের মতো তিনি রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কাহিনীতে নিমজ্জিত ছিলেন। সহজ ভক্তি বিশ্বাস অর্জন করে ছিলেন। সেকথা আগে বলেছি। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ জাগতে লাগল তার মধ্যে। মৃত্যু-মিছিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিভাবান অনুভূতিশীল তরুণের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। স্বভাবে প্রচণ্ডতা ছিল বলে তাঁর প্রশ্ন উপনীত হয়েছিল সংশয়ে এবং বিদ্রোহে। ভাবালুতাকে চূর্ণ করার অধীর আবেগে তিনি কালাপাহাড় হয়ে উঠলেন।—ঠিকভাবে বলতে গেলে ঐ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অধীরতা দেখালেন। দেখা যায় যৌবনের প্রারম্ভে পাড়ার 'বখাটে দলের" নেতারূপে তিনি নানা অপকর্ম করছেন, অধিকন্তু 'ভণ্ড সন্ন্যাসীদের দণ্ড' দিচ্ছেন। সেখানেও থামলেন না, খাঁটি কালাপাহাড় হবার চেষ্টাও করলেন। তার যৌবনকালের একটি ঘটনা এই:

শারদীয়া পূজার পরদিন প্রভাতে বাটীর লোক উঠিয়া দেখিল—বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে কাহারা প্রতিমা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাটীতে বহু লোকের সমাগমে একটা কোলাহল উত্থিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িলেন। বহির্বাটীতে দশভুজা প্রতিমাদর্শনে বুঝিলেন—পাড়ার জনকতক দুষ্ট লোকের এই কীর্তি। তিনিও তাহাদের কীর্তি লোপ করিবার জন্য কালাপাহাড়মূর্তি ধারণ করিলেন। মদ্যপান করিয়া কোথা হইতে একখানি কুঠার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রতিমা খণ্ড বিখণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন। 'করিস কি, করিস কি' বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে [বড়দিদি] কৃষ্ণকিশোরী ছুটিয়া আসিলেন। বাড়িতে কান্না পড়িয়া গেল। [কিন্তু] তাঁহার সেই সংহারমূর্তি দর্শনে অন্য কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিল না, একে-একে সকলেই সরিয়া পড়িল।

ধ্বংসকার্য শেষ করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রতিমার এক-এক টুকরা তাঁহাদের খিড়কির বাগানের এক আমগাছতলায় লইয়া গিয়া স্তূপীকৃত করিলেন। পরে সমস্ত দিন ধরিয়া সেইগুলি মাটিতে পুঁতিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।"

বিশ্বাসের তটরেখায় অলৌকিক আকার

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে গিরিশের যেসব লেখা এই সংকলনে আছে তাদের মধ্যে গিরিশ তাঁর যৌবনের নাস্তিকতার মূলে পাশ্চাত্ত্য নাস্তিক্যদর্শনের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। গিরিশের নাস্তিকতা কিন্তু স্বতসিদ্ধ অবিশ্বাস ছিলনা। বস্তুত তা ছিল সহজাত আস্তিকতার সঙ্গে তাণ্ডবের যুদ্ধঘোষণা। ঐ প্রদাহী নাস্তিকতা তাঁকে নিরন্তর দগ্ধ করেছে, নাস্তিকতায় তিনি শান্তি পাননি। ১৮৬৭ সালে তাঁর বন্ধু কালীনাথ ঘোষ নিজের ডায়েরিতে গিরিশের ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা লেখার পরে [' What a dreadful word he says he has no belief in the existence of the Almighty !'] যোগ করেছেন— 'গিরিশ কিন্তু স্বীকার করেছেন, ঈশ্বরনির্ভরতায় সুখ আছে।" এইখানে গিরিশ রবীন্দ্রনাথের মহামানী দুর্যোধনের মতোই বলতে চেয়েছেন 'সুখ নাহি চাহি মহারাজ জয় চেয়েছিনু।"

জয় কিন্তু তার ভাগ্যে নয়—যন্ত্রণাই সার। ছুটে বেড়াতে লাগলেন আস্তিকতা ও নাস্তিকতার মধ্যে। নানা ধর্মসম্প্রদায়ে গেলেন তাদের ধরলেন আবার অশান্ত হয়ে তাদের ছাড়লেন। আত্মপ্রবঞ্চনাও করতে চাইলেন

'তিনি [গিরিশচন্দ্র] বলিতেন, নাস্তিকতার ঘোর দুর্দিনেও তিনি গঙ্গাস্নানে যাইয়া বাম তর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃত পিতামাতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেন। তাহার মনে হইত আমি (দেবদেবী পরলোক প্রভৃতির নাস্তিত্ব সম্বন্ধে) যাহা বুঝিতেছি, তাহা যদি ভ্রম হয় এবং সন্তানের নিকট হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ জলাঞ্জলি পাইয়া মৃত পিতামাতার যদিই কোনোরূপ তৃপ্তি হয়, তবে তো তর্পণ না করায় অপরাধী হইব। সেইজন্য ঐরূপ করিতাম'।"[17]

আমরা দেখেছি, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে গিরিশচন্দ্র নাস্তিকতার অভিমানে ঈশ্বরকে ডাকতে না পেরে অন্ধকারকে শান্তিসদন ভেবেছিলেন। পত্নীবিয়োগের পরই চাকুরিস্থলে গণ্ডগোল দেখা গেল। চাকরিসূত্রে তাঁকে ভাগলপুর গিয়ে কিছুদিন কাটাতে হল। সেইসময়ে গভীর আত্মজিজ্ঞাসায় তিনি মথিত ছিলেন। যে নাস্তিকতার প্রেরণায় সৃষ্টিকে জড়োদ্ভূত এবং জড় পরিণাম বলে ধারণা করেছেন—সৃষ্টি কি সত্যিই তাই? জড় জগৎ যতই সুন্দর হউক, সে জড় মানব হৃদয়ের বেদনা বোঝে না। ব্যথিত হৃদয় যে সহানুভূতি অন্বেষণ করে, জড় সে

১৭ শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধ।

সহানুভূতি দিতে অক্ষম। সত্যই কি জড়ের অন্তরালে কিছু আছে?"

এই ভাগলপুরেই দুটি ঘটনা ঘটে, যা তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। একটি ঘটনা হল বন্ধুদের সঙ্গে ভাগলপুরের কাছাকাছি একটি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে কৌতূহলবশে একটি গহ্বরে একাকী নেমে পড়েন, কিন্তু কিছুতে সেখান থেকে উঠে আসতে পারেন নি। সেই সংকটে বন্ধুরা তাঁকে ধিক্কার দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন—তুমি নাস্তিক বলেই এই বিপদ এখন আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরকে ডাকলেই মাত্র ত্রাণ পাওয়া সম্ভব। বন্ধুদের কাতর অনুরোধে গিরিশ ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন "এবং আশ্চর্যের বিষয় ডাকিবার পরই গহ্বর হইতে উঠিবার একটি অদৃষ্টপূর্ব উপায় তাহার নয়নপথে পতিত হইল।"

ব্যাপারটা কাকতালীয় হওয়া খুবই সম্ভব, কিন্তু গিরিশের অবিশ্বাস এতে ধাক্কা খেয়েছিল। আর একটি ব্যাপারে গিরিশের আত্মাভিমান প্রচণ্ডভাবে আহত হয়। ভাগলপুর থেকে কলকাতা ফেরার ঠিক আগের দিন তাঁর যথাসর্বস্ব চুরি হয়। এমন অবস্থা যে এক প্রতিবাসীর কাছে দশ টাকা ধার চাইতে হয়। তিনি উত্তর দেন দশ টাকা ধার দেব না তবে পাঁচ টাকা দান করব। সেই ভিক্ষার দান নিয়ে গিরিশকে বাড়ি ফিরতে হয়। [গিরিশচন্দ্র] বলতেন 'অতি দুঃখেও সহজে আমার চক্ষে জল পড়ে না কিন্তু এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।' পরে ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরলে গিরিশ যখন টাকাগুলি ফিরিয়ে দিতে গেলেন, তখন তিনি বলেন, আমি তো তোমায় টাকাগুলি দান করেছি। গিরিশচন্দ্র বলিতেন 'এ কথার উত্তর আমার জিহ্বায় আসিয়াছিল কিন্তু যেরূপেই হউক উপকৃত হইয়াছি, [তাই] কিছু না বলিয়া পাঁচটি টাকা তাঁহার কাছে রাখিয়া নমস্কারপূর্বক চলিয়া আসিলাম'।'

দম্ভী গিরিশ বুঝেছিলেন নিঃস্ব হওয়া কাকে বলে। 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব করেছ চূর।' জানি না, বাল্যকালে পিতার কাছে প্রাপ্ত শিক্ষা এই সময়ে তাঁর মনে পড়েছিল কিনা। গিরিশের পিতা পত্নীবিয়োগের পরে ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় চিকিৎসকদের নির্দেশে গঙ্গায় নৌকায় সপরিবারে ভ্রমণ করেছিলেন। 'কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন নবদ্বীপ সন্নিকটে নৌকা উপস্থিত হইলে সহসা তুফান উঠিল, নৌকা ভীষণ দুলিতে লাগিল, যেন এখনি ডুবিবে। জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় গিরিশ পিতার হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। মাঝি অতি কষ্টে খড়ে নদীর ভিতর গিয়া নৌকা রক্ষা করিল। এই নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে নীলকমলবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, 'তুই আমার হাত ধরেছিলি যে। আমার নিজের প্রাণ বড় না তোর? যদি নৌকা ডুবত আমি হাত ছিনিয়ে নিতুম, যেমন করে পারি আপনাকেই বাঁচাতুম।' গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'বাবার কথায় হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু শিখিয়াছিলাম যে, বিপদে এক

ভগবান ভিন্ন হাত ধরিবার আর কেহ নাই'।"

গিরিশচন্দ্র শিখিয়াছিলেন এবং ভুলিয়াছিলেন। পরিণত জীবনে বহু মূল্য দিয়ে তিনি বাল্যশিক্ষাটিকে ফেরত পান।

১৮৭৬ সাল নাগাদ, যখন গিরিশের বয়স ৩২ তখন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়—পত্নী বিহারীলাল মিত্রের কন্যা সুরতকুমারী। এই বিয়ের রাত্রে অবশ্য অগ্নিকাণ্ড হয়নি, কিন্তু ছয় মাস পরে গিরিশের কলেরা হল মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু বেঁচে গেলেন কোনো অলৌকিক ঘটনায়। গিরিশ সে কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে প্রচলিত বাস্তবতার সীমারেখা বিধ্বস্ত। ঘটনাটি সংকলন-মধ্যে উৎকলিত আছে। শ্রীশচন্দ্র মতিলালের উক্ত রচনার মধ্যে আমরা দেখছি মৃত্যুপথযাত্রী গিরিশ অন্তশ্চক্ষুতে করুণাময়ী মাতৃমূর্তি দর্শন করেছিলেন, ও তাঁর প্রদত্ত মহাপ্রসাদ সেবা করে রক্ষা পেয়েছিলেন, বহু বৎসর পরে সারদাদেবীকে দর্শন ক'রে বুঝতে পারেন স্বপ্নের দেবী ও সাক্ষাতের সারদামণি একই মাতা ইত্যাদি।

আমাদের অজ্ঞাত এই অধ্যাত্মরাজ্যের সংবাদসূত্রে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারছি—রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের অনেক আগেই রামকৃষ্ণ গিরিশের জীবনে আবর্তিত—রামকৃষ্ণ-শক্তি তার মধ্য দিয়ে। অলৌকিকতার প্রশ্ন য বলব—গিরিশকে বাঁচানো হয়েছিল বিশেষ উদ্দেশ্যেই। অবিশ্বাসের কুঠারে খণ্ড খণ্ড মাতৃমূর্তিকে বিশ্বাসের উত্তাপে জুড়ে দাঁড় করাবার ঐ গিরিশকে দিয়েই প্রতিষ্ঠা করাতে হবে। গিরিশের শেষজীবনের সেই দুর্গাপূজা এবং তাতে সারদাদেবীর আগমনের কাহিনী এই সংকলনেই আছে।

বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা চূর্ণ হয়েছে এমন কাহিনী গিরিশের জীবনে অনেকই মেলে। গিরিশের অধ্যাত্মজীবনের কাহিনী বর্ণনার সময়ে সেই সংবাদগুলিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই কাহিনীগুলিতে অন্তত একটি জিনিস আছে—প্রবলতা। সেগুলি [illegible] ভক্তের আচ্ছন্ন চেতনার বিচিত্রদর্শন নয়।

কলেরা থেকে বাঁচার পরেও গিরিশের বিপদ কাটেনি। গিরিশ নিজেই বলেছেন 'বন্ধুবান্ধবহীন, চারিদিকে বিপজ্জাল দৃঢ়পণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সুযোগ দান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম হে ঈশ্বর! যদি থাকো এ অকূলে কূল দাও।'

গিরিশচন্দ্র কখনো তটরেখা দেখলেন আবার কখনো তা নয়নের অন্তরালে সরে গেল। তিনি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ করলেন বিশ্বাস করলেন যে তারকনাথ তাঁকে বিপন্মুক্ত করতে পারেন। তারকেশ্বরে গমন, প্রার্থনা ও তারপরেই বিপন্মুক্তি ঘটল দেখে গিরিশের দেবতায় বিশ্বাস এল। এসব কথা গিরিশ-সংকলনে

গৃহীত "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" প্রবন্ধে বলেছেন।

শিবের মতো কালীতেও গিরিশ বিশ্বাস করলেন। তিনি নিয়মিত কালীঘাটে যেতে লাগলেন, এবং মাতার দর্শনের জন্য কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, প্রার্থনার সঙ্গে আত্মোৎসর্গের চেতনাও যুক্ত করে দিলেন 'যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে বসিয়া মাকে ঐরূপে ডাকিতাম কেননা মনে হইত ঐ স্থান হইতে অনেক প্রাণী জীবনের জন্য কাতর আর্তনাদ করিয়া মাতার করুণায় অনন্ত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।"

এমনি সময়ে একদিন অনন্ত জীবনের একটি শর এসে তাঁর বুকে বিঁধে গেল। তারই আতঙ্ক বিস্ফারিত অথচ সহর্ষ বর্ণনা এইরূপ

শ্রীযুক্ত গিরিশ এই সময়ে অভিনয়ান্তে একদিন নির্জনে অন্ধকারে বসিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকাতরে ডাকিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ হইতেছে এবং দূর হইতে কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। 'গিরিশ তুই আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিস আমি আসিয়াছি দ্যাখ। ইহজীবনের যত কিছু আশা ভরসা আনন্দ উল্লাস—সর্বস্ব অন্তর হইতে পরিত্যাগ করিয়া দ্যাখ—কারণ নিজে শব না হইলে কেহ কখনো শবশিবাকে দেখিতে পায় না। এবং আমার দর্শনলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখনো ফিরিয়া আসে না। অতএব শব হইয়া আমাকে দেখিতে প্রস্তুত হও মুহূর্তমাত্র পরেই আমি তোর সম্মুখে আসিতেছি।'

গিরিশচন্দ্র বলিতেন ঐরূপ শুনিবামাত্র প্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং এখনি কি হইবে আমার পুত্রকন্যার এবং আমার মুখাপেক্ষী আত্মীয় ও বন্ধু-বর্গের কি দশা হইবে সে সকল কথা যুগপৎ মনে উদিত হইল। তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলাম না আমি ঐরূপে তোমাকে এখন দেখিতে পারিব না। তখন পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—'আচ্ছা, না দেখবি তো আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর। আমার আগমন কখনো ব্যর্থ হয় না। ইহ-সংসারে যাহা কিছু তোর ইচ্ছা হয় তাহাই চাহিয়া নে।' তখন রূপরসাদিবিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থসকলের যে কোনটি বাছিয়া লইব বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি তদুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম ছবি জ্বলন্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়া পূর্ব হইতে মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হৃদয়ের সম্মুখে ধারণ করিতে লাগিল। তখন সভয়ে বলিয়া উঠিলাম—আমি বর লইব না। ধীরে গম্ভীর স্বরে পুনরায় উত্তর আসিল—'আমার আগমন কখনই ব্যর্থ হইবে না। যদি বরও না লইবি তো আমায় ডাকিয়া আনিলি কেন? আমার অভিসম্পাত গ্রহণ কর—আমার এ উদ্যত খড়্গ তোর কিসের উপর পতিত হইয়া বিনষ্ট করিবে, তাহা বল।' শুনিয়া মনে ভীষণ ভয় হইল। কিন্তু ভয় হইলেও বিবেকবুদ্ধি বলিয়া উঠিল—দেবতাকে মন্দ দ্রব্য দিতে

নাই। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—মা সুনট বলিয়া আমার যে-সুনাম আছে, তাহার উপর তোমার খড়্গ পতিত হউক। উত্তর আসিল—'তথাস্তু।' পরে আর কিছু দেখিলাম না, শুনিতেও পাইলাম না। শাস্ত্রে যে বলিতে শুনিয়াছি, দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য—'ক্রোধোপি দেবস্য বরেন তুল্য'—আমি তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কারণ ঐ দর্শনের পর হইতে সত্যসত্যই আমার নটত্ব-যশকে আমার সুলেখক বলিয়া খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।"

দারুণ এক অধ্যাত্মকাহিনী। বিস্ময়কর, শ্বাসরোধী আতঙ্কজনক। প্রব্যথিত কণ্ঠস্বরে পূর্ণ। কালযবনিকা সরে গিয়ে ভয়ঙ্কর এক দৃশ্যনাট্যের সম্মুখীন আমরা। আমরা উপলব্ধি করি, অধ্যাত্মমার্গের বিরাট পুরুষদের জীবনে বিশ্বরূপ দর্শন অবধারিত, এবং প্রথম দর্শনে তাঁরা প্রায়শ ভয়ার্ত। পৌরাণিক অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনে আতঙ্কের কথা বিদিত, নিকটকালে রামকৃষ্ণ স্পর্শে শূন্যলীন নরেন্দ্রনাথের আর্তনাদের কথাও জেনেছি। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য শীঘ্রই ঐ লোকে প্রস্থানের সহজ অধিকার লাভ করেছিলেন। 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর' সঙ্গীতে তাঁর সেই যাত্রা বিবরণ আছে। পরবর্তীকালে লোকক্ষয়ী সৃষ্টিনাশী মহাকালীকে দেখে তিনি সোল্লাসে 'কালী দি মাদার' নামক মহাকালী উপনিষদও লিখেছেন। গিরিশ কিন্তু ঐ দর্শনের সুযোগ পেয়েও তাকে গ্রহণ করতে পারেননি, সে শক্তি তাঁর হয়নি। তার কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন। "[গিরিশ] প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন ইহ সংসারের সমস্ত বাসনা কামনা মন হইতে ত্যাগ না হইলে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে কেহ কখনো সমর্থ হয়না। বুঝিয়াছিলেন যে, অসদভিসন্ধি তাঁহার মন হইতে অনেকাংশে দূর হইলেও বাসনা সমূহের হস্ত হইতে এককালে মুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি এখন দেবীর দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না।'

এই কাহিনীর কি বস্তুভিত্তি আছে নাকি গিরিশের মনকল্পিত? গিরিশের কাছে অনেকেই শেষোক্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গিরিশ কিন্তু 'কখনো তৎসম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট উহা মানবিক জল্পনা কল্পনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত, শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপাপ্রসূত এক অদ্ভুত ব্যাপার।"

এই কালে গিরিশের রোমাঞ্চিত প্রাপ্তির শিহরণকারী বিবরণ দিয়েছেন নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু। গিরিশের সঙ্গে অমৃতলালের বিয়াল্লিশ বৎসরের সৌহার্দ্য। তিনি নাট্যরচনা করেছেন গিরিশেরই অনুপ্রেরণায়, নাট্যকলার অনেক জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছেন। অমৃতলাল গিরিশকে গুরু বলতেন। এই গুরু বলার কারণ কিন্তু গভীরতর—'নাট্যবিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর।"

সেই 'উচ্চতর" কারণটি অমৃতলাল দৃষ্টান্তযোগে জানিয়েছেন। অমৃতলাল

যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আসেন, তদনুযায়ী প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বিবেচনা করে ফেলেন। থিয়েটারে যোগ দেবার পরে ভাবলেন, ঈশ্বরকে ডাকবার কোনো অধিকার তাঁর নেই। তিনি তখন "দেবতার দ্বার হইতে বহুদূরে অন্ধকারে।" এমনই অবস্থায় একদিন তিনি গাড়ি করে গিরিশের সঙ্গে থিয়েটারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, পথে বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীতলা এলে গিরিশ মাকে প্রণাম করলেন। অমৃতলাল তা করলেন না। তারপর শোভাবাজারে পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে যখন গিরিশ প্রণাম করলেন অমৃতলাল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। গিরিশ প্রশ্ন করলেন, "মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন?" অমৃতলাল বললেন "ও বাবা ঠাকুরটি অপয়া।' গিরিশ সুযোগ পেলেন বললেন "অপয়া বলে তো বেশ বিশ্বাস আছে তোমার' যাইহোক ঐ বিশ্বাসটি ঠিক রেখো ও ঠাকুরের মুখ দেখো না।" কথাটা অমৃতলালের মনে লাগল। তিনি নিজের আত্মখণ্ডন দেখতে পেলেন 'যদি অপয়া বিশ্বাস করি তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন?" এর পরে কী হল, সে সম্বন্ধে অমৃতলালের বিস্ময়কর বিবরণ—সরাসরি উদ্ধৃত করি

গিরিশবাবুর জীবনে তখন একটা অসাধারণ পরিবর্তনের অবস্থা—ঘোর অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী গিরিশের রসনা তখন 'মা মা' রবে মুখরিত। তিনি অনবরত 'মা মা মা কালী, কালী করালবদনা' ইত্যাদি উচ্চারণ করেন আর আমরা দেখিতে পাই যে তাহার বক্ষ যেন শত হস্ত স্ফীত হয়, মুখমণ্ডল যেন এক অনৈসর্গিক তেজে সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে। তাঁহার বিশ্বাস তখন এত দৃঢ় এত সংশয়ের ছায়া-শূন্য যে তিনি দর্প করিয়া বলিতেন, বেটীকে গাল ভরে, বুক ভরে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাবো তাই পাবো।' সভ্যসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছি যে, মা কালী করালবদনা ইত্যাদি স্তোত্রপাঠ করিয়া গিরিশবাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের মজ্জাগত বহুদিনব্যাপী পুরাতন পীড়ার উপশম করিয়াছেন ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। [গিরিশের এই ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনীতে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই সিদ্ধাই হরণ করে নেন তাও জেনেছি]। পরে একদিন মৃণালিনী নাটকে পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে তাহার এমন অবস্থা হয় যে তিনি সেইদিন সেইসময়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি মার নিকট শক্তি চাহিব না কিছু চাহিব না, ক্ষমতা জাহির করিব না। আমাদেরও বলিতেন, মাকে ডাকো কিন্তু কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ নেই।' [চাইবার রিপঞ্জনক' পরিণামের বিবরণ উপরে দিয়েছি]।

গিরিশবাবু মা মা করিতো, তাই থিয়েটারের অন্যান্য সকলেও মা-মা করিত, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বচন আওড়াইতাম, কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি হইত না, কেমন ফাঁকা ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা থিয়েটারে স্টেজের উপর বসিয়া আছি, সেদিন যেটুকু রিহার্সাল দেবার কার্য ছিল তাহা সকাল-সকাল শেষ হইয়া গিয়াছে, গিরিশবাবু

আমাদের সঙ্গে মার নাম সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছেন—এমন সময়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা কাতরতা আসিল, বেদনায় কণ্ঠে অতি দীনভাবে গিরিশবাবুকে বলিলাম, 'মশায়, আমি তো একরকম ছিলাম, আপনার দেখাদেখি এখন 'মা-মা' করিয়া ডাকি, কিন্তু তাতে প্রাণের ভিতর যেন আরও ফাঁক পড়িয়া যায়, এর চেয়ে না ডাকা ছিল ভালো।' গিরিশবাবু প্রায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'শোনো—এদিকে এসো।' স্টেজের মাঝখানে একখানি সিন জোড়া ছিল, তাহার পশ্চাতে সব অন্ধকার। গিরিশবাবু সেখানে গিয়া আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে সেইরূপভাবে সম্মুখে বসিতে বলিলেন। পরে আমার দুই উরুতে তাঁহার দুইখানি হস্ত স্থাপন করিয়া অসুর নাশিনী শ্যামা নামের কোনো স্তোত্র বিশেষ ঘন-ঘন পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশমতো আমিও তাঁহার দুই উরুতে হস্ত দিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ভিতরে যেন কি-একটা সুখদ বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, কম্পিতকলেবর কম্পিতকণ্ঠে আমি গিরিশবাবুর পা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম 'গুরু, গুরু। আজ তুমি আমায় মাকে ডাকাইয়াছ। এ শান্তি—এ উল্লাস—এ আনন্দ—আর আমি কখনও অনুভব করি নাই।' লোকে জানে, গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু আমি জানি —তিনি আমায় মনুষ্যত্বের গুরু।'

এই ঘটনা কোন সময়ের? খুব সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশের পরিচয়ের পূর্বকালের ঘটনা। তা যদি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে, গিরিশ পূর্বেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সত্তার মর্মমধ্যে অনুভব করেছেন। কিন্তু তিনি তখন বাহ্যত প্রমত্ত, ভোগে বেপরোয়া, বক্র—তীক্ষ্ণ সংশয়, উদ্বেল ভক্তিকে সংবৃত রাখার চেষ্টায় ব্যঙ্গমুখর। তিনি চৈতন্যলীলা লিখেছেন এবং অভিনয়ে দেশকে ভাসিয়েছেন ভক্তি-প্লাবনে—যা কেবল পেটের দায়ে লেখা বইয়ের দ্বারা ঘটানো সম্ভব ছিল না—অথচ তাই তিনি সদর্পে বলতেন। কিংবা তা ঘটানো সম্ভব ছিলনা দ্রব্যগুণের শক্তিতে, যা নাকি এক বৈষ্ণব বাবাজিকে বলেছিলেন। উক্ত বাবাজি একদিন ভোর-বেলায় গিরিশকে ভক্তি জানাতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সকালে খোয়ারি ভাঙার সময়ে বাবাজির শ্রদ্ধাবাহুল্য গিরিশের অসহ্য লেগেছিল, তবু অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরেছিলেন এবং যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যখন বাবাজি গিরিশকে বোঝাবেনই যে, প্রভুর অশেষ কৃপাতেই ও জিনিস তিনি লিখতে পেরেছেন, তখন গিরিশ বিছানার তলা থেকে বোতল বার করে বলেছিলেন—করুণা যদি কারও থাকে সে এঁর।

অর্থাৎ গিরিশের অবস্থা তখন সহসা-চক্ষুষ্মান অন্ধের মতো, আলোকিত জগতে যে দিশাহারা এবং আলোককে জীবনসত্য মনে করতে অসমর্থ। গিরিশ এমন গুরু

খ‍ু'জেছিলেন, যিনি লব্ধ আলোক এবং আলোকেব উৎস—দ‍ুই প্রান্তের মধ্যে যোগ-সাধন করে দেবেন। সে গ‍ুর‍ু—আত্মাভিমানী গিরিশ চেয়েছিলেন—অন্য কেউ হলে চলবে না—তিনি হবেন স্বয়ং দেহধাবী ঈশ্বব।

এমনই অবস্থায রামকৃষ্ণে সঙ্গে গিরিশেব পরিচয।

রামকৃষ্ণ-ভুবনে গিরিশের জীবন

রামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশের পরিচয গিরিশেব প্রাপ্তি ও র‍ুপান্তরেব কাহিনীই বর্তমান সংকলনেব ম‍ূল বিষযবস্তু। আশ্চর্য সেই কাহিনী—ধর্মসাহিত্য ও জীবনীসাহিত্য বত্নৈশ্বর্য প‍ূর্ণ হযেছে রামকৃষ্ণ গিরিশেব সম্পর্ক-কথায। মহানাট্য, মহাকাব্যেব উপাদান আছে ঐ কাহিনীব মধ্যে, তা অপেক্ষা করে আছে নব মহাকবিব জন্য যিনি এই মহাবস্তবদান থেকে নব 'কথা ও কাহিনী' রচনা করবেন, কিংবা 'লাইট অব এশিযা' কাব্যেব নব র‍ূপাযণ—যাব নাম হবে—'চৈতন্যেব আলো।' ঐ রসেব উপাদান ভাগ পাঠক গিরিশেব নিজেব রচনা এবং তাঁর সম্বন্ধীয রচনাগ‍ুলি থেকে পেযে যাবেন। আমি কেবল এখানে সংকলনে গৃহীত রচনাগ‍ুলিব কিছ‍ু বিশেষ বক্তব্যেব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

সেকথার আগে বলে নিই—এই গ্রন্থের দ‍ুই ভাগ—প্রথম ভাগে গিরিশের নিজের লেখাগ‍ুলি সংকলিত। অনেকগ‍ুলি লেখা প‍ুরোপ‍ুরি দিযেছি, আবার কোনো কোনো লেখার অংশাবশেষ বর্জিত হযেছে, যাদের প্রাসঙ্গিকতা এখন নেই।

প্রথম ভাগের লেখাগ‍ুলিতে রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে গিরিশের আত্মকথায় আত্মসংকোচ সম্ভাবিত। কতটা প্রকাশযোগ্য এবং কতটা নয, সে সম্বন্ধে তিনি দ্বিধান্বিত থাকতে পারেন। ফলে প্রযোজনীয় অনেক কিছ‍ুই ঢাকা পড়ে থাকার সম্ভাবনা ছিল—যার ক্ষতিপূরণ কিন্তু হযেছে দ্বিতীয খণ্ডে।

দ্বিতীয ভাগে আছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সঙ্গে গিরিশের সম্পর্কের বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের রচনা। স‍ুগভীর জীবনরসে রচনাগ‍ুলি প‍ূর্ণ।

রামকৃষ্ণ ভুবনে প্রবিষ্ট গিরিশের আত্মকথাগ‍ুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট আত্মজীবনীর রস রযেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য রচনা "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব," "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ," 'শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তচ‍ূড়ামণি রামচন্দ্র দত্ত।" প্রথম লেখাটিতে গিরিশের প্রথম ও পরবর্তী রামকৃষ্ণ দর্শনের প্রতিক্রিযার বর্ণনা আছে। রামকৃষ্ণের দার‍ুণ টান, তাঁর পাদম‍ূলে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা অথচ তার বির‍ুদ্ধে দম্ভী মান‍ুষের অভিমানের বাধার বিবরণ এখানে পাই। গিরিশ স্তরে-স্তরে খ‍ুলে ধরেছেন নিজের পরিবর্তনের র‍ূপ। রামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে তিনি অদ্ভুত অন‍ুভূতিলাভ করে-ছিলেন ['কি যেন একটা স্রোত আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে'],

শেষে দুটি উপলব্ধির আশ্বাসে স্থিত হয়েছিলেন এক, আমি নির্মল, দুই, থিয়েটার ইত্যাদি যা করে যাচ্ছি, তাতে দোষ নেই।

"পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" রচনায় গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের অনির্বচনীয় স্নেহের বর্ণনা করেছেন অনবদ্যভাবে। ও স্নেহ মাতা-পিতার স্নেহের চেয়ে অনেক ব্যাপক, গভীর। মায়ামুক্ত সেই স্নেহের বর্ণনায় গিরিশ উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। এই লেখা এবং অন্য লেখাতেও গিরিশকে যে-যে শক্তিতে রামকৃষ্ণ জয় করেছিলেন, তার একটিকে দেখতে পাই—ঐ স্নেহ। গিরিশ রামকৃষ্ণের মধ্যে পিতা ও মাতা উভয়কেই পেয়েছিলেন—অতিরিক্ত বন্ধুও পান। গিরিশ বলেছেন, রামকৃষ্ণ তাকে অসীম আনন্দে 'পারপ্লুতে' করে দিয়েছিলেন বুকে পেয়েছিলেন অসীম সাহস মৃত্যু-ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। ভৈরব ভয়ংকর গিরিশ রামকৃষ্ণের কাছে নিজেকে উলঙ্গ বালকের তুল্য অনাবৃত বলে অনুভব করেছিলেন। গিরিশ সিদ্ধান্ত করেন 'কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি।" রামকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন, "গিরিশ, তোকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে।" বলাবাহুল্য অভিনেতা গিরিশকে দেখে অবাক হবার সম্ভাবনার কথা রামকৃষ্ণ বলেন নি, কারণ সেই বিস্ময় ইতিপূর্বেই গিরিশ অর্জন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ এখানে গিরিশের অপূর্ব রূপান্তরের নিয়তির কথাই জানিয়েছিলেন। এই লেখাতে রামকৃষ্ণের আশ্চর্য শিক্ষাদান কৌশলের কথা গিরিশ বলেছেন। আজন্ম গিরিশ বাধায় অসহিষ্ণু তাঁকে জোর করে কেউ কিছু শেখাতে পারেনি। দেখা যায়, রামকৃষ্ণ কোনোদিন কোনো নিষেধ তাঁকে করেন নি। তিনি শুধু দেখিয়েছিলেন। তিনি শুধু ভালবেসেছিলেন। গিরিশ বাধা পড়েছিলেন 'বন্ধনহীন গ্রন্থিতে।'

এই লেখাতে পূর্বের লেখাটির মতোই সমকালীন বাংলার ধর্মধারণার কাহিনী আছে ইয়ং বেঙ্গল ব্রাহ্ম অনাচারী রক্ষণশীল জড়বাদী ও যুক্তিবাদীদের কথা নানা মতের মধ্যে গিরিশের ওলট পালট খাওয়ার কথা। গিরিশের নাস্তিকতা তাঁর চতুর্দিকে ভয়ানক বিপজ্জাল এবং আকুলতার তীব্র উৎকণ্ঠার বর্ণনাও রয়েছে।

এই লেখা দুটিতে এবং অন্যত্র গিরিশের জড়বাদী প্রত্যয়, নাস্তিকতা, বিধ্বংসী আকার প্রবল বাসনা ইত্যাদি তাঁর 'কালাপাহাড়' নাটককে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক নাটকেই গিরিশের আত্মজীবনের ছায়াপাত রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ে—'বিল্বমঙ্গল' ও 'কালাপাহাড়'। বিল্বমঙ্গলে অন্ধ কাম—একাগ্রতার শক্তিতে নিরঞ্জন প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল—সেই রূপান্তরের নাট্য আমরা গিরিশের জীবনে দেখেছি। আর কালাপাহাড়ে পেয়েছি—জড়কে একান্ত সত্য বলে আঁকড়ে ধরে, তার নিশ্চেতন রূপ দেখে হাহাকার ক'রে, তাকে নাড়িয়ে ব্যাকুল সন্ধান—ভিতরে কি চৈতন্য নেই? হিন্দু কালাপাহাড় ধর্মান্তরের অতিশায়িত বিদ্বেষে মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেছিল—সেই তার মধ্যে জড়বাদ ভাববাদ ইত্যাদি

দার্শনিক ধারণার অবস্থিতি দেখানোয় কালানৌচিত্য ঘটেছে কিনা, সে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা কিন্তু গিরিশের প্রশংসাই করব। প্রথমতঃ নাস্তিক্যদর্শন ভারতবর্ষে অপরিচিত নয়, সমৃদ্ধ দার্শনিক চেতনাসম্পন্ন এই দেশে বস্তুসত্য নিয়ে জিজ্ঞাসা জাগতেই পারে, আর যদি কেউ, মূর্তিধ্বংসের প্রবাদপুরুষ কালা পাহাড়ের মধ্যে সেই চেতনা দেন, তাহলে তিনি কি ওহেন একটি চরিত্রকে সঙ্গত গভীরতা দান করলেন না, যিনি মূর্তিধ্বংস করতেন—কেবল স্থূল আক্রোশে নয় মূর্তিকে অন্তর্গত সত্যহীন অথচ অন্ধ আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত ধ্বংসযোগ্য পদার্থ মনে করতেন বলেই।

গিরিশের আত্মকথামূলক উৎকৃষ্ট রচনা "শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তচূড়ামণি রামচন্দ্র দত্ত।" গিরিশ ও রামচন্দ্র, জীবনের অন্য ক্ষেত্রসমূহে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও একটি ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন—রামকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাসে। এ দের অখণ্ড বিশ্বাস—রামকৃষ্ণ অবতার। এই বিশ্বাস—নীতিহীন গিরিশ আর নীতিবাদী রাম দত্তকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিল। উভয়ের অবতার অবশ্য চরিত্রে এক নন। বৈষ্ণবভক্ত রাম দত্তর কাছে রামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের অবতার—ভক্তির অবতার আর জ্ঞানবাদী শাক্ত গিরিশের কাছে রামকৃষ্ণ জ্ঞান ভক্তি-কর্ম-যোগ—সকল ভাব ও পথের প্রভু। এখানে গিরিশ বিবেকানন্দের ধারণার অংশীদার।

রাম দত্তর চরিত্রায়ণের কালে গিরিশ দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন—ওঁর ভক্তি যেমন সংসারকে গাঁথত, তেমনি বেড়াও ভাঙত। ভক্তির গভীর স্তর থেকে কোন আশ্চর্য সত্যবোধ জাগে তার দৃষ্টান্তও পেয়েছি। রামকৃষ্ণ জীবনীসাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল একটি সূক্তিরত্ন রাম দত্ত দান করেছেন যখন তিনি গিরিশের কদর্য গালাগালিতে ক্ষুব্ধ বিচলিত রামকৃষ্ণ নামক ভগবানকে এই ভক্তের তিরস্কারে সচেতন করে তুলেছিলেন "কালীয় নাগকে প্রভু যদি কেবল বিষ দিয়ে থাকেন তাহলে সেই সর্প প্রভুকে বিষ ছাড়া আর কোন প্রতিদান দিতে পারে?"

গিরিশ রামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, আমার ছেলে হয়ে তোমাকে জন্মাতে হবে যাতে মনের সাধে তোমার সেবা করতে পারি। রামকৃষ্ণ গররাজি হওয়ায় গিরিশ 'প্রভুর বাপান্ত' করেন। তাতে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত আহত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলে রাম দত্ত ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। ঘটনাটি রামকৃষ্ণ সাহিত্যে সুপরিচিত, এই সংকলনেও পুনঃপুন উল্লিখিত। এই ভক্ত রাম দত্তই যিনি খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদ ছিলেন, নাস্তিকও ছিলেন, পরিবর্তিত জীবনে ভক্তির বেগে রসায়নের জগৎ থেকে এমন অনুভূতি লাভ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে জ্ঞানরাজ্যের চরম সত্য উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন "আশ্চর্য প্রভুর মাহাত্ম্য। যে জড়বিজ্ঞানে আমাকে নাস্তিক করিয়াছিল—প্রভুর কৃপায় দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়ায় দেখিতেছি, প্রতি পরমাণু প্রকাশ করিতেছে—অনন্ত—অনন্ত—সকলই

অনন্ত—আদিঅন্তহীন।”

রাম দত্ত বিষয়ক লেখাটি যথার্থই সাহিত্যগুণান্বিত। এই চমৎকার জীবন-চিত্রটিতে ভালবাসার অমৃতধারা উচ্ছ্বসিত। এমন ঐকান্তিক, নিবিড়, অনুরাগ-তপ্ত লেখা অল্পই দেখা যায়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সম্পর্ককথা গিরিশ দুটি রচনায় বিশেষভাবে বলেছেন “শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ” এবং “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ।” রচনা দুটিতে কিছু কিছু উপাদানগত ঐক্য আছে, আবার নতুন প্রসঙ্গ ও ব্যাখ্যাও আছে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ ও রূপান্তরের কাহিনী এদের মধ্যে পাই। আরও আছে, নরেন্দ্রনাথের নিরন্তর সমাধিপ্রার্থনা ও রামকৃষ্ণের বিখ্যাত উত্তর। গিরিশ এইসকল পরিচিত কথা বলার কালে অন্ত দৃষ্টিবলে অনেক সময়ে নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন। আমরা জেনেছি, রামকৃষ্ণ অপরকে ধর্মানুভূতি দিতেন জড়বস্তু দানের মতো করেই, নরেন্দ্রের মধ্যে ছিল কামকাঞ্চনে গভীর অনাসক্তি (নরেন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণার অজানিত কাহিনী পেয়েছি) এবং সন্ন্যাসে প্রচণ্ড আসক্তি রামকৃষ্ণের মধ্যে তারই পূর্ণ বিকাশ দেখেছিলেন বলে নরেন্দ্র তাঁকে বরণ করেছিলেন। আরও জেনেছি ‘অন্ধবিশ্বাস’ কথাটার মতো যুক্তিহীন কথা সম্ভব নয়, নরেন্দ্রনাথের মতো প্রখর মনীষাসম্পন্ন মানুষও অন্ধ’ বিশ্বাস ও ‘চক্ষুষ্মান’ বিশ্বাসের পার্থক্য বহু চেষ্টাতে বোঝাতে পারেন নি।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সম্পর্কসূত্রে গিরিশের সিদ্ধান্ত—উভয়ে অভেদ, ‘যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে চান, বিবেকানন্দের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিনিয়ত রাখিতে হইবে।’

গিরিশের পক্ষে এই কথাগুলি বলা বিস্ময়কর, কারণ আপাততঃ মনে হয়, রামকৃষ্ণ বিষয়ক ধারণায় তিনি ছিলেন রাম দত্ত পন্থী। রাম দত্ত আনুষ্ঠানিক সাধনা বা সন্ন্যাসের প্রয়োজনবোধ করেন নি, কর্মমার্গে তাঁর আস্থা ছিল না, নিছক রামকৃষ্ণ-ভক্তিতেই সর্বসিদ্ধি ঘটে যাবে—এই ছিল অখণ্ড বিশ্বাস। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের সঙ্গে রাম দত্তর ধারণার সমূহ পার্থক্য। বিবেকানন্দ সর্বদাই সাধনা-যোগে আত্মনির্মাণের উপর জোর দিয়েছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারটি আমরা দেখি, রামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচারে রাম দত্তর সহযোগী গিরিশ, যাঁকে বিশ্বাসের মহাবীর বলা যায়, সেই তিনি কিন্তু তাঁর প্রভু রামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন নি, এবং যাঁরা পার্থক্য করতে উৎসাহী তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে দৃঢ় ইচ্ছা বোধ করেছেন। রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা এক পত্রে (এই সংকলনে সে পত্র আছে) গিরিশ নিজের সেই অভিপ্রায়ের কথা লিখেছেন। নানা প্রবন্ধেও সে কাজ তিনি করেছেন। “শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ” প্রবন্ধে খুব জোরালোভাবে যুক্তিসহ বলেছেন “কেহ-কেহ পরমহংসদেবের ভাবের সহিত

বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম।" "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" প্রবন্ধে বিবেকানন্দের কর্মদর্শন যে রামকৃষ্ণ ভাবানুযায়ী, তা বিচারমুখে দেখিয়েছেন। বিবেকানন্দ ভক্তিধর্ম প্রচার করেননি, এই স্থূল সমালোচনারও উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন।

এই দুটি রচনা ও আরও কয়েকটি রচনায় গিরিশচন্দ্র নানা তীক্ষ্ন, গভীর যুক্তি ও উক্তিতে বিবেকানন্দের মত পথের পক্ষসমর্থন করেছেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিন্দুক যথেষ্টই ছিল। রামকৃষ্ণের মতো ধর্মোদ্ধারক পুরুষদের বিরুদ্ধে যাজকদের চিরকালীন শত্রুতা তাঁর একটি রচনার বিষয়বস্তু ["চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রমুখ ধর্মস্থাপনকদের বিরুদ্ধে যাজকদের শত্রুতা"]। কিন্তু নিন্দা রামকৃষ্ণ অপেক্ষা বিবেকানন্দকেই বেশী সহ্য করতে হয়েছিল। বিবেকানন্দ যদিচ এই দেশকে গহ্বর থেকে টেনে তুলে আলোকের সম্মুখীন করে দিয়েছিলেন তবু নিন্দা তাঁকে সহ্য করতে হবেই, কারণ "নিন্দুক এক আশ্চর্য সৃষ্টি বোধহয় সকল মহাকার্যেই তাহাদের প্রয়োজন।"

রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী—উভয় মহলে সমালোচিত হয়েছে বিবেকানন্দের দুই দান—সেবাব্রত এবং সন্ন্যাসী সংঘ। গিরিশচন্দ্র দুইয়েরই মোকাবিলা করেছেন। তাঁর সেই প্রয়াসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। বিবেকানন্দের পক্ষসমর্থনে গিরিশের ব্যাপক চেষ্টা দেখে বোঝা যায়—রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কোন বাধা বন্ধুর পথ দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। "বিবেকানন্দের সাধন ফল" প্রবন্ধে বিবেকানন্দের সেবাধর্মের উৎকৃষ্ট চরিত্রব্যাখ্যা আছে। এই সেবার সামাজিক ফল —জাতীয় ঐক্যবোধসৃষ্টি—গিরিশ বলেছেন। সেবাধর্মের মূলগত অদ্বয় চেতনার রূপ গিরিশ দেখিয়েছেন বিবেকানন্দের জীবন থেকে নানা দৃষ্টান্ত আহরণ করে। একই সঙ্গে দেখিয়েছেন, এই সেবা প্রচলিত ফিলানথ্রপি নয়। কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম এবং সেবাশ্রম পাশাপাশি অবস্থিত। এই ব্যাপারটি গিরিশের কাছে প্রতীক রূপ ধারণ করেছিল। অদ্বৈত আশ্রমে যার তত্ত্বসাধনা, সেবাশ্রমে তারই কর্মপরিণতি। গিরিশ বিবেকানন্দের সর্বভূতে নারায়ণদৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে উৎস রামকৃষ্ণকে ভোলেন নি। গদাধরের ধনী কামারণীকে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণের কাহিনী সুপরিচিত—কিন্তু সেই মাতা যে গদাধরের কোলে মাথা রেখেই মারা গিয়েছিলেন—এই অপরিচিত সংবাদ গিরিশের কাছ থেকে পেয়েছি।

"বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ" রচনাতেও স্বামীজীর সেবাতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। সেবার দ্বারাই এই নানা ধর্মের দেশে ভাবৈক্য স্থাপন সম্ভব। সেবার মূলে আছে প্রেম, আর বিবেকানন্দের প্রধান "সম্পত্তি—প্রেম", তারই অধিকার তিনি দিয়ে গেছেন বঙ্গীয় যুবকগণকে—গিরিশ আবেগের সঙ্গে লিখেছেন। "রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী" প্রবন্ধটি মিশনের সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অনুচিত সমালোচনার প্রচণ্ড প্রতিরোধ। যারা "জামা জুতো পরা" সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করে, তারা

জামা জুতাই দেখেছে—দেখেনি মৃত্যুশ্মশানে সন্ন্যাসীদের সেবাকে। "ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই সন্ন্যাসী দল শিক্ষাদান, অন্নদান, রুগ্ণসেবা প্রভৃতি কঠোর সন্ন্যাসব্রত সাধনে রত আছেন"—এহেন সন্ন্যাসীদের পর্বতগুহায় প্রেরণ করলে সমাজের মঙ্গল নেই, গিরিশ জানাতে ভোলেন নি। "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কর্মাদর্শ" প্রবন্ধেও সেবাধর্মের কথা আছে। এর মধ্যে 'কর্ম' বিষয়ে সুগভীর কিছু উক্তি পাই। কর্মের বিরোধী বক্তব্যকে গিরিশ সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থিত করেও দেখিয়ে দিয়েছেন—কর্ম ছাড়া উপায় নেই মানুষের। কর্মের সর্বোচ্চ রূপ কি, তা জেনে কর্মকে গ্রহণ করতে হবে। রামকৃষ্ণপন্থীরা সর্বোচ্চ কর্মকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন, এই রচনায় গিরিশ তার উজ্জ্বল বিবরণ দিয়েছেন। এখানে এবং অন্যত্র তিনি 'জগদ্ব্যাপী' কথাটি ব্যবহার করেছেন। রামকৃষ্ণপন্থীদের বিস্তার চেতনার সূচক ঐ শব্দটি। মনে পড়ে কাশী সেবাশ্রম সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উক্তি—"বিরাটের উপাসনা মন্দির।"

সংকলনের প্রথম ভাগে আরও কয়েকটি খণ্ডিত রচনা আছে। সেগুলি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে নানা উদ্ভাসিত মুহূর্তে দেখিয়েছে। যেমন "শ্রী গৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য" রচনায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব নৃত্যের বর্ণনা [রামকৃষ্ণের নৃত্যের কথা "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" রচনাতেও আছে] "বিনোদিনীকে ঠাকুরের আশীর্বাদ" রচনায় চৈতন্যলীলা দেখতে রঙ্গালয়ে ঠাকুরের আগমন ও তার তাৎপর্য তৎসহ বিনোদিনীর মহাভাগ্যের কথা ['আজীবন তপস্যা করে যা যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন সেই চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে"] 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সান্নিধ্যে [illegible] ত্রী ও বাঈজি' রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে [illegible]কে মর্যাদা দিয়েছেন তার দৃষ্টান্তযুক্ত আলোচনা, এবং বিবেকানন্দ কিভাবে [illegible] বাঈজির [illegible] করুণায় অভিষিক্ত করেছিলেন তার বিবরণ "নিশ্চেষ্ট সংসারী রামকৃষ্ণ শিষ্য নাগ মহাশয়" রচনায় গৃহীর সাধনা কোন অর্থে সন্ন্যাসীর সাধনা অপেক্ষা অধিক কঠিন তার বিশ্লেষণ এবং নিজ বক্তব্যের পক্ষে সংসারী সাধক নাগ মহাশয়ের জীবনের দৃষ্টান্তদান।

বেশ কয়েকটি লেখায় গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর গভীর রহস্যব্যাখ্যা করেছেন। এইসকল লেখার মধ্যে সমকালীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধারণার সঙ্গে গিরিশের বিশেষ পরিচয়ের নিদর্শন আছে। "রামকৃষ্ণের মহাবাক্য জীবনের ধ্রুবতারা" রচনায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গে নানা সাম্প্রদায়িক বিতর্কের উল্লেখ ক'রে রামকৃষ্ণ কোন পথ দেখিয়েছেন—সেই ধ্রুবতারকার আলোকসম্পাত। "সাধনগুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ"-এর মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষানুভূতির নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে—এগুলিকে বৈজ্ঞানিকরা অস্বীকার করবেন

কিভাবে ? রামকৃষ্ণের অপূর্ব সমাধির সূত্রে গিরিশ বলতে চেয়েছেন—এমন বহু স্থান আছে যেখানে বিজ্ঞান নীরব থাকতে বাধ্য হয়। "প্রলাপ না সত্য" রচনায় ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহমনের অসাধারণ অভাবিত প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ মেলে। "গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গুরুর প্রয়োজন" রচনায় গুরু কিভাবে ঈশ্বর পথে অগ্রসর করিয়ে দেন তারই আবেগময় বিবরণ।

এই পর্যায়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা "পরমহংসদেবের তাও বটে! তাও বটে!" শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ আপাত-সামান্য কথাটি কি অদ্ভুত উপায়ে ধর্মজগতের চরম কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করেছে তার ইঙ্গিত গিরিশ পেয়েছেন। [প্রশ্নগুলির মধ্যে আছে—সাকার না নিরাকার ? নির্বাণের স্বরূপ কি ? জ্ঞান ও ভক্তি—ভিন্ন না অভিন্ন ? ঈশ্বর বহুস্বরূপ কিভাবে ? সংসারের যথার্থ প্রকৃতি কি ? পরম ও চরমে বর্তমান 'কোন বিপুল রাজ্য, অনন্ত রাজ্য, নির্বাধ রাজ্য ?']

সংকলনের দ্বিতীয় ভাগে গৃহীত রচনার সবগুলিই ভাবে ও রসে সমুজ্জ্বল। এদের মধ্যে প্রবেশের অর্থ মানবের অধ্যাত্মজীবনের অনির্বচনীয় রহস্যালোকে প্রবেশ। এই পর্যায়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীমা সারদাদেবী-প্রসঙ্গও আছে। স্বয়ং সারদাদেবী গিরিশ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার কিছু আছে 'মায়ের কথায় গিরিশ'-এর মধ্যে। "মাতৃভক্ত গিরিশ" রচনায় চিরজননীর এই শ্রুতি আশ্বাসবাক্য পাই—আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য, সত্য জননী।" এরই মধ্যে গিরিশভবনে দুর্গাপূজার সময় শ্রীমায়ের দিব্য উপস্থিতির উৎকৃষ্ট বর্ণনা মেলে। "গিরিশচন্দ্রের জীবনে শ্রীকৃষ্ণ সারদা" রচনায় কলেরা রোগাক্রান্ত গিরিশের সারদা মাতাকে (সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্বেই) অলৌকিক দর্শনের কথা আছে, সেইসঙ্গে জয়রামবাটীতে পত্নীশোকাতুর গিরিশের গমন ও শ্রীমার স্নেহে তার শান্তিলাভের চমৎকার বিবরণ।

কুমুদবন্ধু সেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপের বিবরণ দিয়েছেন ['গিরিশ-সংলাপ প্রসঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ"] তার মধ্যে উচ্চাঙ্গের চিন্তাপূর্ণ অনেক বক্তব্য রয়েছে। গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর চিন্তার অনুসরণে বলেছেন, এদেশের প্রাণপাখি ধর্ম। তদনুযায়ী তিনি বিদেশী-রচিত ইতিহাসকে অন্ধভাবে অনুকরণের ভ্রান্তির দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এদেশের পুরাণ ও ইতিহাস থেকে সাম্যনীতির দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে বলেছেন, ঐ সকল আদর্শের জন্য বৈদেশিক ভাবাদর্শের উপর অন্ধ নির্ভরতার প্রয়োজন নেই। একদিকে তিনি থিয়েটারে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী নামানোর বিরোধীদের অতি বিশিষ্ট আত্মসংকোচের রূপ উদ্ঘাটন করেছেন, অন্যদিকে যথার্থ নিরপেক্ষতা রক্ষা করে নরেন্দ্রনাথের আর্ত অনুরোধবাক্য উদ্ধৃত করেছেন—'জি-সি, মারাত্মক দর্শন

ছাড়িও না। I love purity।" কিন্তু নিজের পক্ষে গিরিশ এই আত্মবিশ্বাস রক্ষা করেছিলেন—থিয়েটার করে তিনি অন্যায় কিছু করেন নি, বরং লোক-কল্যাণের কাজই করেছেন, কারণ নাটকে ঠাকুরের ভাবই ছড়াচ্ছিলেন, এবং ঠাকুর তাঁকে নাটক ছাড়তে নিষেধ করেছিলেন। ব্যাকুল ভক্তিতে তিনি বর্ণনা করেছেন, ঠাকুর কিভাবে তাঁকে ধুলোকাদা-সহ কোলে তুলে নিয়েছিলেন। প্রখর যুক্তির সঙ্গে মূর্তিপূজা-সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অযৌক্তিক পরোক্ষ মন্তব্যের খণ্ডন করেছেন, এবং বলেছেন, এই অনন্তের আলোকদিশারীকে যদি কেউ অগ্রাহ্য করেন, তিনি যত বড় কবিই হোন, যুগের যথার্থ বাণীকে প্রকাশ করতে পারবেন না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ যুগবাণীকে যথার্থই প্রকাশ করে ছিলেন—এবং জানি—রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর খণ্ড সংকীর্ণ ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন—"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা" মিলিত হয়ে রামকৃষ্ণের জীবনে রচিত হয়েছে 'নূতন তীর্থ'।" সেই তীর্থে দেশবিদেশের অগণ্য মানুষের সঙ্গে নিজ প্রণাম রবীন্দ্রনাথ নিবেদন করেছিলেন। গিরিশ সগৌরবে বলেছেন, সেই বিরাট পুরুষ ও তার ভাবকে নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কিছুটা প্রতিফলিত করার চেষ্টা তিনি করেছেন—সেই চরিত্রগুলিকে যাঁরা অতিশয়িত মনে করেন তাঁরা বিরাট পুরুষের সম্মুখীন হবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত বলেই অমন করে থাকেন।

স্বামী শঙ্করানন্দ-সংকলিত "গিরিশবাবুর আত্মকথায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" এর মধ্যে পাই, চৈতন্যলীলা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন গিরিশের উপরে জ্ঞানসূর্যের আলোকসম্পাত হতে আরম্ভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিচিত্র ও বিপরীত ভাব এমনভাবে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশমান ছিল যে, তিনি কী, তা নির্ধারণ করা দুরূহ। তাই যার যেমন সামর্থ্য সে সেই বস্তু তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করত—বিজ্ঞান দর্শন নাট্যভাব শিক্ষকতা—ধর্ম তো আছেই। গিরিশ এই রচনায় বলেছেন, অভিনয়ও তিনি শিখেছেন ঠাকুরের কাছে।

মহেন্দ্রনাথ দত্তর "গিরিশ-স্মৃতিকথায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" অতি স্বাদু রচনা। এঁর স্মৃতিকথাগুলির প্রধান গুণ—ইনি দৃশ্যপটসুদ্ধ ঘটনা ও চরিত্রকে তুলে আনতে পারতেন এবং তাঁদের সঙ্গে অবিলম্ব অন্তরঙ্গতা ঘটে যেত পাঠকের। তাঁর এই অতীব হৃদ্য রচনায় মাতাল গিরিশের কাছে বাতি চেয়ে আনবার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব তরুণ যোগানন্দকে রামকৃষ্ণের পাঠানো, তাতে যোগানন্দের হাস্যকরুণ অভিজ্ঞতা, গিরিশের জেদে তাঁর বাড়িতে অশুচি পরিবেশে রামকৃষ্ণের আহার ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা আছে। ঠাকুরের মানব-চরিত্রজ্ঞান ও অভিব্যক্তি-ক্ষমতা, ঠাকুরের উপর গিরিশের বেপরোয়া বিশ্বাস ইত্যাদি পেয়েছি। ঠাকুরের সঙ্গে প্রণাম-যুদ্ধে পরাস্ত গিরিশের সুগভীর উক্তি—এবার "প্রণাম-অস্ত্রে জগৎ জয়"—

রামকৃষ্ণ-লীলার এক বিশেষ ছন্দের শব্দধ্বনি। বিবেকানন্দের প্রসঙ্গও এখানে যথেষ্ট ধ্যানকালে নরেন্দ্রের গায়ে 'মশার কম্বল', বিল্বমঙ্গল অভিনয়ের পরে মঞ্চে আগত নরেন্দ্রের আত্মহারা সঙ্গীত ও তাতে ত্রস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ, নরেন্দ্র কর্তৃক আত্মম্ভরী এক মুনসেফকে নাকাল করার কাহিনী, কিংবা গিরিশের "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" ইত্যাদি গান গেয়ে নরেন্দ্রের আর্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস, ইত্যাদি। নরেন্দ্রের সঙ্গে তর্কে বিবাদে গিরিশের যত সুখ এমন কিছুতে নয়, একথা আমরা জেনেছি, আর জেনেছি, নরেন্দ্রকে ভালবাসার মতো সুখও গিরিশ কোথাও পাননি।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-রচিত "স্বামী শিষ্য সংবাদ" থেকে সংকলিত "বিবেকানন্দ গিরিশ সংবাদ"-এর মধ্যে বিবেকানন্দ জীবনী মাত্রে ব্যবহৃত একাধিক সংবাদ রয়েছে, তাদের মধ্যে পড়ে—মঠে রামকৃষ্ণ জন্মতিথির দিন গিরিশকে স্বামীজীর শিব সাজানো [স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন—গিরিশ 'ভৈরবের অবতার'] কিংবা বেদপাঠের সময়ে গিরিশের মুখে মর্মন্তুদ সমাজবিবরণ শুনে স্বামীজীর নিদারুণ যন্ত্রণা। সুধী পাঠকের কাছে আকর্ষক ঠেকবে ভক্তিমার্গ ও বিচারমার্গ নিয়ে বিবেকানন্দ ও গিরিশের আলোচনা। স্বামীজী 'কৃপা'কে একেবারে হিসাবহারা অহেতুক ব্যাপার মানতে রাজী হননি, ওক্ষেত্রেও সাধারণের অজ্ঞাত নিয়ম আছে। এই সূত্রে স্বামীজী যা বলেছিলেন, তা গিরিশের রামকৃষ্ণ পূর্ব জীবনের উপর অভ্রান্ত আলোকপাত ছাড়া কিছু নয়। স্বামীজী বলেন 'জানবি, যাদের ভিতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে-করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল। হৃদয়ে এত অভাববোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল।"

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল-লিখিত "গিরিশচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ সাধনা" লেখাটির কতখানি অংশ শ্রীশ মতিলালের আর কতখানি স্বামী সারদানন্দের, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে অভিজ্ঞ মহল জানেন, স্বামী সারদানন্দ, তাঁর দ্বারা অনুমোদিত লেখা খুব বেশি পরিমাণেই সংশোধন করতেন এবং সে সংশোধনের কথা অবিজ্ঞাপিত থাকত। আর যেখানে লেখা আছে—স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক "সংশোধিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত' (যা এই রচনার উপরে লেখা ছিল)—সেখানে স্বামী সারদানন্দের হস্তক্ষেপের পরিমাণ অনুমান না করাই ভালো।

কোনো সন্দেহ না রেখে বলা যায় অতি উচ্চাঙ্গের এই রচনা। ভাষাভঙ্গি পুরাতন কিন্তু ভাব ও বিষয়ের গুরু-গভীরতা, অনুভূতির ঐকান্তিকতা একে বিরল শক্তি ও সৌন্দর্য দিয়েছে। রামকৃষ্ণ গিরিশ সম্পর্কের আশ্চর্য বহু সংবাদ এর মধ্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেসব প্রসঙ্গ সংখ্যায় এত বেশি, এবং সেখানে রহস্যসত্য এমন দুরবগাহ যে, সামান্য উল্লেখে তাদের মর্যাদানাশ হবে,

তাই সে চেষ্টায় আমি বিরত থাকব। বিশ্বাসের বজ্র রূপকে কি কয়েকটি তুচ্ছ শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব ?

স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" থেকে সংকলিত "শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র" সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। সারদানন্দের রীতি গুরুভার ও অনাধুনিক, কিন্তু রত্নগর্ভা সে রচনা—ললিত মসৃণ রূপের কাঙাল তা নয়। গম্ভীর রসসৃষ্টিতে তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল—এই বিশেষ দিকে কথামৃতের পরমাশ্চর্য সাহিত্যকেও তাঁর রচনা অতিক্রম করেছে। যথা, ৬ নভেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে, গিরিশ কর্তৃক রামকৃষ্ণ শরীরে কালীপূজার বর্ণনা কথামৃতেও পাওয়া যায়, কিন্তু পরিবেশ ও পাত্রের গহন গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে সারদানন্দের কৃতিত্ব কথামৃতের বর্ণনাকে বহুদূরে পিছনে ফেলে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গিরিশের বকলমা দানের ঘটনা, সকল রামকৃষ্ণ-জীবনীতে আছে, কিন্তু সারদানন্দ যেভাবে তার ধর্মীয় ও দার্শনিক তাৎপর্য উপস্থিত করেছেন, তা অন্যরা পারেন নি। একথা ১ জানুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার (সারদানন্দ যাকে "আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান" বলে চিহ্নিত করেছেন) বর্ণনা সম্বন্ধেও সত্য।

বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় গভীরতা গাম্ভীর্য ফোটানোর সুযোগ কথামৃতে বিশেষ ছিলনা, কারণ সেখানে রচনারীতি ভিন্ন, নাট্যচিত্রের আকারে তা লিখিত। কিন্তু নিজস্বক্ষেত্রে অসীম শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে তা সমর্থ ছিল। কথামৃত থেকে আহৃত "শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ সংবাদ" এই সংকলনকে মহা মর্যাদা দিয়েছে। এর ভিতর থেকে কিছুটা বুঝতে পারি গিরিশ কতরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরের কথা শুনেছেন, গভীর তত্ত্ব ঘন ও তরল, কিন্তু সর্বদাই পশ্চাতের রহস্যজালের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে কখনো পাই লোকজীবনের চিত্রমালা, কখনো অধ্যাত্মজগতের সমাচার। দিব্যালোকের এবং লোকপ্রজ্ঞার উপনিষদবাক্যের সাক্ষাৎ যেন এখানে মেলে।

আমাদের বিশ্বাস সাহিত্যরস ও অধ্যাত্মরসের পিপাসু পাঠকদের পরিতৃপ্ত করবে আলোচ্য অংশটি। শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ আছে এর মধ্যে যা নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির আয়োজন না করেই স্বচ্ছন্দ নাট্যতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

গিরিশ শিক্ষার প্রথম ভাগ' থেকে 'বোধোদয়' পর্যন্ত এই অংশে মেলে।

গিরিশচন্দ্রের যেসব নাটক শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন, তাদের মধ্যে 'নিমাই সন্ন্যাস' ছাড়া বাকি তিনটি নাটক দর্শনের বিবরণ এতে আছে। সেগুলি হল—চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদ চরিত্র ও বৃষকেতু।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪—এই তারিখটি নাট্যজগতে ক্রান্তিদিন, কেননা ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যলীলা দেখতে স্টারে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণের আগমনের অর্থ—

রঙ্গালয়ের ললাটে ঈশ্বরের মোহরের ছাপ। তারপর থেকে সেকালের নাট্যালয়ের মানুষেরা অনুভব করেছিলেন—মনুষ্যত্বে আমাদের চির অধিকার। গিরিশ সেই কারাপ্রহরীর মতো, রামকৃষ্ণ যাঁর এক হাতে আলো অন্য হাতে চাবি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—অন্ধ কারাগার খুলে বন্দীদের সূর্যের জগতে পৌঁছে দিতে।

রামকৃষ্ণের চৈতন্যলীলা দর্শনের প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে চৈতন্যলীলা নাটকটির উৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ আছে, তার থেকে বোঝা যায়, এই নাটকটি কী ধরনের উচ্চাঙ্গের ভক্তিদ্যোতক ছিল। অভিনয়ের দৃশ্যগুলির সঙ্গে রামকৃষ্ণের ভাবানুভূতির সুন্দর বুনন দৃশ্যমান। শ্রীম নিজ প্রতিভায় গিরিশের নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি চয়ন করে, সেই পটে রামকৃষ্ণের অনুভূতির রামধনু রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয় দর্শনের বর্ণনার মধ্যে পাই, গিরিশ ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন আর থিয়েটার করা কেন? তখনি তিনি সেই উত্তরটি শুনেছিলেন, যা লাভ করবার জন্য এই 'ঘৃণিত' শিল্পটি অপেক্ষা করছিল 'না গো, ওতে লোকশিক্ষা হয়।"

যেসব দৃশ্য এখানে চিত্রিত তাদের মধ্যে বেশকিছু অংশে গিরিশের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের তর্কবিতর্কের পরিচয় গেল। এগুলিতে গিরিশের প্রখর চিন্তাশক্তি ও তর্কদক্ষতার রূপ দেখা যায়। ডাঃ সরকার সম্ভ্রমের সঙ্গে গিরিশের মনস্বিতার শক্তিকে স্বীকার করেছিলেন। উভয়ের তর্কের বিষয় প্রায়শঃই ছিল অবতারবাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব। দেখা যায় একদিকে রামকৃষ্ণের অবতারত্বে গিরিশের প্রবল বিশ্বাস, অন্যদিকে ডাঃ সরকারের রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মানবশরীরে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব নয় এই দৃঢ় প্রত্যয়। এইসব ক্ষেত্রে এক মহৎ নাটক আমরা পেয়ে যাই, যেখানে কেবল ভক্তি নয় বিচার আছে শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশিয়ে আছে সংশয়, বিশ্বাসের আনুগত্যের প্রতিরোধে উদ্যত বুদ্ধির প্রতিবাদ। অথচ সকল কিছুর উপরে এক আশ্চর্য পুরুষের বিহ্বল হাসির কিরণধারা।

রামকৃষ্ণ এক আঁচড়ে কিভাবে গিরিশের চরিত্র ফুটিয়েছেন, তাও এখানে দেখতে পাই, যখন তিনি ওঁর বিষয়ে বলেছিলেন [গিরিশের] রাবণের ভাব—নাগকন্যা, দেবকন্যাও নেবে রামকেও লাভ করবে।" কী অপূর্ব ছিল তাঁর প্রশ্রয়ের শোধন 'গিরিশ মদ খায়? খাক না কত দিন খাবে?" কী অসামান্য তাঁর স্নেহের সেবা, যখন চূড়ান্ত রোগযন্ত্রণার মধ্যেও পা ঘষে-ঘসে উঠে গিয়ে তিনি গিরিশকে খাইয়েছেন। উল্টোদিকে গিরিশের অন্তহীন বিশ্বাস—"আপনি সব করতে পারেন, আপনার সব বেআইন।" এবং নিজের দুই ছবিকে পাশাপাশি দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ের কাতরতা—' কি ছিলাম, কি হয়েছি।"

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে গিরিশ কী দিলেন ?

রামকৃষ্ণ আন্দোলনে গিরিশের বিরাট দানের হিসাবনিকাশ এখানে করা সম্ভব নয়। এক নজরে এইটুকু ধরা পড়ে—গিরিশের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট শাখায় প্রবেশ করেছেন—নাটকে। গিরিশের নিজের নাটকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কিভাবে বর্তমান, তার কিছু উল্লেখ আগে করেছি। যাঁরা আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ" পড়ে নেবেন। সে গ্রন্থে তাঁরা আরও দেখবেন, গিরিশ কি পরিমাণে আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আকৃষ্ট করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোমোহন গোস্বামী, এমন কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামোল্লেখ পর্যন্ত এক্ষেত্রে করতে হয়। এ ধারা পরবর্তীকালেও প্রবাহিত।

প্রভাব কেবল নাটকে নয়, নাট্যকারদের ব্যক্তিগত জীবনেও পড়েছিল। পড়েছিল অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনে। গিরিশের কারণেই রামকৃষ্ণ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। মঞ্চে প্রবেশের আগে তাঁর পটে সকলে প্রণাম করতেন এখনো অনেকে করেন। "কেন প্রণাম"—এই নামে এক অধ্যায়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় প্রণামের সম্ভাব্য কারণগুলি পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে বহু জিজ্ঞাসাবাদ উনি করেছেন। অনেকেই প্রণাম করেন স্বাভাবিক ভক্তিতে, বিনা প্রশ্নে। সচেতনভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন যাঁরা কেউ কেউ বলেছেন উনি ছিলেন গিরিশের গুরু, আর গিরিশ মঞ্চের গুরু—গুরুর গুরু হিসাবে উনি প্রণম্য। তাছাড়া এই ঈশ্বরপুরুষ মঞ্চে এসে আশীর্বাদ করে, এবং মঞ্চ লোকশিক্ষার আধার এই স্বীকৃতি দিয়ে, যে গৌরব মঞ্চকে দিয়েছেন, সেই দুর্লভ প্রাপ্তির প্রতি নমস্কার তো আমাদের করতেই হয়—তাঁরা বলেছেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণের শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রতি শিল্পীদের আকর্ষণের কথাও এই প্রসঙ্গে তুলেছেন। ক্রিস্টোফার ইশারউডও বলেছেন, আমরা আগে দেখেছি, একদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ সকল শিল্পীরই গুরু।

শেষোক্ত ব্যাপার সত্য হলেও, মোট কথা হল, গিরিশই রামকৃষ্ণকে মাথায় করে এনে মঞ্চের বেদীতে বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বীকার্য জাতীয় জীবনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি মহলটিতে রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে গিরিশই প্রসারিত করেছেন।

কিন্তু তবু বলব এ সকলই ইতিহাসের অংশ, সুতরাং সাময়িকতায় সীমাবদ্ধ। রামকৃষ্ণ আন্দোলনে, যথার্থতঃ মানব ইতিহাসে গিরিশের প্রধান দান—রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিচিত্র সম্পর্ককথা। গিরিশের নাটকে রামকৃষ্ণের প্রভাব ছিল, গিরিশ-প্রভাবিত মঞ্চজীবনে তিনি উজ্জ্বল আকারে বর্তমান ছিলেন, অবশ্যই,

কিন্তু সে উজ্জ্বলতা চিরস্থায়ী নয়। গিরিশের নাটক চিরজীবী নয়, তাঁর কালের রঙ্গমঞ্চও নয়। কিন্তু অমর সত্য—গিরিশ রামকৃষ্ণকে কিভাবে পেয়েছিলেন, গিরিশকে রামকৃষ্ণ কিভাবে নিয়েছিলেন—এই বার্তা। এ-বস্তু যুগে-যুগে মানবকে আনন্দিত ও আশ্বস্ত করবে, যুগে-যুগে সাহিত্যের ও শিল্পের উপাদান হবে, যেমন হয়েছে বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট প্রমুখের সঙ্গে তাঁর নিকটবর্তী প্রবলস্বভাব মনুষ্যগণের সম্পর্ককথা।

যে কোনো রামকৃষ্ণ জীবনীতে রামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক আত্মপ্রকাশের দৃষ্টান্তরূপে যে-সব ঘটনার উল্লেখ করা হয়, বিস্ময়কর হল, তার প্রধান তিনটি ঘটনা গিরিশ-সূত্রে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেগুলির অল্পবিস্তর উল্লেখ আগেই করেছি। প্রথম ঘটনাটি—রঙ্গমঞ্চে রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ 'চৈতন্য হোক।' এই আশীর্বাদকে বলা যায় মানুষকে তার স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রদত্ত বীজমন্ত্রধ্বনি। করুণ বিহ্বল আকারের একটি মানুষ সেদিন এসেছিলেন স্বচ্ছ দেহের আধারে চৈতন্যের আলো জ্বেলে আর সেই আলোকই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মঞ্চের উপরে, যেখানে মানবসংসারের প্রতিরূপের উপস্থাপনা ঘটে সীমাবদ্ধ লণ্ঠনীতে।

দ্বিতীয় ঘটনা রামকৃষ্ণ শরীরে কালীপূজা। গিরিশ যখন মহাকালী ও মহাকালীর সন্তানকে অভেদবোধে অর্চনা করেছিলেন, তখন বোধহয় মহাকালমন্দিরে ভেরীধ্বনি হয়েছিল। সেই মুহূর্তে পূজারী কালভৈরবরূপী গিরিশের সে কি উন্মাদনার রূপ!

তৃতীয় ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু রূপধারণ। সে তরু তার শ্রেষ্ঠ ফলদান করেছিল গিরিশেরই অর্চনায় শিহরিত হয়ে। লক্ষণীয় এই, রামকৃষ্ণ ঐ মুহূর্তে ঐহিক বস্তু দান করেন নি—বলেছিলেন, 'চৈতন্য হোক।'

এমন ঘটল কেন? রামকৃষ্ণের পরম করুণার তিন আত্মপ্রকাশ গিরিশ সূত্রেই বা ঘটল কেন? গিরিশের রচনায় দেখেছি—রামকৃষ্ণ তাঁকে এমন টান দিয়েছিলেন যে তিনি নিজের শিকড় উপড়ে রামকৃষ্ণের দিকে ছুটেছিলেন। রামকৃষ্ণের টান। কিন্তু গিরিশের টান ছিল না? রামকৃষ্ণের ভিতর থেকে অবতারকে তিনি টেনে বার করে আনেননি? সে টান না থাকলে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ঘটল কি করে? আমরা তো লৌকিক দৃষ্টিতে দেখি, রামকৃষ্ণের প্রায় অশরীরী ভাবের জগতে রক্ত মাংসের জ্বালা ক্ষুধা ভালবাসার যন্ত্রণা গিরিশই এনেছেন। গিরিশ ঠাকুরকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়েছেন—লোকত্রাণের দায় নিলে তার মূল্য দিতে হবে। নীলকণ্ঠ নাম নিলে কণ্ঠভরা বিষ সত্যই নিতে হয়। বস্তুতঃ গিরিশ প্রতীক—এই জ্বালাময় সংসারের। গিরিশ পরিত্রাতার পরীক্ষাভূমি। গিরিশ হলেন সেই ঐহিক অস্তিত্বের শবগুলি—যাদের শয্যার উপরে পরিত্রাণকর্তার পৃথিবী-শয়ন। গিরিশ আর কেউ নন, আমাদেরই সুবৃহৎ আকার।

রামকৃষ্ণ চরিত্রের এক ধরনের মোহম্মদগরবী উপস্থাপনায় অনেকেই বিরক্ত। মনে হয়, এঁরা গিরিশ সূত্রে রামকৃষ্ণকে দেখে স্বস্তিবোধ করবেন। ডিসেম্বর থেকে শ্রীমতী দীপান্বিতা দাশগুপ্ত গভীর ভাবানুভূতিতে পূর্ণ এক পত্রে পূর্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে নানা মানুষের অন্তরে যে আলোক জ্বালিয়েছিলেন—যা মুহূর্তে বহু যুগের অন্ধকার দূর করেছিল—সেসব কাহিনী জেনে, কিন্তু তাদের যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে না দেখে, শ্রীমতী দাশগুপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন " সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরপুত্রকে আমরা ক্রমেই হারাচ্ছি—পরিচয়ের জড়তায়, অভ্যাসের ঔদাস্যে। সবিস্ময়ে চোখ মেলে আমরা ঈশ্বরতনয়কে আবিষ্কার করছি না—যে বিস্ময়বোধ আত্মার পরম সম্পদ, দর্শনের জন্মদাতা। আমাদের হৃদয় সম্প্রতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠছে। গভীর বিস্ময়, গভীর কৃতজ্ঞতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—এগুলির আর অল্পদিন পরেই বিস্তৃত ডাক্তারি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। ক্ষমা করবেন রামকৃষ্ণ সম্ভবত [স্বামী বিবেকানন্দের তুলনায়] আরও বেশি হারিয়ে যাচ্ছেন।

কথামৃতের প্রসঙ্গ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ বিদ্যা স্ত্রী অবিদ্যা-স্ত্রী আর ঘন ঘন পত্নী পরিত্যাগের পারিষদকৃত ইঙ্গিত—এসব ঈশ্বরপুত্রের উপযুক্ত কথা নয়। সাক্ষাৎ জ্যোতিস্বরূপ, অসামান্য স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞানরহিত তাঁরা—তাঁরা আমাদের মতো সংসার দেখে আঁতকে ওঠেন না। পিতার গৃহে পুত্রের যেমন অবারিত অধিকার—এ পৃথিবীতে তাঁদের জীবনও তাই। আমাদের সত্তা [যেখানে] আতঙ্কিত ভিক্ষুকের মতো, [সেখানে] তাঁরা আসেন সম্রাটের মতো। এই বিশ্ব যাঁর জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া সর্বব্যাপ্ত এঁরা তাঁর সত্তা। এঁদের দেখে যে আনন্দ বিস্ময় অনুভব করি লক্ষ লক্ষ শাস্ত্রেও তা হয় না। এঁদের একটি বাক্য একটি দৃষ্টি, একটি স্পর্শ সমস্ত জীবন পরিবর্তিত করে দেয়।"

গিরিশের মহাবিস্ময়ের রূপ দেখে চমৎকৃত পত্রলেখিকা, সাহিত্যে সেই বিস্ময়ের জাগরণ দেখার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছেন, আমাদের মনে হয় তিনি এবং তাঁর মতো গভীর জিজ্ঞাসুরা এই সংকলনে গৃহীত রামকৃষ্ণ গিরিশ সংবাদ থেকে কিছুটা আনন্দময় আশ্বাস পাবেন। দেখবেন যে, রামকৃষ্ণের 'ওরে কে কোথায় আছিস আয়"—একেবারে রক্তের সত্য।

গিরিশের সংগ্রামী বিশ্বাস

ধর্মের ইতিহাসে রামকৃষ্ণের অনন্য যোজনা—বকলমা গ্রহণ [যার কথা এই সংকলনে অনেক জায়গাতে রয়েছে]—সেও গিরিশের সূত্রেই ঘটেছিল। আত্মসমর্পণ যোগের সর্বাত্মক রূপ এখানে দেখতে পাই। বকলমা দেওয়ার অর্থ—কাউকে লিখিতভাবে নিজের পক্ষে কর্মাধিকার দান। সে অধিকার দিলে নিজের

আব কিছু কবাব থাকে না। গিবিশ ভেবেছিলেন, এমন মধুব অব্যাহতি আর কিছুতে নয়, এ হল আধ্যাত্মিক আলস্যেব পবাকাষ্ঠা। কিন্তু গিবিশ জানেন নি, স্বেচ্ছায কোন ফাঁস তিনি গলায নিয়েছেন। নিজেব অধিকাব অন্যেব হাতে তুলে দেওযাব তুল্য অহংবিলয আব কি হতে পাবে! যাকে গিবিশ ভেবেছিলেন আমিত্বেব সুখাশ্রয, সেই হযে দাঁড়াল আমিত্বেব সংহাব। আর গিবিশ সেই মানুষ, যিনি প্রতিজ্ঞা কবলে তাকে বক্ষা কবেন। বকলমা-যোগে দাযিত্বমুক্তিব অভিলাষী গিবিশেব অকল্পনীয বন্ধনেব বূপ আমবা ত্রাসে বিস্মযে লক্ষ্য করি।

গিবিশেব দ্বিতীয বিবাহের কথা আগেই বলেছি। গিবিশ বলতেন "এই পত্নী হইতেই আমাব সব সৌভাগ্যেব ["গুবুলাভ যশ লাভ, অর্থাগম"] সূচনা।" এই সৌভাগ্যেব মধ্যেও মৃত্যুব পদধ্বনি থামেনি। ঐ পত্নীব গর্ভে দুটি সুন্দব মেযে হয তাবা মাত্র তিন বছব বযসে মাবা যায। তাবপব একটি পুত্র প্রসব কবে ইনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন, চিকিৎসায কোনো ফল হযনি। জীবনেব আশা যখন নেই তখন এঁকে গঙ্গাতীবে একটি বাড়িতে বাখা হয, যদি গঙ্গাব সুবাতাসে প্রাণবক্ষা হয। তিন চাবদিন সেখানে তিনি থাকেন, এবং অসহ্য কষ্টে থাকেন। গিবিশেব ভাই অতুলকৃষ্ণ তখন বলেন, "মেজদা মন থেকে বৌকে বিদায দিচ্ছে না বলে ওঁব এই ভোগ।" গিবিশেব স্নেহভাজন দেবেন্দ্রনাথ বসু সেকথা শুনে গিবিশেব কাছে এসে বললেন "অবস্থা শোচনীয, মৃত্যুমুখে, কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না ওঁকে আব আটকে বাখা উচিত নয ওঁব যন্ত্রণা দেখে সহ্য কবা যাযনা।" গিবিশ বললেন "তাহলে ছেড়ে দিই।" দেবেন্দ্রনাথ গিবিশেব পদধূলি এনে যেই মুমূর্ষুব মাথায দিলেন অমনি তাঁব দেহান্ত হযে গেল।

পত্নীব প্রতি গিবিশেব ঐ তীব্র ভালবাসা। যে পুত্রকে জন্ম দিযে পত্নীব পীড়া, সেই পুত্র এক আশ্চর্য ব্যাপাব। গিবিশ মনে কবতেন, স্বযং ঠাকুর তাঁব পুত্র হযে জন্মেছেন। সাবদাদেবী নিজে এই পুত্রটিব অদ্ভুত আচরণেব কথা বলেছেন [পৃ ১৭১]। শ্রীশ মতিলালেব লেখাতেও [১৫৯ ৬০] তা আছে। অন্যত্রও মেলে। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায এই পুত্রটিব বিষযে আবও কিছু সংবাদ দিযেছেন

'শিশুটি অন্য কাহাবও কোলে যাইতে চাহিত না, কিন্তু পবমহংসদেবেব শিষ্যগণ আদব কবিযা কোলে লইতে চাহিলে আনন্দে তাঁহাদেব বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িত। অন্য দ্রব্য ফেলিযা ঠাকুর লইযা খেলা করিতে ভালবাসিত, কখনো বা ঠাকুবেব মূর্তি সম্মুখে বাখিযা চক্ষু মুদ্রিত কবিযা বসিযা থাকিত। পবমহংসদেবের ছবি দেখিযা একদিন শিশু অতিশয বোদন করিতে লাগিল, কোনোমতে তাহার কান্না থামানো যায না অবশেষে 'ছবিখানি পাড়িযা দিতে বলিতেছে'—এইবূপ অনুমান কবিযা দেওযাল হইতে নামাইযা দেখা গেল, ছবিখানিব পশ্চাৎভাগ অসংখ্য পিপীলিকায পরিপূর্ণ হইযা বহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বাবা পিপীলিকাগুলিকে

ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছবিখানি পরিষ্কার করিয়া ফেলা হইল, শিশুও শান্ত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী সময়ে সময়ে গিরিশ-চন্দ্রের বাটীতে আসিলে শিশু তাঁহার কোলে বসিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিত।"

শিশুটির বিচিত্র ব্যবহারের কথা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা ছিল। স্বয়ং সারদা দেবীও যখন সেকথা বলেছেন তখন গিরিশ যে মনে করবেন—"ভক্তের স্বপ্ন কল্পতরু পরমহংসদেব সত্যই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন"—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ছেলেটি কিন্তু বাঁচেনি। অস্বাভাবিক ভাবে দিন দিন ক্ষীণশরীর হয়ে মাত্র তিন বৎসর বয়সে মারা গিয়েছিল। গিরিশের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ ছেলেটির কাণে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়েছিলেন।

"প্রিয়তমা পত্নীর" মৃত্যুশোক—তার কিছুদিন পরেই "দেবশিশুর" মৃত্যুশোক—গিরিশের হৃদয়ে তুফান তুলেছিল—কিন্তু মানবজীবনের ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত এক সংবাদ—গিরিশ সে তুফানের তরঙ্গকে শোকের হাহাকারে ভেঙে পড়তে দেননি, শোকের ঢেউকে যেন শিলীভূত করেছিলেন ভয়াল শান্তিতে

'এই পুত্রের মুখ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীশোক সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রের বিরহে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলেও পরমহংসদেবের প্রতি অটল বিশ্বাসবশত নীরবে এই শেল তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে হইয়াছিল। পত্নী ও পুত্র বিয়োগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকলমা দানের নিগূঢ় অর্থ গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন পুত্রের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকারও তাঁহার নাই।"

এইবার বোধহয় গিরিশের 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে সংকেত উপলব্ধির দ্বারা আমাদের [illegible] চিহ্নটা [illegible]। এই বিশ্বাস—সাধনা থেকে অব্যাহত নয় পরন্তু কঠোরতম সাধনা। এই বিশ্বাস—একেবারে সাক্ষাৎ সমাধি। না, সমাধির পরমা অভিব্যক্তি এতে নেই—এই বিশ্বাস নিত্য সতীদাহ। বিশ্বাসের অগ্নিশয্যা উপর আসীন এক বিরাট পুরুষকে আমরা এখানে দেখি, যার চারপাশ ঘিরে জ্বলন্ত উষ্মার সব শিখাগুলি লকলক করে উঠেছিল।

গিরিশের প্রথম জীবনে ছিল—অবিশ্বাসের চীৎকার মধ্যজীবনে এল বিশ্বাসের স্তম্ভিত নিষ্ঠাবোধ। ধর্মজীবনে মানুষ যুক্তিবিচারের পদ্ধতি গ্রহণ করলে আত্মতৃপ্তির স্বস্তি পায়। প্রচলিত সাধনার মধ্যে সহজ পথচলার আনন্দ অন্তত আছে। কিন্তু গিরিশের এই বিচিত্র সাধনার ক্ষেত্রে— প্রশ্নের অবিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এতবড় আধ্যাত্মিক শাস্তি মানুষ আর কখনো পেয়েছে কিনা জানিনা।

গিরিশের 'বিশ্বাস'—এক জীবনে সম্পূর্ণ জন্মান্তরের সিদ্ধি। তবু কান্না—কান্নার আবরণে মুড়ে গিরিশ তাঁর বিশ্বাসটুকুকে বুকে ধরে রেখেছিলেন

গিরিশ স্তম্ভিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন — শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপুষ্টির জন্যই তবে আমার পূর্বজীবনে দুষ্কৃতানুষ্ঠান — আমিও তো শ্রীভগবানের লীলা সহচর। হে ভগবান! তোমার সহিত তবে আমার নিত্য সম্বন্ধ। তবে অনন্তগুণে দুষ্কৃতকারী বলিয়া পরিচিত হইতে হইলেও আর আমার কষ্ট নাই। হে কৃপাসিন্ধু, তোমার চিরদাসকে তুমি যে সাজে যতবার ইচ্ছা সংসারে আনিতে চাহ—আনিও, তোমার চিরপদাশ্রিত—এই জ্ঞানটুকু কেবল আমায় ভুলাইয়া দিও না।"

গিরিশের পরম সিদ্ধি

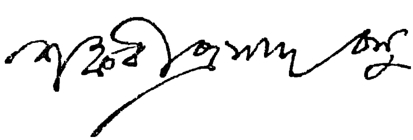
দেহান্তের পরে গিরিশের শবদেহের অপূর্ব আকার দেখে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন:

"হস্ত যেন সেই বিশ্বাসের আধার ভক্তির আধারকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া ছিল। শ্মশানশায়ী গিরিশচন্দ্রের শিবনেত্রে সেই অপূর্ব স্বপ্নাবেশ, আর প্রশান্ত মুখে সেই প্রসন্ন হাস্যের রেখা—তাহা কি ভুলিবার? এবার পান্থশালা কর্মান্তে পান্থধাম ত্যাগ করিবার সময় এমন হাসি হাসিয়া যাইবার সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে?"

মৃত্যুর আগে গিরিশের সজ্ঞান ও সংলগ্ন উক্তি ছিল: "জয় রামকৃষ্ণ! চলো চলো!"

শ্রীশ্রীসারদাদেবী সে কথা শুনে বলেছিলেন:

"যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হল, যেন ঐ চিন্তাতেই ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে। সব তাঁর অঙ্গ, অংশ।"*



* শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ৭৬—৭৭

প্রথম পর্ব

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ
এবং তাঁদের ভাবধারা সম্বন্ধে
গিরিশচন্দ্র ঘোষের
প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বহুদিন পূর্ব ইণ্ডিয়ান মিরার-এ দেখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদ শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহলবশত যাইলাম, কিরূপ পরমহংস? তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথবাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি [উপদেশ] দিতেছেন ও কেশববাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুন পুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'সন্ধ্যা হইয়াছে?" আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, ঢং দেখ। সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে কি না? আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসু স্ট্রিটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম, পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না। তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত, অতি দীনভাবে পুন পুন মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।' কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার

বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখবে ?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, স্টার থিয়েটাবে (৬৮ নং বিডন স্ট্রীট) চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারে বাহিরেব কমপাউণ্ডে বেড়াইতেছি, এমন সময় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায বলিলেন, 'পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিযাছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।' আমি বলিলাম, 'তাঁহার টিকিট লাগিবে না, কিন্তু অপরেব টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি—দেখিলাম, তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া থিয়েটারের কমপাউণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি নমস্কার করিতে না করিতে তিনি অগ্রে নমস্কাব করিলেন, আমি নমস্কাব কবিলাম, পুনর্বাব তিনি নমস্কার কবিলেন, আমি আবাব নমস্কার কবিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কাব কবিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার কবিয়া তাহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি বক্সে বসাইলাম ও একজন পাথাওযালা নিযুক্ত করিয়া দিযা শরীরের অসুস্থতাবশত বাড়ি চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্বে আমাব নিজেব অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদেব পঠদ্দশায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিযা পরিগণিত ছিলেন। বাঙলায় ইংরাজি শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক খ্রিস্টিয়ান হইয়া গিয়া ছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদেব মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাহাদেব মধ্যে মতভেদ, শাক্ত বৈষ্ণবেব দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে, পবস্পব পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীব নরক ব্যবস্থা। ইহাব উপব অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারাযণের পুঁথি লইযা শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটি হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহাব উপর ইংরাজিও দু'পাতা পড়িযাছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিদ্যায সকলের শ্রেষ্ঠ বলিযা গণ্য, ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্ব ধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্কবিতর্কও চলে। আদি সমাজেও কথাও কখনও যাওয়া

আসা করি, একটি ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, 'ভগবান, যদি থাকো, আমায় পথ নির্দেশ করিয়া দাও ' ইহার কিছুদিন পরেই নাস্তিকতা আসিল, ভাবিলাম, জল-বায়ু আলো—ইহজীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহার অর্জন রহিয়াছে তবে ধর্ম, যাহা অনন্তজীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খু জিযা লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা, জড়বাদীরা বিদ্বান—বিজ্ঞ তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম ধর্মের আন্দোলন বৃথা। এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দিন আসিযা ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দিনের তাডনায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখিযা ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ মুক্ত হইবার কোনো উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে আমারও তো কঠিন বিপদ, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিযা দেখা যাক। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে তো মুক্ত হইলাম কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব কোন পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই তো ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করিতে হয়, কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নম॥

—এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? যাক, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু

তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে। এ-সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। সত্য হোক, আর মিথ্যা হোক, এক-দিন তিনি আমায় বলিলেন, "আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো কখনো রুটিতে দাতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না।" আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোনো কারণবশত আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্বদিক হইতে নারায়ণ, আর দুই একটি ভক্ত সমভি ব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবা মাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণদিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষস্থল তাহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন—কে, আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, পরমহংস দেব ডাকিতেছেন। আমি চলিলাম। পরমহংসদেব ৺বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরামবাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই)। বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত দুই-একটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, 'বাবু আমি ভালো আছি—বাবু আমি ভালো আছি'—বলিতে-বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—'না না, ঢং নয়—ঢং নয়।' অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসনগ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?' তিনি বলিলেন, 'গুরু কি জানো, যেন ঘটক।' আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়া ছিলেন। আবার বলিলেন, 'তোমার গুরু হয়ে গেছে।' "মন্ত্র কি?—জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানুজ প্রত্যহই প্রাত-স্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে কবীর নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে-নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হইল—আর সেই নাম

জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।" থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন —"আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।" আমি উত্তর করিলাম, "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।" তিনি বলিলেন, "কিছু নিও।" আমি বলিলাম, "ভালো আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন—'সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।" আমি উত্তর করিলাম, "না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন।" তিনি বলিলেন 'না, একটি টাকা নিও।" আমি "যে আজ্ঞে" বলায় একথা শেষ হইল।

বলরামবাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটি সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, [কিন্তু] কে কি বলিবে। লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরামবাবুর বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন দেখলেন?' আমি বলিলাম "বেশ ভক্ত।' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্যে হতাশা আর নাই। ভাবিতেছি, গুব করিতে হয়, [লোকে] মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন, আমার গুরু হয়ে গিয়েছে তবে আর কার কথা শুনি?

যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম—এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড় হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ জোটানো মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "ভালো, বক্সে লইয়া গিয়া বসান।' দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না।" কিন্তু গেলেম। আমি পৌঁছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে

লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইযাছিল নিশ্চয, আমি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন—"ফুলেব অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?" ড্রেস সার্কেলের দর্শকের, কনসার্ট-এর সময় বসিবার জন্য স্টার থিয়েটারের দ্বিতলে, স্বতন্ত্র একটি কামবা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন আমিও অপব এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেবা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেনবাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুন পুন বলিতে লাগিলাম, 'বসুন না।' কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমাব এতদূব মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরম হংসদেব আমাব সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমাব বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতি মধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন। একটি বালকভক্তের সহিত ভাবাবস্থায যেন ক্রীডা করিতে লাগিলেন। বহুপূর্বে আমি এক দুর্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিযাছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীডা দেখিয়া আমাব সেই নিন্দাব কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবেব ভাবভঙ্গ হইল। তিনি আমায লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —"তোমার মনে বাঁক (আড) আছে।' আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে কিন্তু তিনি কোন বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম— বাঁক যায় কিসে?' পরমহংসদেব বলিলেন— 'বিশ্বাস করো।'

আবাব কিছুদিন গত হইল আমি বেলা তিনটাব সময থিযেটারে আসিযাছি, একটু চিবকুট পাইলাম যে, মধু রাযেব গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। [চিবকুট] পডিবামাত্র আমাদেব পাডাব চৌরাস্তায বসিযা আমাব হৃদযে যেরূপ টান পডিযাছিল, সেইরূপ টান পডিল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবাব ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকট গিযা ভাবিলাম যাইব না। ভাবিলে কি হয, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোডে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুব বাডি গিয়া পৌছিলাম। দোরে রামবাবু বসিযা আছেন। ভক্তচূডামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমি তথায় গিয়াছি। আমি বলিলাম,

"পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।" রামবাবুর বাড়ির নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং কিরূপে তিনি পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সেসব কথা ভালো লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে—'নদে টলমল টলমল করে—গৌর প্রেমের হিল্লোলে।' আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আ[illegible] টলমল করিতেছে। আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধিভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণস্পর্শের বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। স কীর্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মনের বাঁক যাইবে তো?' তিনি বলিলেন, "যাইবে।' আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলাম পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ় স্বরে আমায় বলিলেন—"যাও না, উনি বললেন, আর কেন ওকে ত্যক্ত কচ্ছ?' এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্বে কখনও ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহনবাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম—ইনি সত্যই বলিয়াছেন, যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও শেষে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা' ইত্যাদি—এই স্তবটিও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায় বসিতে আদেশ করিলেন

এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম, মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো।' পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। রামলালদাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন—"কি রে, কী শ্লোকটা, বল্ তো?" রামলালদাদা শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকের ভাব —পর্বতগহ্বরে নির্জনে বসিলেও কিছু হয়না, বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হইতেছে—আমি নির্বল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?" আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল? এ কাহার আশ্রয় পাইলাম—যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন—"আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ—আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারাণ্ডা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?" ঠাকুর বলিলেন—"তা করো না।" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল যে যাহা করি তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্বস্ব আমার, বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—আমার জন্ম সফল।

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণসেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি—একি আপদ। কিন্তু এ-সকল কার্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য বস্তু পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোনো গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোনো চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।*

[* জন্মভূমি আষাঢ় ১৩০৬। প্রিয়নাথ সিংহের অনুরোধে লিখিত প্রবন্ধ]

পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ

প্রবন্ধ লিখিবার ভার যখন আমার উপর অর্পিত হইল, তখন ভাবিলাম, অতি সহজ কার্যই অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু এখন কার্যে দেখি যে, এ-প্রবন্ধ লেখা অতি কঠিন। সহজ ভাবিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমি তাঁহার অপার স্নেহ উপলব্ধি করিয়াছি, প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সেই অপার স্নেহের কথা শুনিয়াছি, অনেক সময়ে মুগ্ধচিত্তে সেই সকল পরস্পর আলোচনা করিয়াছি। যে কোনও শিষ্য তাঁহার প্রতি পরমহংস দেবের স্নেহের ব্যবহার যখন বর্ণনা করিতেন, অমনি প্রতিঘাতে হৃদয়ে শত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইত, শত স্রোত বহিত, শিষ্যের কথায় যত না হোক, মুগ্ধ ভাবভঙ্গীতে এবং তাঁহার সহিত আমার অন্তরের সম অবস্থায় তৎকালীন তাহা যেন সম্যক অনুভূত হইত। [তাহার] একটি কথা, যাহা শিষ্য বলিতেন, [তাঁহার] একটি কার্য যাহা বর্ণনা করিতেন, সেরূপ স্নেহময় কথা [তাহার মুখে] আমিও শুনিয়াছি, আমিও সেরূপ স্নেহময় কার্যের শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, শিষ্যকে অধিক বলিতে হইত না, একটি কথা বলিয়া শিষ্য ভাবিত যেন কত বলিয়াছে, আমিও ভাবিতাম—যেন কত শুনিলাম। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি, আমি তাহা সম্পূর্ণ বলিতে পারিলাম কিনা, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু শ্রোতৃবর্গকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় কতক যেন আমার মনোভাব বুঝাইতে পারিব। আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁহার প্রতি তিনি তাঁহার মাতৃস্নেহ কিরূপ অনুভব করিয়াছেন? তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতৃস্নেহ কিরূপ বর্ণনা করুন। আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি গুটিকত কথা মাত্র বলিতে পারিব—এই মাত্র বলিব—'আহা মাতৃস্নেহ—মাতৃস্নেহ।' মাতার প্রতি কার্যে প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি ব্যবহারে, যাহা আমার অনুভূত হইয়াছে, তাহা কথায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। একটা কথা আছে, পুত্রসন্তান হইলে পিতৃঋণ শোধ যায়। তাহার অর্থ আমি এই বুঝি যে, পিতৃস্নেহ আমাদের পুত্র না হইলে আমরা কোনোরূপে বুঝিতে পারি না। মাতৃস্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃস্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কোনও উপায় নাই। পিতামাতার স্নেহে [কখনও] কখনও স্বার্থ লক্ষিত হয়। পিতাকে গুণবান সন্তানের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রের অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতামাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হইতে তাঁহাদের বৃদ্ধ-কালের বিশেষ

কার্য হইবে। পিতৃমাতৃ স্নেহ অতি উচ্চস্নেহ, কিন্তু [তাহাতে] একেবারে স্বার্থস্পর্শ নাই, এ কথা বলা যায় না। পিতা মাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংসদেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ—কিরূপে অনুভব করিব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করিব। স্বার্থশূন্য অবস্থা ব্যতীত অর্থাৎ মায়ামুক্ত অবস্থা ব্যতীত, অমায়িক কার্য বোঝা যায় না। তাঁহার ন্যায় যদি মায়াশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতাম, এবং আমার শিষ্য থাকিত, [তাহা হইলে] শিষ্যের প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কতক শক্তি হইত, কিন্তু বর্ণনা করিবার শক্তি হইত কিনা জানিনা।

আর এক কথা—পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্মল বালকবয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুর কার্যে নিযুক্ত হন। তাহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায়, তাহার প্রকৃত স্নেহ হয় তো বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়া সিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটি নাম পতিতপাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি [তাঁহার] স্নেহের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চলপ্রকৃতি থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র। সোজা পথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পাইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। প্রবন্ধ শ্রবণে কতক আভাস পাইবেন।

যে সময় পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন তখন আমি হৃদিদ্বন্দ্বে বিকম্পিত। পূর্বের শিক্ষা দীক্ষা—বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশূন্য হইয়া যৌবনসুলভ চপলতা—সমস্তই আমায় ঈশ্বর পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়বাদই প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্খতা ও হৃদয়দৌর্বল্যের পরিচয়। সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, 'ঈশ্বর নাই' —এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এ-পাত ও পাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে, ধর্ম কেবল সংসাররক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম—ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম। গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য, কৌশলে স্বার্থসাধন করাই পাণ্ডিত্য। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলেনা। দুর্দিন—অতি

কঠিন শিক্ষক। সেই কঠিন শিক্ষকের তাডনায় শিখিলাম যে, কুকার্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই—'ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।' শিখিলাম বটে, কিন্তু কার্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইযাছে, নিরাশাব্যঞ্জক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি আরম্ভ হইযাছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এডাইবার কোনো উপায় দেখিতেছি না। বন্ধুবান্ধবহীন—চতুর্দিকে বিপজ্জাল—দৃঢপণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এব৲ আমাবই কার্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিযাছে। উপাযান্তব না দেখিয়া ভাবিলাম—ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায হয? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম—"হে ঈশ্বর, যদি থাকো, এ অকূলে কূল দাও।" গীতা ভগবান বলিয়াছেন—"কেহ কেহ আর্ত হইযা আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয দিই।' দেখিলাম, গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য, সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয, শচিবে আশা সূর্য উদয হইযা হৃদযান্ধকার দূর কবিল। বিপদসাগবে কূল পাইলাম। কিন্তু এতদিন সন্দেহ পোষণ কবিযা আসিতেছি, 'ঈশ্বব নাই' অনেক তর্ক করিযাছি, তাহাব স৲স্কাব কোথায় যাইবে? কার্য কারণ সম্বন্ধ বিচার কবিতে লাগিলাম—দেখিলাম, এই কার্য হইতে এই কারণ উপস্থিত হইয়া আমাকে বিপদ হইতে মুক্ত কবিযাছে। সন্দেহ হয, কিন্তু একেবারে ঈশ্বব নাই—তাহা আর জোর কবিযা বলিতে সাহস হয না। অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল। ঘটনাস্রোতে কথনো বিশ্বাস আনে—কথনো সন্দেহ আনে। এ বিষযে যাহাদেব সহিত আলোচনা করি, তাঁহাবা সকলেই একবাক্যে বলে যে, গুরু উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলিতে তর্কবুদ্ধি সম্মত হইল না। বিশেষত গুরুকে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বব' বলিযা প্রণাম কবিতে হয—এ প্রণাম মানুষকে কিরূপে করিব? এতো চাতুরী। কিন্তু সন্দেহেব বিষম তাডনা। হৃদযে ঘোব দ্বন্দ্ব উপস্থিত। সে অবস্থা বর্ণনাতীত। সহসা চক্ষু বন্ধন করিযা লইয়া গিযা জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিযা রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয— আমাব তাৎকালিক অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাডনায কথনো কথনো শ্বাসবোধ হইয়া যায়। দুষ্কর্মেব স্মৃতি মুহুর্মুহু জ্বলিযা উঠে, ও হৃদয়ান্ধকার আবও গাঢ করিযা তোলে। এই সময়ে পরমহ৲সদেব আমায় দর্শন দেন। আমি আমাদের পল্লীর চৌমাথায একজন ভদ্রলোকের বকে বসিয়া আছি, এমন সময পরমহ৲সদেব তাঁহার দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পূর্বদিকেব বাস্তা হইতে ৺বলরাম বসুর বাডি যাইবার জন্য আসিতেছেন। ইতিপূর্বে স্টাব থিয়েটারে তিনি আমার "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। "নারায়ণ" নামে একজন ভক্ত, আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া যেন কি বলিল—উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে নমস্কার করিলেন। আমারই সম্মুখ দিয়া

বলরামবাবুর বাটী চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, কি যেন টানিতেছে, আমি সে টানে স্থির হইতে পারিতেছি না। সে যে কি অবস্থা, আমি বলিতে পারি না, কোনও আত্মীয়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা যেরূপ, তাহা নয়, এ এক নূতন রকম। এ টান পূর্বে কখনো হয় নাই। আমি যাইব কি না যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় তাঁহার একজন ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাকে বলরামবাবুর বাটী যাইতে আহ্বান করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় পরমহংসদেব বসিলেন, আমিও বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, গুরু কি?" তিনি বলিলেন, 'তোমার গুরু হইয়া গিয়াছে। গুরু কি জানো?—যেন ঘটক। মিলাইয়া দেয়, ঈশ্বর লুব্ধ চিত্ত ঈশ্বরের সহিত মিলাইয়া দেয়।' তাঁহার কথা কতদূর বুঝিলাম তাহা জানিনা, কিন্তু পরম শান্তি হইল। নানা কথা হইতে লাগিল, যেন কে আপনার লোক কথা কহিতেছে। অল্পপূর্বে আলাপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কথায় প্রকাশ হইতে লাগিল—যেন বহুদিনের আলাপ। তিনি আর একদিন তাঁহাকে থিয়েটার দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও স্বীকৃত হইলাম। স্থির হইল, 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখিতে যাইবেন।

"প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ের দিন, তিনি থিয়েটারে আসিলেন। তাঁহাকে কিরূপ দেখিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। সেদিন কথায় কথায় তিনি আমায় বলিলেন যে, 'তোমার মনে আড আছে।" আমি ভাবিলাম আছেই তো। জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আড কিসে যায়?' তিনি উত্তর করিলেন— বিশ্বাস করো।'

তাহার পর ৺রাম দত্তের বাড়িতে আসিবেন—একটু চিরকুট পত্রে সংবাদ পাই। সংবাদ পাইবামাত্র পূর্বে যেরূপ আকর্ষিত হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সেইরূপ আকর্ষিত হইলাম। রামবাবুর বাড়ি গিয়া, পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কি হইবে?' তিনি বলিলেন—"খুব হইবে। "আমার মনের আড?" প্রভু বলিলেন— 'থাকিবে না?' আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

এই কয়েকদিন দর্শনলাভে আমার মনে মনে উদয় হইল, এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় ইনি কি পান নাই? বোধ হয় [পান নাই]—নচেৎ এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্তা কেন কন? কথায় মনে হয়, পরম আত্মীয়। ইনি কে? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে যে, ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইঁহাকে আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইঁহার চরণে আশ্রয় লইব। ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।

দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। প্রভু বসিয়া আছেন, ভবনাথ নামে একজন শিষ্যের সহিত

কথাবার্তা কহিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিবামাত্র, যেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, তিনি বলিলেন—"এই তোমার কথা আমি বলিতেছিলাম, সত্যি, জিজ্ঞাসা করো।" একটি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—আমি, যেমন বাপের কাছে আবদার করে, সেইরূপ আবদার করিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, আপনি আমায় কিছু করিয়া দেন।" এ কথায়, বোধ হইল, যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমার মনে আর মলা নাই, আমি নির্মল হইয়াছি। আসিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহাশয়, আপনাকে দর্শন করিয়া গেলেম, আবার কি, কার্য করিতেছি, তাহাই করিব?' তিনি বলিলেন, 'করো।' আমার মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত, যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য—এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন যামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এই ভাব—পরমসাহস পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোনো ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যু ভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।

আমি তো এইরূপ ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁহারই মুখে শুনি যে, প্রভু আমার কথা কত বলিয়াছেন। যদি কেহ আমার নিন্দা করে, খুঁজিয়া নিন্দা করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন—"না জাননা, ওর খুব বিশ্বাস।

মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে আমাকে খাওয়াইবার জন্য খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেইজন্য মুখ ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন—'পায়েস খাও।' আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন—"তোমায় খাওয়াইয়া দি।" আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম, তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচে পুঁছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে-পুঁছে খাওয়াইয়া দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা, খাওয়াইয়া দিতেছেন—এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে, অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল, না স্বপ্নে দেখিয়াছি? একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি দেবদৃষ্টিতে আমাকে

উলঙ্গ বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া, যেন নগ্ন বালকের ন্যায় হইতাম। যে-সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপ জানিতেন, তাহা আমি জানিনা, সেইসকল দ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন। আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কিনা—জানিনা। বোধহয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না—সম্পূর্ণ অনুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, কচিৎ কখনো সে ভাব উদয় হইলে, জড় হইয়া যাই।

তাঁহাকে পরম আত্মীয় জানিয়াছি, কিন্তু সংস্কারবন্ধন অতি দুশ্ছেদ্য। একদিন থিয়েটারে মত্ততাবশত কতই অকথ্য কথনে তাঁহাকে গালি দিলাম, তাঁহার ভক্তেরা কুপিত হইয়া আমাকে শাস্তি দিতে উদ্যত, তিনি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমারও তত কবিতার মুখ চলিতেছে। আমি তাহাকে জেদ করিয়া ধরিয়াছি, 'তুমি আমার ছেলে হও। তিনি বলেন—'কেন? তোর গুরু হব—ইষ্ট হব।' আমি বলি—'না, তুমি ছেলে হও।" তিনি বলেন—"আমার বাপ অতি নির্মল ছিলেন—আমি তোর ছেলে কেন হইব? আমার মুখের তোড় যতদূর চলে চলিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া গেলেন। আমার মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আদুরে গোপাল, বয়াটে ছেলে যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও পরমহংসদেবের আদরে, বয়াটে ছেলের মতো কায করিয়া নির্ভয়ে রহিলাম। পরে অনেকে অনেক বলিতে লাগিল, কায ভাল হয় নাই—ক্রমে [তাহা] বুঝিলাম, কিন্তু তবুও পরম হংসদেবের স্নেহের উপর আমার এত নির্ভর—তাহার স্নেহ এত অসীম যে, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন—এ আশঙ্কা একবারও জন্মিল না। দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই তাহাকে বলিতে লাগিল যে, ওরূপ অসৎ ব্যক্তির নিকট আপনি যান? কেবল এক মাত্র ৺রামচন্দ্র দত্তই বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, ও আপনাকে পূজা করিয়াছে কালীয় নাগ ভগবানকে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাকে বিষ দিয়াছেন, আমি কোথা হইতে সুধা আপনাকে দিব। গিরিশ ঘোষকেও যাহা দিয়াছেন, সে তাহাই দিয়া আপনাকে পূজা করিয়াছে।" পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন—'শোনো-শোনো—রামের কথা শোনো। আবার অনেকেই আমার নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, 'গাড়ি আনো, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাইব।' স্নেহময় পরমপিতা আমার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করে, সে-অপরাধ আমার পরমপিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ি আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন-দিন অন্তর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময়—সম্পূর্ণ ধারণা রহিল, কিন্তু নিজ কার্যের আলোচনায়

আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলাম। ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে, ভাবিতে লাগিলাম। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন। আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন—"গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিসনে, তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।" আমি আশ্বস্ত হইলাম।

একদিন পদসেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার, ভাবিতেছি—কি আপদ, কে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়। সেকথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হয়ে উঠে, কেবল তাঁহার অসীম স্নেহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই।

পীড়িত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে আসে না, তিনি অমনি বলিতেন—"আহা, সে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।'

তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল—বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কায আগে করিব—পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোনো কার্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়। কোথায় কোনো ঘৃণিত আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম, "মহাশয়, আমি তো মিথ্যা কথা কই কিরূপে সত্যবাদী হইব?' তিনি বলিলেন, 'তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মতো সত্য মিথ্যার পার।" মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষুলজ্জায় দু' একটা এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্তু আমি যে, মিথ্যা বলিতেছি, তাহা জানান দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী—সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য। তিনি আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন। স্পষ্ট কথায়—গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তের মধ্যে যদি কেহ বলিত, আমি পাপী, তিনি শাসন করিতেন, বলিতেন—"ও কি? পাপ কিসের? আমি কীট, আমি কীট—বলিতে বলিতে কীট হইয়া যায়। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখিলে মুক্ত হইয়া যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করিবে না।"

এতক্ষণ আমার অন্তরের কথা বলিতেছিলাম, বলিয়াছি, অন্যের অন্তরের কথা কি জানিব। কিন্তু দেখিয়াছি, কোনও ভক্তের ছিন্নবস্ত্র দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল আসিত, পায়ে জুতা না থাকিলে তিনি ব্যাকুল হইতেন। যখন রোগের দারুণ যন্ত্রণা তিনি ভোগ

করিতেছেন, যদি কোনও ভক্ত সে-সময় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকায় আহারের বিলম্ব হইত, তিনি তাহাকে আহার না করাইয়া নিরস্ত হইতেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি অস্থির। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ঐহিক পারমার্থিক পিতা জানিতেন। তিনিও মাতাঠাকুরাণীকে বলিতেন যে, লোকে পুত্রের কামনা করে, সকল পুত্র সুপুত্র হয় না, কিন্তু তোমায় আমি কতকগুলি পুত্র দিয়া যাইতেছি, সকলেই সুসন্তান। তিনি শিষ্যকে পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবৎ—এ কথায় ঠিক প্রকাশ হইল না, অন্য কথার অভাবে পুত্রবৎ বলিতেছি, নচেৎ সম্পূর্ণ ঐহিক পারত্রিকের দায়িত্ব গ্রহণ যিনি করেন, তিনি কে? তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ? তিনি যে, 'মুক্ত' অভিমান রাখিতে বলিতেন, এই সম্বন্ধ বিচার করিলেই, ঐ 'মুক্ত' অভিমান আপনিই আসে, মৃত্তিকার দেহে যেন আর আত্মা আবদ্ধ থাকে না, চিত্তের মালিন্য দূর হয়, কাম ক্রোধাদি দুর্দমনীয় রিপু অন্তর্হিত হয, কোনও সাধন ভজনের প্রয়োজন থাকে না, কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি। উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। উপলব্ধিই মানবজীবনের চরম অবস্থা। এই অকিঞ্চনের সেই স্থায়ী উপলব্ধি হউক, সকলে আশীর্বাদ করুন।*

[* উদ্বোধন ১ বৈশাখ ১৩১২। রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত প্রবন্ধ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথা প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহা আলোচনা হইত। সে-সকল কথা বারবার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুন পুন জিজ্ঞাসা করিতাম, ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেকবার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বারবার শুনিয়াও আমার তৃপ্তিলাভ হইত না, এবং পুন পুন জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিযাছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি, এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে, এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধহয়, আমার প্রকাশ শক্তির অভাব সত্ত্বেও "উদ্বোধনে"র পাঠকের সে সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশশক্তির অভাব [আছে], তাহা সৌজন্যসহকারে দীনভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলিলাম,

তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়-ভাবে উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখকান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। আমাতে তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিরসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে, বিবেকানন্দ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন। ক্রমশ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রামদাদা বলিলেন—"বিলে, কি এদিক ওদিক ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে বেড়াস—যদি ধর্ম কর্ম করবার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না।

রামবাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, 'তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া, আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন, 'আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রামদাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি—উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট। অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাহার প্রেম। খ্যাপাও ভাবিলাম, [আবার] মুগ্ধও হইলাম। সে এক অপূর্ব অবস্থা।" বিবেকানন্দ যখন বাড়ি ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুন পুন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ি আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথাই ভাবেন। এ কি? এরূপ তিনি কখনো দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট।

খ্যাপার কথা রামদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইলেন—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনীবিদ্বেষী, শিশুকালে মৃন্ময় শ্রীরামমূর্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন, কিন্তু যেদিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সেদিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভালো লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কলকে কিনিয়া আনিলেন, সেইটি মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই

গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভাণ করিয়া বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই। স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুন পুন দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন-দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই। গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন—"শোন্ না, কথা শোন না।' বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—'কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, 'তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।' ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরু শিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন—'ও তোমার মাথার ব্যারাম।" দেবদৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম। অন্ধ বিশ্বাসে তুমি সাকার মূর্তি মানো।' বিবেকানন্দ বলিতেন, 'এইরূপে তো তর্ক বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ভালো, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?' (পরমহংসদেব অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন)। গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, "সেইদিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম।" বলিতেন—"অন্ধবিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধবিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধবিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে

লাগিলাম, অন্ধবিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না।" এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক যুক্তি সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোনোরূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন-দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য-নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড়বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়। গুরুর উপদেশে ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন সমাধি—মস্তিষ্কের বিকার নয়। [তখন] গুরুর নিকট সমাধিলাভের প্রার্থী হইলেন। বলিলেন—"আমার পরম পদার্থ নির্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।' গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এই নির্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত? ' ইহা তো পূর্বে একদিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময়, তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে— 'করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে।' ' দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে? বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদানমাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহা ভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—'করো কি গো। আমার যে বাপ আছে—মা আছে।'

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে—আমরা [যে কথা] বলিতেছিলাম—গুরু, শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন— জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য করো। জীবের নির্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতি দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিমান, সমাধিলাভের পরও ফিরিবে। তোমার মহাকার্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের [এমন] একটি অবস্থা হইল যে, [যে] সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞালাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু

হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই!—এই নির্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য করো, কার্যান্তে পাইবে।"

কি কার্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য করিতেন, বলিতেন তাঁহার গুরুর কার্য করিতেছেন। কেহ-কেহ এ বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম, এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহা-জ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ ভক্তি বিভোর [সেই] মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন জ্ঞান [ও] ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান [ও] ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ, ভক্তি পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞানলাভে তিনি বুঝিবেন, পরম হংসদেব যে বলিতেন, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান" তাহা সত্য।*

* [উদ্বোধন ১৫ মাঘ ১৩১১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের গুরু শিষ্য ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে উদ্দেশ্য কী ছিল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য স্বয়ং বিবেকানন্দই তাঁহার "মাই মাস্টার" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। উপস্থিত আমার বর্ণনা উক্ত প্রবন্ধের ছায়ামাত্র। সে জীবন্ত ভাষা, জ্বলন্ত গুরুভক্তি, ও হৃদয়ের বিমল উচ্ছ্বাসের অভাব [এখানে] নিশ্চয় হইবে। যাঁহারা পরমহংসদেবের পাদস্পর্শ করিয়াছেন, পরমহংসদেবের শ্রীমুখে তাঁহার ধর্মানুরাগের কথা শুনিয়াছেন, এবং বিবেকানন্দের "মাই মাস্টার' প্রবন্ধে তাহার প্রতিরূপ ছবি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম শুনিয়া যাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে

পারেন নাই, যে ধারণা তাঁহার অস্ফুট ছিল, বিবেকানন্দের বর্ণনায় তাহা উজ্জ্বলরূপে বিকাশ পাইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব তাঁহার [নিজ] জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই অবগত ছিলেন, যে-কার্যভার লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন, তাহা বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি কে, কি আধারে গঠিত, তাহা তিনি বাল্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জানিতেন। যাহা জানিতেন তাহা কল্পনা বা সত্য— ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। জড় বৈজ্ঞানিক যেরূপ প্রত্যক্ষবাদী, যাহা পরীক্ষিত নয়, তাহা যেরূপ অগ্রাহ্য করেন, অন্তর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরমহংসদেবও সেইরূপ প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষীভূত না হইত, তাহা পুস্তকে বা লোকমুখে বর্ণিত হইলে তিনি প্রত্যয় করিতেন না। তিনি স্বয়ং দেখিবেন, এই তাঁহার সংকল্প ছিল। কঠোর সাধনায় সংকল্প সিদ্ধ হয়। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ পাইতে লাগিল। জড়বিজ্ঞানে যে সমস্ত জড়সম্বন্ধ দেখা যায় তাহার অন্তর্নিহিত একটি অবিনাশী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এক তারে সংবদ্ধ একটি অপরিবর্তনশীল নিয়মে সংযোজিত, সমস্তই এক, একের বিকাশ মাত্রই বৈচিত্র্য—তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—ঈশ্বর কথার কথা নন সত্য প্রত্যক্ষের বিষয়, তাঁহার সহিত আলাপ করা যায়, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি গুরুরূপে শিক্ষা দেন, তাঁহার উপদেশে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, জীবন নিরর্থক নয় বোঝা যায়, জড়ানন্দ তুচ্ছ হইয়া পরমানন্দ লাভ হয়। পরমহংসদেব উৎকটসাধনে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যেরূপ আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্তা কই, জগন্মাতার সহিত তাঁহার সেইরূপ কথাবার্তা চলিল। তিনি বাল্যাবস্থায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা [যে], কল্পনা নয়, জগন্মাতার কথায় [সে বিষয়ে] নিশ্চিত হইল। জগতের হিতসাধনায় তাঁহার আবির্ভাব—তিনি বুঝিলেন, ও মহাকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন এক বালকশিষ্য আসিয়া পদতলে প্রণাম করিল। শিষ্যের প্রথম কাতর প্রশ্ন—"আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?' গুরু বলিলেন—'হাঁ।' শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রমাণ করিতে পারেন?' আবার উত্তর— হা। পুনর্বার প্রশ্ন—"কিরূপে?" গুরু বলিলেন—'তোমায় যেমন দেখিতেছি, তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি। তুমিও যদি দেখিতে চাও, দেখিতে পাও।" সেই শিষ্য—আমাদের বিবেকানন্দ। লোকে তখন তাহাকে 'নরেন্দ্র' বলিয়া ডাকিত।

গুরুসহবাসে নরেন্দ্র দিন দিন দেখিতে লাগিলেন (আমি নরেন্দ্রের ভাষা অনুবাদ করিয়া বলিতেছি) যে, ধর্ম কল্পনা নয়, জড়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত হইবার বস্তু, তাহা আদানপ্রদান করা যায়, মহাপুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শে জীবন পরিবর্তিত

হয়। বুদ্ধ, যীশুখ্রীস্ট ও মহম্মদের জীবনীপাঠে শিষ্য দেখিয়াছিলেন যে, উক্ত মহাপুরুষদিগের কথায় মানব পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল—এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধর্ম—জড়বস্তুর ন্যায় প্রদান করা যায়—তাঁহার গুরু তাঁহাকে [সেকথা] বলিলেন ও শিষ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। গুরুর কৃপায় দিন দিন তাঁহার প্রবল ধর্মপিপাসা মিটিতে লাগিল, তিনি পূর্ণত্বলাভের প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন—"যতদিন দেহ থাকে, আমি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করি—আজ্ঞা করুন।' তখন গুরু বলিলেন—'কেবল তোমার নিমিত্তই তোমার জীবন নহে—তোমার জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য—তুমি আমার সহকারী, জগতের হিতসাধন তোমার কার্য—তুমি তোমার নও, তুমি জগতের। পূর্ণ হইবার প্রার্থনা করিতেছ কি? তুমি পূর্ণ।" পরমহংসদেবের অনেক শিষ্যই জানেন যে, কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল।

উক্ত প্রকারে গুরুর নিকট মহাকার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, সেই মহাভাব কিরূপে বহন করিবেন, তন্নিমিত্ত [শিষ্য] চিন্তান্বিত হইলেন। এই মহাভার বহনে কতদূর তিনি সক্ষম, তাহাও তিনি তৎকালে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই গুরুভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। গুরু লীলাসংবরণ করিলেন। লীলাসংবরণের পূর্বে কয়েকটি শিষ্যের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। নাবালক সন্তান থাকিলে পিতা যেরূপ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন, নরেন্দ্রের ধর্মজীবনের পিতা, সেইরূপ তাহার উপর অন্য সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

নরেন্দ্রের এই ভারগ্রহণের কিরূপ উপযোগিতা ছিল তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক। গুরু যেরূপ বাল্যকাল হইতে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, নরেন্দ্রের বাল্যক্রীড়া দেখিলে অনুভূত হয় যে নরেন্দ্রও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। বাল্যকালে নরেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন, অমনি বালক সেই পুতুল পরিত্যাগ করিল—যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল লইয়া ক্রীড়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টান্তে বাল্যকালে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুরাগ তাঁহার জন্মায়। পাঠ্যাবস্থায় হঠাৎ পিতৃবিয়োগে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা হাই কোর্টের উকিল ছিলেন, মক্কেলের অনেক কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় ছিল। সেই কাগজপত্র গ্রহণাভিলাষী হইয়া কোনও এক উকিল তাঁহাকে অর্থ প্রলোভন দেখান, নরেন্দ্র লোষ্ট্রবৎ সেই কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দয়ার অসীম বিকাশ ছিল, পিতৃবিয়োগের পর তিনি একরকম একাহারী হইলেন। প্রায়ই জননীকে বৈকালে বলিতেন—"আমার নিমন্ত্রণ আছে।' মনের ভাব এই যে, তিনি বৈকালে আহার না

কবিলে, পরদিন কতক অন্নের সাশ্রয় হইবে। অনেক সময়েই উপবাস দিতেন। এক-দিন এই উপবাসবশত: দুর্বলতায় পথে মূর্ছিত হইয়া পতিত হইতে হয়। যখন দিন চলে না, এইরূপ দৈন্য অবস্থাতেও তিনি দশটি টাকা পাইয়া, পাঁচটি টাকা এক নি ঃ গুরভাইকে প্রদান করেন।

এরূপ তাঁহার দয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। মহাদু খে পতিত হইয়া, একদিন গুরুর নিকট বলেন—"মহাশয়, আমার যাতে মাতা ভ্রাতার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করুন। আপনি যদি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেই আমার অন্নসংস্থান হইবে।" গুরু আদেশ দিলো—'কালীঘরে যাইয়া তুমি প্রার্থনা করো, তোমার মনোরথ সফল হইবে।' গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, গুরুদেব সিদ্ধসংকল্প, নরেন্দ্র তাহা ভূয়োভূয় পরীক্ষায় জানিয়াছেন। মহাপুরুষের আদেশানুসারে দৈন্য নিবারণার্থ কালীঘরে উপস্থিত হইলেন। কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, গুরদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন, প্রার্থনা করিয়াছ?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন—"হাঁ বিবেক, বৈরাগ্য লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি—জগন্মাতার নিকট অন্নের প্রার্থনা আমার মুখে আসিল না।"

আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে নিরিবিলি পাইয়া বলেন— তুমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করো? আমি তোমায় অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিতে পারি।" নরেন্দ্র জানিতেন যে, তাঁহার গুরুর ইঙ্গিতে, স্পর্শে, আজ্ঞায়—ঘোরতর কলুষিত জীবন পরিবর্তিত হইয়া লোকে পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই, গুরু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি তখনই প্রদান করিতে পারিলো। গুরুকে অষ্টসিদ্ধি প্রদানে উৎসুক দেখিয়া, নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'অষ্টসিদ্ধিলাভে ঈশ্বর লাভ হয় কি?" গুরু উত্তর করিলেন—"অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি [লাভে মানুষ] অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন হয়—যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে। 'কন্তু ঈশ্বর-লাভের পথ স্বতন্ত্র।' শিষ্য করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন—'গুরদেব, আমি শক্তিপ্রার্থনা করি না, আমি ঈশ্বরলাভ করিতে চাই। আজ্ঞা করুন, আমার ঈশ্বরলাভ হোক।"

নরেন্দ্রের যেরূপ ঈশ্বর অনুরাগ, তাঁহার দয়াও সেইরূপ অসীম। যদি কাহাকে দেখিতেন যে, দুর্বুদ্ধিবশত পরমহংসদেবের কৃপায় বঞ্চিত হইতেছে, নরেন্দ্র সেই অভাগার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেন, যাহাতে সে কৃপাভাজন হয়, সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, যতক্ষণ না পরমহংসদেব তাহাকে কৃপা করিতে সম্মত হইতেন, ততক্ষণ গুরুর চরণ ছাড়িতেন না। কাহারও শাসনের নিমিত্ত যদি গুরু শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিতেন যে, অমুক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিও না, নরেন্দ্র সে নিষেধ শুনিতেন না। তিনি সেই ভাগ্যহীনের নিকট গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া গুরুর পদপ্রান্তে

অর্পণ করিতেন। বলাবাহুল্য যে, সেই ভাগ্যহীন, দয়াল নরেন্দ্রের দয়াবলে, পরমহংস-দেবের দয়া লাভ করিয়া মহা ভাগ্যবান হইত।

নরেন্দ্রের জগৎ হিতকর কার্যসাধনের ভার গ্রহণ করিবার উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। সম্পূর্ণ পরিচয়—বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার গুরুর কী কার্য এবং নরেন্দ্র কিরূপে তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন।

পরমহংসদেব যখন জগৎসমক্ষে উদয় হন, তখন ঘোরতর ধর্মবিপ্লব। জড়বাদী মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে—"জড় হইতেই সমস্ত [হয়], জড়ের সংযোগেই আত্মা, জড় ব্যতীত আর কিছুই নাই।' খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা প্রতিনিয়তই বলিতেছেন—"যদি অনন্ত নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাহ, যীশুখ্রীস্টের শরণাপন্ন হও।' প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম বলেন—"বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, কোনটিই অভ্রান্ত নয়, কোনটিই ঈশ্বরবাক্য নয়। আপনার সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সকল ধর্মের সারমর্ম গ্রহণপূর্বক দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকো।" ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হৃদয় হইতে হিন্দুর দেব দেবী অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাদের নিকট হিন্দুধর্মের আদর আছে, তাহাদের মধ্যেও মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্ব তো চলিতেইছে—এমন কি [এক] সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও বিরোধ—এইরূপ তিলক কাটিতে হয়, এইরূপ রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিতে হয়, এইরূপে এই কার্য, এইরূপে ওই কার্য সম্পন্ন না করিলে নরকগ্রস্ত হইতে হইবে—এই ঘোরতর বিবাদ। প্রকৃত ধর্মপিপাসুর তৃপ্তির স্থান নাই—মহা দ্বন্দ্বারণ্যের মধ্যে পতিত হইয়া পন্থাহারা। এমন সময়ে পরমহংসদেব প্রচার করিলেন—"কোনো ধর্ম—কোনো ধর্মই বিরোধী নয়। বাহ্য দৃষ্টিতেই বিরোধ, কিন্তু সকল ধর্মই ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র। অজ্ঞান দৃষ্টিতে যে সকল ধর্মসাধন পরস্পরবিরোধী—পরমহংসদেব সেই সেই প্রত্যেক ধর্ম সাধন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী নদ নদীর ন্যায় সকল ধর্মের গতি ঈশ্বরাভিমুখে ও সকল ধর্মের চরম ঈশ্বরলাভ।' মহা সত্য প্রচার করিলেন, বিতণ্ডা রহিল না।

পরমহংসদেব যখন প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন যে কেবল ধর্মযাজকেরা তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল, তাহা নয়, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানীরাও খড়্গহস্ত হন। এই-শিক্ষাভিমানীদের মতে, "ধর্ম ধর্ম' করিয়াই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। ধর্মের কার্য-কারিতাশক্তি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বার্থত্যাগ যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা তাঁহারা বোঝেন নাই। জড়তাপ্রাপ্তির নাম ধর্ম—তাঁহারা জানিতেন। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত যে, কখনো কোনো দেশে কোনো জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, এই ইতিহাসের সারমর্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বার্থপর ধর্মযাজক-

পরিচালিত ধর্মের পরিণাম—জড়তা। কিন্তু প্রকৃত ধর্মসাধন যে,মহা কর্মশীলতা—তাহা তাঁহাদের অভিমানী বুদ্ধি বুঝিতে দেয় নাই। স্বার্থত্যাগে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব যে জাতীয়তাব প্রকৃত ভিত্তি, এ জ্ঞান স্বার্থজড়িত হৃদয়ে প্রবেশ করে না। গুরু-উপদেশে নবেন্দ্র এই ভিত্তির উপর তাঁহার উচ্চজীবন গঠন কবিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত 'নরেন্দ্র' বলিয়া আসিতেছি—'বিবেকানন্দ' বলি নাই। তাহার কারণ এই, গুরুদেব অন্তর্ধান হইলে, নরেন্দ্রের উপর মহাভাব পড়িল। তিনি উচ্চ কার্য-সাধনের নিমিত্ত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথায় যান, অচিরে বিখ্যাত হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য, নানা স্থানে নানা নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন। দীন কুটীরে প্রবেশপূর্বক দীনেব সম্যক অবস্থা জানিবার [জন্য] তাঁহার সংকল্প, কিন্তু যে নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সে নামে পরিচিত হইলে, তিনি দীন কুটীরে অবস্থান করিতে পারিবেন না—আদরে অট্টালিকাবাসী তাঁহাকে লইয়া গিয়া অট্টালিকায় স্থান দিবে, দরিদ্র ব্যক্তি তথায় যাইতে পারিবে না, দরিদ্রসহবাস হইবে না—এই কারণে তাহার আত্মগোপন ও নাম পরিবর্তন। 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণের পর, ঘরে ঘরে তাঁহার মূর্তি পুজা হইতে লাগিল, আর আত্মগোপনেব উপায় রহিল না।

বিবেকানন্দ (এখন বিবেকানন্দ বলিব) গুরুর শিক্ষায় কী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি উপরোক্ত মাই মাস্টার নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মর্ম—সকল ধর্মের সমন্বয়। এই সত্য প্রচারে ব্রতী হইয়া, তিনি ঘরে ঘরে বুঝাইতে লাগিলেন—"চিত্তশুদ্ধি, আত্মত্যাগ পরহিতব্রত—ঈশ্বরলাভের উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। একমাত্র ত্যাগী ব্যক্তিই জাতীয়তা স্থাপনে সক্ষম। ত্যাগই জাতির আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। স্বার্থত্যাগ-মাত্রেই মানব মহাকর্মশীল হইয়া উঠে—কার্যে, দৃষ্টান্তে, উপদেশে অপরকে স্বার্থত্যাগী করিতে সক্ষম হন—এবং যে জাতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী, সে জাতির উন্নতি সাধনের আর বিলম্ব কি থাকে।

বিবেকানন্দের কার্য কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা যিনি বিবেকানন্দের নাম শ্রুত আছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু নিন্দুক এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বোধহয় সকল মহাকার্যেই তাহাদের প্রয়োজন। নিন্দুক, সীতার বনবাস দিয়াছিল, প্রেমের বৃন্দাবন-লীলায় জটিলা কুটিলা ছিল, বিবেকানন্দের লীলায়ও নিন্দুকের অভাব নাই। নিন্দুক পরমহংসকে পরিত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দকে ধরিল। তাঁহার স্বদেশ বিদেশের কার্যের কোনও উল্লেখ করিল না, মহা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে, বিদেশীকে সনাতন ধর্ম প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদেশীরা আসিয়া, ভারতের সন্তানের ন্যায়, ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিল না, স্বদেশে ক্রিশ্চান দমন

ও মিথ্যা ধর্মযাজকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া [তাঁহার] বেদের মাহাত্ম্য স্থাপনের [মহাকার্যের] প্রতি লক্ষ্য রাখিল না, স্বদেশে দীন-গৃহে, রুগ্ন গৃহে বিবেকানন্দ দ্বারা কার্যে প্রবর্তিত নির্ভীক সন্ন্যাসীদিগের কার্য দেখিল না, আত্মীয় পরিত্যক্ত মুমূর্ষুর সেবা দেখিল না, অনাথ বালক আশ্রম দেখিল না, কেবল সর্বত্যাগী মহা পুরুষকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিল। নিন্দুক তাহার নিন্দা লইয়া থাকুন, তাঁহা দের জীবন কাহারও লক্ষ্য করিবার বা ঈর্ষা করিবার নহে কিন্তু যাঁহারা পরমহংস দেবের মতের সহিত বিবেকানন্দের মতের পার্থক্য দেখেন, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিবেন যে, পরমহংস-দেবকেই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন। যথাসাধ্য [তাহা] বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কামিনীত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত ভক্তিধর্ম কলুষিত হইয়া, নেড়া নেড়ীর বামাচারে পরিণত হইয়াছে। ভাগবতের [এই] মর্ম যে, কামবর্জিত ব্যতীত রাসলীলা পাঠের কেহই যোগ্য নয়। নিষ্কাম ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা অনুভব করা দুঃসাধ্য। বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ভক্তিগান শ্রবণে অনেকে পরিজন ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। ত্যাগী ব্যতীত ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই নিমিত্ত তিনি কর্ম সাধন প্রচার করিয়াছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন—"কর্মে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ চিত্তশুদ্ধি হইবে না। বঙ্গীয় যুবার উপর তাহার সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর ছিল। বঙ্গীয় যুবককে তিনি বারবার বলিয়াছেন—'কর্মে প্রবৃত্ত হও। ভ্রাতৃভাবে মিলিত হও। পতিত ভারতের উন্নতি সাধন করো—আত্মোন্নতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। কার্যই ধর্মজীবন, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য করো - কার্য—কার্য।—সকল স্বার্থ বিসর্জন দাও। কার্যশীল ব্যক্তির নিকট মুক্তিকামনাও তুচ্ছ। কার্যের অধিকারী হও।" আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুর নিকট সমাধি বা পূর্ণত্ব প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার গুরু তাহাকে সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া, কার্যে প্রবৃত্ত করেন। বিবেকানন্দ তাহার গুরুদেবের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া ছিলেন এবং যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে চান, তিনি কেবল বহু পৃষ্ঠাব্যাপী রামকৃষ্ণের জীবনী বা উপদেশ পাঠে বুঝিতে পারিবেন না, বিবেকানন্দের জলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিনিয়ত রাখিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বিবেকানন্দ ভক্তিধর্ম প্রচার করেন নাই, তাঁহাদের— "ভক্তিধর্ম কাহাকে বলে"—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর খুঁজিয়া পাইবেন না। যে মহাত্মা সর্বভূতে ভগবানকে দেখেন, যিনি কায়মনোবাক্যে সেই সর্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি আপনার অন্তরে, যে ভগবান স্থাপিত, তাহার সর্বভূতে সর্বব্যাপী ভাব

দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন—যদি সেই মহাপুরুষ না ভক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত কে ? কেবল ধেই-ধেই নাচিয়া একবার চক্ষের জল ফেলিলে যদি ভক্তি হইত, তাহা হইলে ভক্তি অতি অনায়াসলভ্য বস্তু বলিতাম। ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব তরুণ তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া কেহ চলিয়া গেলে ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ জনসেবা পরম ধর্ম প্রচার করিয়া কি সেই ভক্তচূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই ? বিবেকানন্দ ভক্তি ভাণের বিরোধী ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত, পর সেবার উপদেশ দিয়া তিনি ভক্তিধর্মের সারমর্ম প্রচার করিয়াছেন। যিনি ভক্তি লাভের প্রয়াসী, তিনি গুরুভক্ত বিবেকানন্দকে জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ চক্ষের উপর রাখিয়া পর সেবায় ব্রতী হইয়া দিনদিন ভক্তিপথে অগ্রসর হোন, এবং বিবেকানন্দের ন্যায় পরম ভক্তিধর্মের অধিকারী হইয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করুন। এ আমার উৎসাহ-বাক্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব—বিবেকানন্দ ইহা তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময় পরমহংসদেব অন্তর্ধান হন, শিষ্যমণ্ডলী ব্যাকুল, তখন বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাসপ্রদান করেন, বলেন—"ভাই, ভয় কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা জনে জনে সেইরূপ হইব।" রামকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সহকারী হইয়াছিলেন। যিনি বিবেকানন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তিনি বিবেকানন্দের সহকারী নিশ্চয় হইবেন। বিবেকানন্দ সেই মহাপুরুষের উপরেই সমস্ত কার্যভার অর্পণ করিয়া অন্তর্ধান হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করিতে করিতে, আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা মনে পড়িতেছে। সে ভালবাসার প্রতিদান হয় না। কিন্তু স্মৃতিপথ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মধুর আলাপ, যত্ন মধুর বাগযুদ্ধ দ্বারা উপদেশ প্রদান, আমার ন্যায় অমানীকে মান দান—সে সমস্ত উল্লেখ করা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিই—তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রীমান পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে আহূত হইয়া আসেন। তিনি বাটিতে প্রবেশমাত্র অনেকেই তাহার চরণ স্পর্শ করিল——আমিও চরণ স্পর্শ করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি অবনত হইতেছি, অমনি তিনি আমার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন—"কি করো ঘোষজা, আমার যে অকল্যাণ হবে।" এরূপ অমানীকে মানদান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য বিবেকানন্দতেই সম্ভব।

পরিশেষে আমার বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিনয়ে নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমার যাহা ত্রুটি হইল, তাহা তাঁহারা মার্জনা করুন। আমার বিবেকানন্দকে

ভয় নাই—অসীম ভ্রাতৃপ্রেমে তিনি বারবার আমার ত্রুটি মার্জনা করিয়াছেন, এখনও করিবেন। ভয়—তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে—তাঁহারা আমার ত্রুটি গ্রহণ না করেন—এই আমার প্রার্থনা।*

[*'তত্ত্বমঞ্জরী' ফাল্গুন ১৩১১। প্রবন্ধটি বেলুড় মঠে ২৩ মাঘ ১৩১১ রবিবারে স্বামীজীর জন্মোৎসব সভায় পঠিত হয়।]

বিবেকানন্দের সাধনফল

যদি কোনো সংসারী ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইতেন যে, পুত্র কলত্র লইয়া সংসারে বিজড়িত হইয়াছি, আমাদের উপায় কি?—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যে পুত্রের মমতায় ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না, সেই পুত্রকে রাম জ্ঞান করিয়া লালনপালন করিও, তোমার ঈশ্বরলাভ হইবে। আপত্তি উঠিত যে, রাম জ্ঞানে সেবা করিলে পুত্র অবাধ্য হইবে স্বেচ্ছাচার হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, অশিক্ষিত থাকিবে, অতএব যে পুত্রের মমতায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রের ভাবী মঙ্গলকামনায় সেই মমতায় তাঁহাকে রাম জ্ঞানে পূজা করিতে বিরত রাখিবে। তাহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বোধনে [প্রকাশিত] শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' বর্ণিত আছে যে, কোনো এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা ঠাকুর পান। রামলালা অর্থে বালক রাম। সেই বালক রাম যেন তাঁহার পুত্র হইল—তাঁহাকে লালন পালন করেন, সঙ্গে লইয়া ফেরেন, বেয়াদব হইলে ধমক দেন, এমন কি, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, 'একদিন কথা না শুনিয়া রামলালা জলে সাঁতার দিতেছিল, আমি তাহাকে শাসিত করিবার জন্য জলে চুবাইয়া ধরিয়াছিলাম।' বলিতে বলিতে সহস্রধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া গেল। অবশ্য সন্ন্যাসী প্রদত্ত রামলালা একটি ক্ষুদ্র বিগ্রহ, যেটি অদ্যাবধি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী কালীর মন্দিরে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের "রামলালা'—ভাবের রামলালা, ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতেন, এবং ভাবে শাসিত করিতেন। যিনি এই ভাবের বশবর্তী হইয়া স্বীয় পুত্রকে রামলালার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, [তিনি] পুত্রকে রাম জ্ঞানে প্রতিপালন করিলে পুত্র অবাধ্য হইয়া পরিণামে মন্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেননা, অপার প্রেমে পুত্রকে যশোদার ন্যায় শাসন মানসে বন্ধনও করিতে পারেন এবং যশোদাও যেরূপ একমাত্র গোপালকে প্রতিপালন করিয়া

পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যে সংসারী রাম জ্ঞানে পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন, তিনিও সেইরূপ পরম জ্ঞানের অধিকারী হইবেন। পুত্রকে রাম জ্ঞানে প্রতিপালন করিলেই বুঝিবেন, রাম ক্ষুদ্র নয়। পুত্র রামে তাহার ধ্যানজ্ঞান হইলে দেখিতে পাইবেন যে, রাম অতি বৃহৎ। সর্বভূতে রাম, বিশ্বব্যাপী রাম জানিয়া রামে লয় হইবেন। সংসারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরলাভের পন্থা নির্দেশ করিয়া দিতেন।

আবার যে ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যে ঈশ্বরলাভ আশায তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে নির্জনে ধ্যানারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহারও প্রথমে ইষ্টধ্যান একটি ক্ষুদ্র মূর্তি, সেই মূর্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বব্যাপীভাবে সাধককে বিশ্বের সহিত মিলাইয়া লইত। এরূপ সাধনার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিযা বলেন যে, জড়বৎ সংসারে কোনও কার্য না লইযা থাকা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সংসারে আসিয়া যদি সংসারের কার্য না করিলাম সে তো একপ্রকার অকর্মণ্য জীবনভার বহনমাত্র। এ আপত্তিরও প্রতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। দ্বাদশ বৎসর ধ্যানারূঢ় থাকিয়া সেই বিশ্বপ্রেমিকের কার্য 'রামকৃষ্ণ মিশন' রূপধারণ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত বিকাশ পাইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর আপনিই আসে।' শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রফুল্ল সরোজে মধুলোভে দলে দলে সাধকরূপ ভ্রমর আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বোক্ত সাধনের দুইটি পন্থা নির্দেশ করিযাছেন এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ পন্থায সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ এই উভয় সাধনেই সিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত বালক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য কলিকাতাস্থ সমস্ত ধর্মসম্প্রদাযে উপস্থিত হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন— কিরূপে ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক মত তাঁহাকে বলিযাছিলেন কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি তাঁহার একটি উদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্ন—"ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি?" এ প্রশ্নের উত্তরে কেহই "হাঁ" বলিতে সক্ষম হন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পান।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের সুবাদে দাদা ছিলেন। তাঁহারই সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। যেরূপ অন্যান্য স্থলে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"হ্যা, যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইচ্ছা করো, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।" ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। কিরূপে ঈশ্বরলাভ করিবেন,

এ নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ ব্যাকুলতা, তাঁহার গুরুরও সেইরূপ শিক্ষাপ্রদান। গুরুর উপদেশে বুঝিয়াছিলেন, নির্বিকল্প সমাধিলাভ অতি উচ্চ অবস্থা। তাঁহার মনে বাসনা জন্মে যে, যতদিন দেহ থাকে, তিনি সেই নির্বিকল্প অবস্থায় থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে দেহরক্ষার্থে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার সমাধিস্থ হইবেন। এই অবস্থা তিনি গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে তাঁহার গুরু বলেন—"এরূপ স্বার্থপর হইও না, তুমি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিবে, কিন্তু পর হিতসাধন তোমার জীবনের কার্য হোক। তোমায় ঈশ্বর বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বহু প্রাণী শীতল হইবে।" এই উপদেশ হৃদয়ে অটল ধারণা রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। যে বিবেকানন্দ জগৎপ্রেমে জগৎকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত কৌপিনধারী হইয়া দেশদেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ সৃষ্টির ভিত্তি—উপরোক্ত আদেশ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও ত্যাগীকে দুই ভাবে উপদেশ দিতেন, দুই ভাবের সাধনেই ঈশ্বরলাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরাও সেই দুই ভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। স্বামীজীর উপদেশে কেহ বা সকল মূর্তি নারায়ণের মূর্তিজ্ঞানে নারায়ণ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাশ্রমে সাধন করিতেছেন, আবার কেহ বা ধ্যানে জগৎব্যাপী শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন আশায় অদ্বৈতাশ্রমে অদ্বৈতজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত। প্রবৃত্তি অনুসারে অদ্বৈত [আশ্রম] ও সেবাশ্রম চলিতেছে। দুই আশ্রমের উপদেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। দুই আশ্রমই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর। কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, দুই সাধনেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন।

কথা আছে, চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবক, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের নিকট সে অবস্থা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে সকল উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সাধারণে ঘৃণায় যাইতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অনায়াসে নারায়ণ জ্ঞানে তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন—পুত্রকে মাতা যেরূপ পরিষ্কার করেন—সেইরূপে। কারণ তাঁহাদের শিক্ষাদাতা স্বামী বিবেকানন্দ—নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া উহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। একদা বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা ৺নিরঞ্জনানন্দের সহিত ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। একদিন ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া আছে, দারুণ শীত, অঙ্গে সামান্য বস্ত্রমাত্র, মলদ্বার বহিয়া মল নিঃসৃত হইতেছে, যন্ত্রণায় অধীর, আর্তনাদ করিতেছে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিরূপে আশ্রয় দিবেন, বিবেকানন্দের চিন্তা উপস্থিত হইল। পরের বাটীতে অতিথি

হইয়াছেন, আমাশয় দুরন্ত রোগ, যে গৃহে সে রোগী থাকে, সে গৃহ বিষ্ঠাময় হইয়া যায়। রোগী লইয়া গেলে যদি পূর্ণবাবু বিরক্ত হন। যাহা হউক দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রোগীকে তুলিলেন, উভয়ে মিলিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণবাবুর বাসায় লইয়া আসিলেন, রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া অগ্নিদ্বারা সেক দিতে লাগিলেন। উভয়ে যেরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এরূপ সেবা যদি কেহ পিতার করেন, তাহাও প্রশংসনীয়। উচ্চ কার্যের এমনি আশ্চর্য মহিমা, যে পূর্ণবাবু বিরক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণবাবুই তখন সন্ন্যাসীদ্বয়ের কার্য দর্শনে মুগ্ধ। পূর্ণবাবু ভাবিলেন, কি আশ্চর্য সন্ন্যাসীদ্বয়। সন্ন্যাসীরা স্বতন্ত্র থাকে, অন্যের স্পর্শ অপবিত্র জ্ঞান করে, [আর] একি অপূর্ব সন্ন্যাস বৃত্তি—এরূপ রোগীসেবা যাহার অন্তর্গত। তদবধি পূর্ণবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসীগণকে অন্যপ্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আমাদের কেহ যেরূপ সমালোচনা করেন যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া ধারণ করাটা অলস ব্যক্তির কার্য, যাহারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ তাহারাই ঐরূপে গেরুয়াধারী হয়—পূর্ণবাবুরও কতকটা সেরূপ সংস্কার ছিল। সে ধারণা তদবধি তাহার সমূলে উৎপাটিত হইল।

সর্বভূতে নারায়ণদৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের আর একটি দৃষ্টান্ত বলিব। ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার তাম্রকূটসেবনে ইচ্ছা হয়। দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে। তিনি তাহাদের নিকট কলিকা প্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল—'মহারাজ হাম লোক ভ্যাঙ্গী হায।' ভ্যাঙ্গী অর্থে মেথর। বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—ইহা শুনিয়া তাঁহার মন একবার পশ্চাৎগামী হইল কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্ম তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যের উপযুক্ত নই যে, 'ভ্যাঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূর করণার্থ স্বহস্তে আবর্জনাস্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, সেই রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হইয়া আমার এতদূর অভিমান! বিদ্যুদ্বেগে এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করায় [অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হওয়ায়], স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহিত সমভাবে কথাবার্তা কহিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলাম—"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে মেথরের কলকে টেনেছিলি।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন, "না হে, ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবনরক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।' দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন—"আমি একস্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিনদিন

অনবরত লোকসমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না, তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন-দিন তো অনবরত কথাবার্তা কহিতেছেন কিন্তু জলপান পর্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে?' সে ব্যক্তি অতি কাতরভাবে বলিল, আমার প্রাণ চাহিতেছে কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটি দিব? যদি বলেন, আমি আটা, আনি, রুটি ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।' সে সময় আমি সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে অগ্নিস্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, 'তোমার প্রস্তুত করা রুটি আমাকে দাও আমি তাহাই আহার করিব।' শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত। সে খেতড়ীর রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে, চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটি দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার ভয় নাই রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না। এ কথা তাহা[illegible] প্র[illegible] [illegible] ভগবান দয়া প্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্যবস্তু আনিয়া দিল।' বিবেকানন্দ, বলেন—'সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কিনা সন্দেহ।' বিবেকানন্দের নয়নবা[illegible] ই[illegible] লা[illegible]। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজী সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন—এরূপ কত মহৎ উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে[illegible]। তাহা[illegible] [illegible]। স্বামী বিবেকানন্দের নীচজাতির প্রতি অসী[illegible] [illegible] করিবার ঐ ঘটনা একটি বিশেষ কারণ। তিনি বলিতেন, তাঁহার [illegible] করিবার জন্য ঐ শিক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল।

অভিমান যে রূপ দূর [illegible], তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তচ্ছলে [illegible] আমাদের নিকট আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন [illegible] খেতড়ি রাজার অতিথি, তখন খেতড়ীর রাজা একদিন জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে গান গাহিতে আনাইলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোক কখনও সুচরিত্রা হইতে পারে না, বিশেষত তিনি স্ত্রীলোকের গান শোনেন না। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিলেন—খেতড়ীর রাজা তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন—অনুরোধ করিতেছেন, একটা গান শুনিয়াই উঠিব। গায়িকা গান ধরিল—আমাদের সে গানের একছত্র মাত্র মনে

আছে—"প্রভু, মেরা অওগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুমহারো।" গানের ভাব এই যে, "প্রভু, তুমি তো দোষগুণ বিচার করো না, গঙ্গায় অপবিত্র জল আসিলে সেও গঙ্গাজল হইয়া যায়।" বিবেকানন্দ বলেন — আমি গান শুনিয়া ভাবিলাম যে, এই আমার সন্ন্যাস। আমি সন্ন্যাসী—এ সামান্যা বনিতা—এ [পার্থক্য]জ্ঞান আজও আমার রহিয়াছে। 'বন্ধন বিনা জগদম্বার দর্শন আজও আমি পাইলাম না।' তদবধি সেই গায়িকাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতড়ীর রাজবাটীতে যাইতেন তখনই তাহাকে ডাকাইয়া গান শুনিতেন এবং সেই গায়িকা বিবেকানন্দের মাতৃসম্বোধনে মাতৃভাবাপন্ন হইয়া মাতৃচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখিতেন। এই ঘটনা সাধন অভিমানীর একটি অংশস্বরূপ। ঈশ্বর কোন পথে কাহাকে লইয়া যান, তাহা বুদ্ধির অতীত। যদি কোনো সাধনাভিমানী এই গায়িকাকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়া নায়িকা বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই ঘটনা দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতেন যে, তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক ছিল। ঈশ্বরকৃপায় মূল সামান্যা গায়িকা অনায়াসে বাৎসল্যপ্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিল।

এস্থলে ধনী কামারণী—যাঁহাকে আমরা দেবী জ্ঞানে প্রণাম করি, তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সম্বন্ধ মনে পড়িতেছে। রামকৃষ্ণদেব যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তখন তিনি একেবারে ধরিয়া বসেন যে তিনি ভিক্ষা অপর কাহারও কাছে লইবেন না, ঐ ধনী কামারণীর নিকট গ্রহণ করিবেন। তাঁহার সদাচারী পিতা অদ্ভুত পুত্রের ইচ্ছায় বাধাপ্রদান করেন নাই। কারণ সকলেই অবগত আছেন যে, যে সময় শ্রীক্ষুদিরাম গয়াধামে গমন করেন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, গদাধর তাহার পুত্র হবেন বলিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে আছে। সেইজন্যই তিনি তাহার পুত্রের নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গদাধর ধনীর নিকট ভিক্ষা লইলেও ধনীর 'গদাই' ছিলেন। এস্থলে মাতাপুত্রের একটি অপূর্ব প্রেমের ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামারপুকুর অঞ্চলে অর্থাৎ পরমহংসদেবের জন্মস্থানে চিংড়িমাছ প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন কামারণী চিংড়িমাছ পাইয়াছিলেন। যদিও কামারণী তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড় ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়িমাছ পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারণী চিংড়িমাছ দিলে তো গ্রহণ করিবেন না। চিংড়িমাছ রন্ধন করিয়া কলসীকক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে শিকল দিয়া যাইতেছে, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকল খুলিয়া চিংড়িমাছ নিয়া পলাইতেছে। দেখিবামাত্র ধনী চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ও

গদাই খাস্ নে—খাস নে !" গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। ধুনী ভয়ে অভিভূত—ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণ, একথা শুনিলে আর গদাইকে তাহার নিকট আসিতে দিবে না। কিন্তু এ মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ কে করিবে। ধুনী পুত্রের সেবা করিয়া অন্তকালে পুত্রের সম্মুখে 'হরি' বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা ধুনীর চরণে শত সহস্র প্রণাম।

আমরা উপরোক্ত খেতড়ীর চামারের কথাটির শেষ কথা এখনও বলি নাই। চামার ভয় করিয়াছিল, বিবেকানন্দ স্বামীকে আহার প্রদান খেতড়ীর রাজা শুনিলে তাহার সর্বনাশ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ চামারের সে ভয়ের কথা জানিয়াও খেতড়ীর রাজার নিকট ঐ চামারের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। কাজেই কয়েকদিন পরেই খেতড়ীর রাজার নিকট চামারের ডাক পড়িল। চামার কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। কিন্তু রাজপ্রসাদ লাভে চামারকে আর চামারের বৃত্তি করিতে হইল না। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দান বিফল হয় না। চামার নিষ্কাম ছিল। কিন্তু কামনা [না] করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দানে এক গুণে শতগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই চামার বিবেকানন্দ সংবাদ।

আমরা নারায়ণজ্ঞানে নরসেবার উল্লেখ করিতেছিলাম—যে সেবার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গ্রহণ করিয়া আশ্রমের যুবকবৃন্দ সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা অত্যাশ্চর্য সেবা দেখিয়া যতই প্রশংসা করি, কিন্তু তাহারা যে, দ্রুতপদে মুক্তির নিকট অগ্রসর হইতেছেন এ কথা উপলব্ধি করা আমাদের কঠিন হয়। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই বলি—'হ্যা, খুব উচ্চ কার্য করিতেছে বটে, কিন্তু যুবাবয়সে ঐরূপ একটা ঝোকে কার্য করিতেছে আর কি। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, বাপ মাকে ত্যাগ করিয়া, যে, অধঃপাতে যায় নাই, ইহাই প্রশংসার বিষয়। ঐরূপে যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা যে তাহারা অতি যত্নসহকারে সমাধা করে, একথা শত্রুর মুখেও নিঃসৃত হয়। কিন্তু ভ্রমবশত বুঝিতে বিলম্ব হয় যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎকার্য এইসকল বালকের দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শী বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। 'সেবাশ্রম' ভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে জাতিই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এইসকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতর বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক হইয়া ভাবিবেন ইহারা কারা ? ইহারা কোন ধর্মা-

বলম্বী ? যে ধর্মাবলম্বীই হোক—আর যাহারা সেবা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মতে ইঁহাদের ধর্ম ভ্রান্তধর্মই হোক—কিন্তু এ বালকেরা যে, তাঁহাদের ধর্মের সারমর্ম গ্রহণ করিয়াছে—এ কথা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কেননা, তাঁহাদের মতেও তো নরসেবা প্রধান ধর্ম। প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেমদৃষ্টে প্রেমলাভ হয়। এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেমদৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইয়া নিশ্চয় তাহার জাতিগত ধর্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে। সেবাগ্রহীতা সুস্থশরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশয় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজমধ্যে প্রচার করিবেন এবং তাঁহা সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন, তাঁহাদেরও বিদ্বেষভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষ শূন্যতাই একতার মূল। এইসকল যুবক যদিচ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তথাচ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ফলে যে-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চচেতা ব্যক্তিগণ প্রাণপণ করিতেছেন, [সেই] বক্তৃতা, সভা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যাহা না হয়, যুবাগণের সেবায় তাহা হইতেছে, একতাস্থাপনের বিঘ্নবাধা সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যালাভের ফল, বিদ্যালাভের কার্য—এই সেবাকার্যে যে দেদীপ্যমান—ইহা স্থূলদৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা আবার দেখিতে পাইবেন যে, এই যুবকেরা সর্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করিতেছেন, যে জ্ঞানলাভে আর ঈশ্বরলাভে প্রভেদ নাই। এই বিশ্বপ্রেম লাভে সক্ষম হইলে পর, প্রতি ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রেমিক করিবে। প্রেমজননী ভারতে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং সেই প্রেমে জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে তীর্থজ্ঞানে ভারতের ধূলি মস্তকে ধারণ করিবে। দূরে আমেরিকায় সেই তীর্থজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে, ইংলণ্ডেও সেই তীর্থজ্ঞান উপ্ত, ভারতের সকল স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশন সেই তীর্থজ্ঞান বপন করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। যথায় যথায় রামকৃষ্ণ মিশন—সেইখানেই প্রকাশ যে, ভারত পুণ্যভূমি। পুণ্যভূমি কাশীধামের সেবাশ্রমের যুবকেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতেছে—'দেখিয়া যাও—ভারত পুণ্যভূমি।'

উল্লেখ করিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ণীত দুই পন্থারই চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবাপন্থায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ এই যুবকবৃন্দকে দেখাইবার চেষ্টা পাইলাম। আবার অপরদিকে অদ্বৈতাশ্রম দেখুন। স্বামীজী শ্রীগুরুর নিকট নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়া কিরূপ ধ্যান-পন্থার পথিক-সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতাশ্রমে লক্ষ্য হইবে। ঐ যে অদ্বৈতাশ্রমে বালক সন্ন্যাসীগণ [কে] দেখেন উঁহাদের ক্রিয়াকলাপ, আত্মত্যাগ—সেবাশ্রমের বিবেকানন্দের শিষ্যগণ অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নয়। বিষয়মমতা-বর্জিত হইয়া, প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কঠোর তিতিক্ষায় আত্মোন্নতি সাধনে উঁহারা নিযুক্ত। সন্ন্যাস-

অভিমান নাই, পবিত্র বস্ত্র দেবসেবার উপযোগী, এই জন্য শুভ্র কবস্ত্র ধারণ, সন্ন্যাসীর বেশে নীচ চিন্তা দমন হয় এবং নীচ-চিন্তায় আত্মগ্লানি জন্মে, এইজন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া কমণ্ডলু ধারণ। পরীক্ষা ব্যতীত বস্তু চেনা কঠিন, পরীক্ষা করিলে অদ্বৈতাশ্রমের বালকবৃন্দকে কতক চেনা যায়। এ বালকগণ সংসারত্যাগী, কিন্তু সংসার-কর্তব্যত্যাগী নহে। অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কিরূপ অতিথি সৎকার করেন, বুঝিতে পারা যায়। গৃহীর যেরূপ অতিথির প্রতি কর্তব্য—এই বালকেরাও সেরূপ কর্তব্যকার্য প্রদর্শন করেন। অতিথিকে স্থানদান, পরিচর্যা—আত্মবঞ্চনা করিয়া [এই সন্ন্যাসী] ভিখারীদিগের যতদূর সাধ্য অতিথির তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য [ইঁহারা] করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, ইঁহারাও এখানে তাঁহাদিগকে আনতমস্তকে সেই সম্মান প্রদর্শন করেন। এদিকে কঠোর তপস্বী—বিরামহীন তপস্যা, দেবসেবা একমাত্র কার্য ধ্যান জপ সমস্তই দেবতার অর্পিত, দৈহিক ক্লেশ, রোগযাতনা, এমনকি নিজ নিজ দেহে পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এবং অটল অচল থাকিয়া কোনো অবস্থাতে ইঁহারা কাতর নহেন। ইঁহাদের উপাসনা—উপাসনার নিমিত্ত কোনও আর্থিক অবস্থার অপেক্ষা নাই। প্রতিষ্ঠালাভে ইঁহাদের তীব্র ঘৃণা। পরমলাভ ঈশ্বরলাভই লক্ষ্য এবং সকল কার্যই সেই লক্ষ্যের অন্তর্গত। অনেকেই ইঁহাদের প্রতি উপহাসদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনেকে বলেন—ইদানীং সন্ন্যাসী হওয়া একটা ঢং। দূর হইতে বলিতে পারেন কিন্তু অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া একথা বলিতে আসিলে তাঁহাদের জিহ্বা জড় হইবে। দেব কার্যে যে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে একথা আমাদের অনেকেই সম্ভবপর বিবেচনা করেন না, [কিন্তু] কঠোর তপস্যার কথা যাঁহারা শাস্ত্রে পড়িয়াছেন অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্বৈতাশ্রমের বালকেরা কঠোর তপস্বী। যে কঠোর তপস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সেই কঠোর তপস্যায় এই বালকবৃন্দ নিযুক্ত। শরীর মন, প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে অর্পিত। ইঁহাদিগের কার্য সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেবাশ্রমের যুবাগণ প্রশংসাপ্রার্থী না হইয়াও প্রশংসা পান, কিন্তু এ বালকগণ কেবল উপহাসভাজন। তাহারা কাপড় পরে—তাহাতেও উপহাস, তাহারা শীতবস্ত্র গায়ে দেয়—তাহাতেও উপহাস, শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য নিন্দা, গৃহ ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য নিন্দা, পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য ক্রোধ। তাহাদের আদর্শে অন্যান্য বালকগণ খারাপ হইবে—এইজন্য ক্রোধ। এ সমস্তই তাহারা সহ্য করে। কেহ বলিতে পারেন "হইতে পারে, তুমি ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা সংসারের কি উপকার হইল ?" কিন্তু ভাবুক বুঝিবেন, ভারতবর্ষের অবনতির

কারণ—ধর্মের অবনতি। কপট ব্যক্তির কপটাচারে ধর্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে আত্ম সুখার্জনই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে কার্যফলে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকে না, সেই কার্যই প্রকৃত কার্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয় দেন তিনিও—যাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন। যখন দেখিবেন, এই যুবাবৃন্দ ধর্মপথে অগ্রসর হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেখিবেন, আনন্দময়ের আশ্রয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, এখন রোগ শোক তাড়না ও চতুর্দিকে মারীভয়ে বিচলিত হইয়া আভাস পাইবেন যে, যাহার জন্য আজীবন বিব্রত ছিলাম, তাহাতে কেবল চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়াছি, সম্মুখে মৃত্যুচ্ছায়া দেখিয়া যখন বিকল হইবেন, তখন বুঝিবেন—এ বালকেরা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। তখন বুঝিবেন, হৃদয়ে শান্তিলাভের একমাত্র উপায় ধর্ম। রোগ শোক মৃত্যুসঙ্কুল ধরায় স্থির থাকিবার অপর উপায় নাই। এই বালকগণের দৃষ্টান্তে বুঝিবেন ধর্ম ভাবনার ধর্ম হৃদয়ের বস্তু,—অর্জন কর, যায় এবং অর্জন কর অর্জন। তখন ভারতে ধীরে ধীরে ধর্মের পূর্ব মাহাত্ম্য ভারতবাসীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহারা সকলে বুঝিতে পারিবে—ধর্মেই ভারতের উন্নতি ধর্মের ভারতে প্রাধান্য ধর্মই ভারতের জীবন।

সাধারণ ব্যক্তির মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে ভারতের ধর্মজীবন হইয়াই তো ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। ধর্মজীবন হওয়ায় ভারতের বিজ্ঞান নাই, শিল্প নাই, ভারত হীনতেজা ও পরাধীন। এরূপ যাহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম কি, জানেন না। ভারতের যে সকল পূর্বকীর্তি তাহারা লুপ্ত হয়, পাশ্চাত্ত্যের যে সকল বৈজ্ঞানিক কার্য দেখিয়া তাহারা স্পর্ধা করিয়া বলেন, 'ভারতের এ সকল ছিল'—জানিবেন, সেইসকল কীর্তি ভারতের ধর্মবলে। যাহা জাতীয় জীবন, তদবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতিসাধন হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অর্থোপার্জন এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি ভারতের ধর্মও সেইরূপ। ধর্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতের উন্নতি প্রত্যাশা বিফল, ধর্মপ্রাণ ভারতের ধর্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না। আমরা যথার্থ ধর্মপ্রাণ হইলে আজই দেখিতে পাইব, ভারতও পূর্বের ন্যায় সর্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব প্রতিশ্রুত দ্বিবিধ পন্থার উল্লেখ করিয়া দ্বিবিধ ফললাভ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে স্বামী বিবেকানন্দ উভয় সাধনেই সিদ্ধ। কিন্তু উভয় সাধনার ফল যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সকলের চক্ষে পড়ে নাই।

আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত বিদেশে যাইয়া কলকজা শিক্ষা করা উচিত—আমাদের নেতারা বলেন। কেহ বা বলেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উন্নত হও, বিজ্ঞানই

জাতীয় উন্নতিসাধন করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনই কাহারও মতে উন্নতির নির্দিষ্ট পথ। কিন্তু এইসকল নেতারা যদি এ কথাটি বিবেচনা করেন যে, কে ঐ সকল আমাদিগকে শিখাইবে আর কেনই বা শিখাইবে? বিনা স্বার্থে কেহ কোনও কাজ করিয়া থাকে কি? আমরা ঐ সকল শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হইব, এইজন্যই কি তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে? ইহা কদাচ হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য জাতিসকলের মধ্যে পরস্পরে নানা বিষয়ে আদান-প্রদান চলে এইজন্য পাশ্চাত্ত্য জাতিরা পরস্পর পরস্পরের সহকারী। আমরা ঐ উন্নত জাতিসকলের সহিত কী আদান-প্রদান করিব? সকলই তো গিয়াছে। এক বস্তু আছে—ধর্ম। অবশ্য এ বেদমূলক ধর্মের তুলনা নাই। কিন্তু সেই ধর্মও তো এ সময় অতি ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ধর্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয়না সত্য এবং ভারতবাসী-প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্মোন্নতি করিয়া যদি অপর জাতিসকলের সহিত আবার আদান প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই আনতমস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারিক বিদ্যা গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্যলাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। 'সাম্য সাম্য' এই কথা সকলের মুখে শুনি। বাস্তবিক সমস্ত মানব এক পরিবারস্বরূপ বাস করে—এইরূপ উন্নত অবস্থালাভ মনুষ্যসমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায় পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাবৃদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন, দার্শনিক শিক্ষার দ্বারাই মানব একপরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন তো নানাবিধ—কোন্ দর্শনবলে [মানুষ] একপরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনো দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্বস্থাপন কোনো দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তা হলেই জগতে সাম্যপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ না। সে সাম্য স্থাপক দর্শন—বেদান্তদর্শন। কিন্তু বেদান্তদর্শন কেবলমাত্র পাঠে তাহা হয়না, বেদান্ত দর্শন উপলব্ধি করিতে হয়। যেমন আমি আমাকে জানি, সেইরূপ তুমি আমি অভেদ ইহা জানিতে হয়। পড়া বা শোনা কথায় উপলব্ধি হয় না। ঐ উপলব্ধি সাধনসাপেক্ষ এবং ঐ সাধন সম্পন্ন করিবার জন্যই এই অদ্বৈত সেবাশ্রম। যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আশ্রম দ্বয়কে ঐ জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, এসো ভাই, সকলে মিলিত হইয়া বলি, 'জয় রামকৃষ্ণের জয়। জয় বিবেকানন্দের জয়।'*

[* উদ্বোধন বৈশাখ ১৩১৮। প্রবন্ধটি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ৯ই জানুয়ারি ১৯২ তারিখে পঠিত হয়।]

বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাহার ধন ছিল না, যশ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁহার নাই। তাঁহার সম্পত্তি—প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা ভরসা ছিল, সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত নানা জনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখো, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও, পরকার্য-মহাব্রতে পশ্চাৎপদ হইও না'—বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচারকার্য—ভারতমাতার কার্য—দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য, যে কার্যসাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁহার সেই মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য সমালোচনা [অর্থাৎ সম্যক্ আলোচনা] করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন 'প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলে, জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে।' তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন,—ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু। ফরাসীজীবনের কেন্দ্র—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না, নগর ভস্মসাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নরহত্যা করিবে। যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা

পুন প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ জ ব। লা ভালাভ হিসাবে উপর স্থাপি—, তাহাদের যাহা যাহা করিতে ব লা- করিবে, কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে সাজনম্মান দিতে হোহাব, সম্পূর্ণ উৎসাহি—, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দক ি ব া ি া পাবি াকাশ পাপাইবে একেবারে দিগ বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হই ব। এই দি িক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম। হিন্দুকে অবাশে, মাথো, আবামতা করো, কিছুই বিরুক্তি করিবে না কিন্তু তার ধর্মের উপরে একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনোরূপেই সহ্য করিবে না। পাঠানেরা জা ... ধর্ম চালনা করি ...ন, এই নিমিত্ত ... দু ক ... গাদের ইতিহাস। বারবার চালি হয় একজাতীয় পাঠানের পরিবর্তে অপর জা... পাঠান স্থাপি হইয়াছিল এব পাঠানে কোনো বংশধারা ভার সি হাসনে স্থায়ী হ নাই। মোগলে । ভা... প্রকার প্রাপ্ত ...ল, আকবর হতে ক্রমাগত সম্রাটরা কেহই ধর্ম বা ... হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহাদের সাম্রাজ্যও ঠিকভাবে চালি। কিন্তু যখন আওরঙ্গজেব হিন্দু ধ ে প্র হস্তক্ষেপ করিলেন অমনি মোগলসাম্রাজ্য ছন্নছত্র হ য়া গেল। কা ট্রিজ কাটা ধর্মনষ্টের আশঙ্কা সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজরাজ্য টলটলায়মান হ ... । ধ ... হিন্দু জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। যদি হিন্দুর জা ... জীবন রক্ষা করিতে হ । বিবেকানন্দের মতে ... ধর্মের দ্বারাই হইবে। এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে [ ] ... জীব ধর্মে উপর স্থাপি—, হিন্দুর ... ধর্মনাশ হ ... , তবে একপ ... বস্থা কেন ? তাহার উত্তর, সনাতন ধর্ম একেবারেই লুপ্ত হইবার ... স্বার্থচালিত ধর্মধ্বজা ... তাহাদের স্বার্থ পোষণে ক... সংকল্প হইয়া হিন্দুর ... ধর্ম ... ছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। বিবেকানন্দ বলেন— অর্জুনে প্রতি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্মযাজকের ব্যাখ্যায় সেই গীতার স্বরূপ অর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার মতানুসারে এক্ষণে দেখা যায় খ্রীশ্চান ধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্যপ্রদেশ চালি—।' বিবেকানন্দ বলেন "খ্রীশ্চান ধর্মের উদ্দেশ্য যীশু বলিয়া গিয়াছেন যদি তোমার এক গালে আঘাত করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দাও, যীশু আসিতে-ছেন সকলে পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।' গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 'বীর বীর্য প্রকাশপূর্বক পৃথিবী ভোগ কর, বীর বীর্য প্রকাশে চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। দেখা যাইতেছে—গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভারতবাসী পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া বসিয়া আছে" কেহ বলিতে পারেন, 'সাংসারিক কার্যে ব্রতী হওয়াতো সন্ন্যাসধর্মের বিরুদ্ধ।' বিবেকানন্দ বলেন, "সন্ন্যাসধর্ম সকলের নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাসধর্ম নির্দেশ করায় অনেক

ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে।' যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কায নির্দেশ করিয়াছেন —তাহাদের কার্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেন, "দেশে দেশে, গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো। যাহাতে জনে জনে স্বধর্মপালনে সক্ষম হয় সেরূপ উপদেশ দাও। গৃহীকে গার্হস্থ্যধর্ম শিক্ষা দাও।" উপস্থিত হিন্দুধর্মের প্রধান মালিন্য এই যে তমোগুণকে আমরা সত্ত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চশক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি তথাপি তাহাকে দণ্ডপ্রদান করিলাম না ইহার নাম ক্ষমা কিন্তু বলবান ব্যক্তির হাতে খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না বাড়ি আসিয়া বলিলাম, ক্ষমা করিয়াছি—ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব এক সময়ে অর্জুনের উপর প্রাধান্যবিস্তার করিয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাপ্রসঙ্গে অর্জুনের জড়ত্ব দূর হইল ও তিনি সতেজে গাণ্ডীব ধারণ করেন। আমরা এখন জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি যে যার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন জাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে তাহা দেখিবার অবকাশ নাই। ধর্মসংস্কার কুপ্রথামতে ভ্রমণ করিলে জাত যাইবে [ভাবিয়া] আমরা ঘরের ভিতরেই বসিয়া থাকিব, কিছু দেখিব না শুনিব না, [কেবল] মুখে এক একবার টিকি নাড়িয়া বলিব—জড়ত্বের এই লক্ষণ।

জাপান ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপানীরা সকল সভ্যজাতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জাপানী স্বত্ব বজায় রাখিয়াছে, ইংরাজের [নিকট] যে-সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্বক মর্মগ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন আমরাও সেরূপ জ্ঞানগ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ—যে বাজিরকমে চলে আমরা নিজ দুরকমে চলিব। যেখানে যা ভালো পাইব—লইব কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, হিন্দুর স্বাতন্ত্র্যটা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতিসাধন হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক ধর্মাবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নি উপাসক পার্শী প্রভৃতি নানা জাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে—ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটি চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন 'নরসেবা তোমার একমাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম। মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই

মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নরসেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানব দেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্মে পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেইসকল আশ্রম দেখিলে এই যে সংশয়—[তাহা] আর কাহারো মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম—এই সেবাধর্ম অবলম্বনই—ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে। যিনি সেবাধর্ম গ্রহণ করিবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য—ব্রহ্ম তাহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। আপত্তি হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা। কঠিন পন্থাই বটে, সেই কারণে বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল তাঁহারা মনুষ্য তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্যভার গ্রহণে সক্ষম। তিনি বারবার বলিয়াছেন— 'বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো—তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো—তোমরা অপরিসীম কার্যক্ষম, বিশ্বাস করো—ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো—ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো—জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও—পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতিসাধন করিতে পারিবে। বিশ্বাস করো—তোমাদের সার্থক জন্ম, বিশ্বাস করো—[তোমরা] কখনই নিষ্ফল হইবে না, তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কৃতী।' কাহাকেও ঘৃণা করিও না, ভগবান রামকৃষ্ণের মানা—বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো—কল্পিত নৈতিক ধর্মে আবদ্ধ থাকিও না, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্বক উৎসাহিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসারত্যাগ নয়, দশকর্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করো। বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে আসিয়াছ, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা—সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝো, গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেশে-দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট

স্থাপন করিয়া—সেই মহানুভবের স্মৃতিস্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে-জনে তাঁহার স্মৃতিস্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নি স্ব—আরও ভালো, [কেননা] তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম। মনুষ্যত্ব লাভ করো, তোমরা মনুষ্য—এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো, ভগবান রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্বাদ করিবেন ও কার্যশীল বিবেকানন্দ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। "বিশ্বাস করো—বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই বিশ্বাস দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।*

[উদ্বোধন ১মাঘ ১৩১১। প্রবন্ধটি বেলুড় মঠে ২ জানুয়ারি ১৯ ৭ তারিখে পঠিত হয়।]

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য

আমরা নাচের কথা কহিতেছি। নাচ যদি মাধুরীময়ী না হয়, তাহা হইলে নাচই নয়। উচ্চ শিল্পসকলেরই চরমস্থানে গতি। গান কবিত্ব যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছে, নৃত্যেরও সেই লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথা বলিব।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহা গৌরাঙ্গদ্বেষী, শ্লেষসূচক শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ কঠোর সন্ন্যাসী, ভাবের ধার ধারেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই, [ঐ] তিতিক্ষাশীল সন্ন্যাসী উপনিষৎ পড়িতেছিলেন, 'সকলই মায়া' এই স্থির ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য উপনিষৎ লইয়া শুষ্ক তর্কে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, বিশ্বত্যাগী বিশ্বেশ্বরের আবাসভূমি কাশীধামে বসিয়া 'সোঽহং' তত্ত্বে নিবিষ্ট, [আর তাঁহার] সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ তরঙ্গে শত শত চন্দ্র ঠিক্‌রিয়া চতুর্দিকে ছুটিতেছে, চন্দ্র ঠিক্‌রিতেছে, পুন পুন চন্দ্র ঠিক্‌রিতেছে। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ সঞ্চালনে কোটি চন্দ্র কোটি কোটি জগৎ ব্যাপিতেছে। শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎ পাঠে রত, পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন, আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন, পাঠ করিতেছেন না, নৃত্য দেখিতেছেন। গৌরচন্দ্রের নৃত্য। গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন—গান নাই, কথা নাই, ভাবাবেশে, সন্ন্যাসীবেশে, গৌর নাচিতেছেন। সন্ন্যাসী দেখিতেছেন। তাঁহার উপায় নাই, দেখিতেছেন। সৌন্দর্যে প্রাণ মন সাগরজলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত, উপায় নাই, কেবলই দেখিতেছেন। অজ্ঞাত-ভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। বীর সন্ন্যাসী এইবার অতি চঞ্চল। চাঞ্চল্য

নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না, সন্ন্যাসী ছুটিলেন, প্রাণপণে ছুটিলেন, গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন, কে জানে কেন! নৃত্যের প্রভাব এই, নৃত্য পরমানন্দদায়ক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা একথা প্রত্যয় করিতাম না, কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে গৌরাঙ্গের নৃত্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য—আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নৃত্য দেখিয়াছি। "নদে টলমল টলমল করে, মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন। যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন—আমরা দর্শন করিয়াছি [বলিয়া] আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করি—যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা। কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্ত টলটলায়মানা। যে সে নাচ দেখিয়াছে তৎসময়ে [illegible] নিঃস্বার্থে তাহার প্রাণ প্লাবিত হইয়াছে, সন্দেহ [illegible]। নাচের এ দুরূহ শক্তি সে [illegible] উপলব্ধি করি [illegible] ন উচ্চ আশা রাখে [illegible] তাঁহাকে সৌন্দর্য উপাসনা ক [illegible] করিবে নিশ্চয়। [illegible] রঙ্গালয়ে [illegible] বেশ্যার যদি [illegible] ভাবের সৌন্দর্য থাকে [illegible] উপেক্ষা [illegible] পারিবে না। আত্মদমনে উপেক্ষা নাই, সৌন্দর্যে যি[illegible] আকৃষ্ট, তাহার ক্রম লাভ হয় না।*

[*এই লেখাটি গিরিশচন্দ্রের [illegible] নাই। [illegible] বর্তমান [illegible] সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

বিনোদিনীকে ঠাকুরের আশীর্বাদ

যাহারা থিয়েটারে চৈতন্যলীলার নাম শুনিয়াছেন [illegible] বিনোদিনীর নাম জানেন। চৈতন্যলীলা যে কেবলমাত্র নাট্যামোদীরা জানেন, এরূপ নয়, একটি বিশেষ কারণে চৈতন্যলীলা অনেক সাধুসন্তের নিকটে পরিচিত। পতিতপাবন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রঙ্গালয়ের পতিতগণকে তাঁহার [illegible]ক্তিপ্রদ পদধূলি প্রদানার্থ চৈতন্যলীলা দর্শনচ্ছলে পদার্পণে রঙ্গালয়কে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যলীলায় বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহু পূর্বে আমি বিনোদিনীকে বলিয়াছিলাম যে, যদি তোমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করো এবং সেইসকল ঘটনা আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের পথ মার্জিত করিতে পারো, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে। এই কথার উল্লেখ করিয়া,

একরকম আমার উপর দাবি রাখিয়া, বিনোদিনী তাহার জীবন-আখ্যায়িকার একটি ভূমিকা লিখিতে বলে। আমি নানা কারণে ইতস্তত করিলাম। বিনোদিনীও ছাড়িবে না। কিন্তু সহসা আমার মনে উদয় হইল যে, এই সামান্যা বনিতার ক্ষুদ্র জীবনে যে মহান শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে। লোকে পরস্পর বলাবলি করে—এ হীন, ও ঘৃণিত, কিন্তু পতিতপাবন ঘৃণা না করিয়া পতিতকে শ্রীচরণে স্থান দেন। বিনোদিনীর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে। সেই চরণ মাহাত্ম্য যাঁহার হৃদয়ে আংশিক স্পর্শ করিয়াছে তিনিই বিভোর হইয়া ভাবিবেন যে, ভগবান অতি হীন অবস্থাগত ব্যক্তিরও সঙ্গে থাকিয়া সুযোগপ্রাপ্তি মাত্রেই তাহাকে আশ্রয় দেন। এরূপ পাপীতাপী সংসারে কেহই নাই, যাহাকে দয়াময় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনী যদি সমাজকে এ শিক্ষা প্রদান করে তাহা হইলে বিনোদিনীর জীবনী বিফল নয়। [illegible] জীবনী পাঠে [illegible] দম্ভ [illegible], [illegible] অভিমানী [illegible] ভাব গ্রহণ করিবে এবং পাপী [illegible]।

বলা হইয়াছে, [illegible] বিনোদিনী সাধারণে প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যলীলায় চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর [illegible] ভাবুক। [illegible] বিনোদিনী। প্রথমে বালগৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকে [illegible] চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নে [illegible] প্রেম [illegible] বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্তির ব্যাখ্যা 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর'—পুরুষ প্রকৃতি একাঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ প্রকৃতি ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই—বলিয়া সংজ্ঞাহারা হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে যিনি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, পদধূলি-লাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিতমণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেইজন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—'চৈতন্য হোক।' অনেক পর্বতগহ্বরবাসী এ আশীর্বাদের

প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই সাধনাই—অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইলে—অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন—যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইযাছিল। যে-ব্যক্তি যে অবস্থাই হোক, এই মহাছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যান প্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিযাছিল।

[* বিনোদিনীর আত্মজীবনী— আমার কথা' ও অন্যান্য রচনা র ভূমিকা লেখেন গিরিশচন্দ্র বঙ্গ রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী নামে। তারই প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উৎকলিত। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সন্নিধানে অভিনেত্রী ও বাঈজি

যাহারা সামান্য বনিতাকে অভিনযকার্যে নিযুক্ত করা অনিবার্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অভিনেত্রীগণের দোষ দেখাইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদিগকে তিরস্কৃত করেন। মোটের মাথায তাহাদের কথা এই যে অভিনেত্রীরা অভিনযকালে হাবভাব প্রদর্শন ও দর্শকের প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপে তাহাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পান। ব্যক্তিগত অভিনেত্রীর দোষ অধ্যক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে কখনো কখনও হইয়া থাকে, ইহা আমরা স্বীকার পাই। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীর যে সে দোষ নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

রঙ্গালয়েও যাঁহারা তত্র অনুসন্ধানে রমণীর কুটিল কটাক্ষ দেখেন, তাহাদেরও আমরা একথা বলি যে, কুটিল কটাক্ষ দেখিতে হইলে রাস্তাঘাটে যথা তথা দেখিতে পাইবেন, তন্নিমিত্ত টিকিট কিনিয়া অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এইসকল রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদিগকে দেখিয়া 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া প্রণাম করিতেন এবং কোনো এক ভাগ্যবতীর বুকে হস্ত দিয়া বলিযাছিলেন, 'মা, তোমার চৈতন্য হোক'। কোনো নাট্যাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস চাওযায, তিনি তাহাকে রঙ্গালয়ের কার্য করিতে আদেশ দেন এবং উৎসাহপ্রদানে বলেন, তুমি যে কার্য করিতেছ, তাহাতে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল।

[শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—] একজন বেশ্যার বাটীর সম্মুখে একজন সাধুর আস্তানা ছিল। রজনীযোগে বেশ্যার কয়জন উপপতি আসিত, তাহা তিনি ঢিল রাখিয়া গণনা

করিতেন আর ভাবিতেন, "কুৎসিতা এক উপপতিকে ঘরে স্থান দিলা!" এদিকে বেশ্যা অনুতপ্তহৃদয়ে চিন্তা করিত—"আমারই বাড়ির সম্মুখে সাধু দেবসেবায় নিযুক্ত, আর আমি এই কদর্য কার্যে দেহ অর্পণ করিতেছি।" উভয়ের একসঙ্গে মৃত্যু হইল। সাধুর দেহ চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইল, আর বেশ্যার দেহ শৃগাল-কুকুরে খাইল। কিন্তু যমদূত সাধুর আত্মাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল, আর বেশ্যার আত্মা বিষ্ণুদূতের দিব্য বিমানে যত্নে স্থাপিত হইয়া বিষ্ণুলোকে চলিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিল, "একি অত্যাচার!' যমদূত উত্তর দিল, 'ধর্মরাজের নিরপেক্ষ চক্ষে বেশ্যার উপপতি গণনায় তোমার বেশ্যাবৃত্তি করা হইয়াছে, অতএব নরকে তোমার স্থান। আর উপপতি সঙ্গেও বারাঙ্গনা ভাবিত, তুমি ঈশ্বর উপাসনা করিতেছ, ঘৃণিত কার্য করিয়াও বেশ্যার ভাবগ্রাহী জনার্দনের সেবা করা হইয়াছে, সেই নিমিত্ত সে বিষ্ণুলোকে গেল। স্থূল দৃষ্টিতে তোমার সাধুর শরীর ছিল, সে শরীর চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইয়াছে, বেশ্যার অপবিত্র শরীর কুকুর শৃগালে খাইয়াছে। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায় কার্য হয় নাই।

আমরা এই নিমিত্ত বলি যে, রঙ্গালয়ে আসিয়া যিনি রাম, সীতা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি দেখিবার সাধ করেন, তাহা তিনি পাইবেন। কিন্তু যাঁহার কুটিল কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি, তাঁহার হৃদয় সেই কুটিলার ন্যায় হইবে। সমস্তই ভাব জগৎ, ভাব মাত্র। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যেমনি ভাব তেমনি লাভ।'

উপসংহারে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ করিব। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ খেতড়ীর রাজার সভায় উপস্থিত হন। কালোয়াতি সঙ্গীত অন্তে একজন 'বাঈ' রাজসভায় গান করিতে আসে। বিবেকানন্দ স্ত্রীলোকের গান শুনিতেন না, বিশেষ ঐরূপ স্ত্রীলোকের গান। রাজা মিনতি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, অনুরোধ করিলেন, 'একখানি গান শুনিয়া যান।' বাঈজি গান ধরিল

প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধরো।
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার ॥
এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়।
এক রহো ঘর ব্যাধক পরো ॥
পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়।
দুঁহু কাঞ্চন করো ॥'

(দ্বিতীয় কলিটি আমাদের স্মরণ নাই)

সমস্ত গানটির ভাব এই যে, হে প্রভু! তুমি সমদর্শী, নিগুণ ও ভগবানকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাক—যেরূপ পরশমণি, দ্বিধা না করিয়া ব্যাধগৃহে লৌহ ও পূজাগৃহে

লৌহ, স্পর্শমাত্র সোনা করিয়া দেয়। নদীর নির্মল বারি বা মলা ধৌত নালার জল—গঙ্গাদেবী সমভাবে গ্রহণ করিয়া লন, আর দুই জলই গঙ্গাজল হইয়া যায়।

তান লয় গঠিত, ভাবপূর্ণ সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীত শ্রবণে বিবেকানন্দের চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ধিক আমার সন্ন্যাস অভিমানে! এখনও 'এ ঘৃণিত,' 'এ মান্য'—আমার বোধ আছে।' তদবধি সেই বাঈকে বিবেকানন্দ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতড়ীতে যাইতেন, খেতড়ীর রাজাকে অনুরোধ করিতেন—"আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" 'বাঈ' পরম শ্রদ্ধার সহিত গান শুনাইত, বিবেকানন্দ মুগ্ধ হইতেন।

[* এই লেখাটি 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (৭ চৈত্র ১৩[illegible]৭) প্রকাশিত অভিনেত্রী সমালোচনা নামক রচনার অংশ। বর্তমান শিরোনাম সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-চূড়ামণি রামচন্দ্র দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক রামচন্দ্র দত্তের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। তাঁহার ভক্ত জীবন কিরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাহাও রামচন্দ্রের ভক্তের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে তত্ত্ব মঞ্জরীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিয়ৎপরিমাণে বলিলাম, তাহার কারণ এই, যিনি যতই লিখুন, ভক্তের প্রভুর সহিত সম্যক আন্তরিক সম্বন্ধ কেহই প্রচার করিতে সক্ষম নয়। ভক্তের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে ভক্তিরত্ন গোপনে রক্ষিত থাকে, তাহার বর্ণনা সেই ভক্তই করিতে সক্ষম। কারণ, সে হৃদয়ভাব বর্ণনার উপযোগী অদ্যাবধি কোনো ভাষা হয় নাই। সে ছবি ভক্তের হৃদয়ে থাকে, মুগ্ধচিত্তে কেবল ভক্তই তাহা দেখেন, আর কাহারও সে স্থলে প্রবেশ অধিকার নাই। সে প্রভুর মন্দিরে প্রভুই বিরাজ করেন। সেই মন্দিরে ভক্তের সহিত প্রভুর অনন্ত লীলা। আমি কেবল, আমি যে ভাবে রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

রামচন্দ্রের সিমলার বাটীতে রামচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিন তেজচন্দ্র মিত্র নামে একজন ভক্ত স্টার থিয়েটারে (স্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে) একটু চিরকুট লিখিয়া যান যে, সিমলা মধুরায়ের গলিস্থিত রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে প্রভু উদয় হইবেন। ভক্ত আমার বিনা অনুরোধে সেই চিরকুট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছি, ঐ ভক্ত পরমহংসদেবের আদেশে চিরকুট লিখিয়া গিয়াছিলেন। থিয়েটারে গিয়া তাহা পাঠমাত্রেই আমি আকর্ষিত হইলাম। ধীরে ধীরে চলিলাম,

প্রতি পদবিক্ষেপে ভাবিতে লাগিলাম, বিনা আহ্বানে কেন যাইব। দাঁড়াই, ফিরিব মনে করি, কিন্তু চলিলাম। এমন কি রামচন্দ্রের বাটীতে গলিতে আসিয়াও ইতস্তত করিলাম। অবশেষে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রামচন্দ্র তখন তাঁহার বাটীর দ্বারদেশে ছিলেন। বোধ হয় আমায় চিনিতেন, আমাকে দেখিবামাত্র আমায় পরম যত্নে আহ্বান করিলেন এবং সামাজিক শিষ্টাচার না করিয়া প্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। অতিশয় আগ্রহ যেন তাঁহার মনে ভয় হইতে লাগিল, হয়তো এটা কি খেয়ালে আসিয়া পড়িয়াছে স্বর্গের দ্বারে আসিয়া আবার পাছে ফেরে। রামচন্দ্র বিশেষ যত্নে প্রভুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে প্রভু দুইবার থিয়েটারে আসিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট পরিচিত ছিলাম বটে, কিন্তু পতিতপাবন যে আমায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার আশ্বাসবাক্য পাইয়া ফিরিলাম।

প্রভু যেখানে যাইতেন রামচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু যখন থিয়েটারে আসিয়াছিলেন প্রভুর নিমন্ত্রণ রামচন্দ্র ভোগ পাঠান, তথাপি স্বয়ং আসেন নাই। থিয়েটার তিনি কলুষ ভূমি জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বাটীতে আমার প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া, তিনি তাঁহার বন্ধু রামকৃষ্ণাশ্রিত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে হায়। আমি কি নির্বোধ যে, প্রভু যে স্থলে পদার্পণ করিয়াছেন যেখানে পতিতকে কৃপা করিতে উদয় হইয়াছেন, সে স্থান আমি কলুষিত জ্ঞান করিলাম। প্রভুর লীলা প্রভুই জানেন দীনদয়াময় থিয়েটার দর্শনচ্ছলে দীনকে দয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি মূঢ়, কিরূপে বুঝিব। দেবেন, শীঘ্রই দেখিবে, থিয়েটারের লোক আর সামান্য থিয়েটারের লোক থাকিবে না, প্রভুর কৃপায় সকলেই আমার আবাধ্য ব্যক্তি হইবে।

ইহার পর দক্ষিণেশ্বরে রামবাবুকে দর্শন করি। অতি দীনভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চবটীতে আমায় লইয়া গেলেন। তত্ত্বমঞ্জরীর পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে রাম পরমহংসদেবকে অবতারজ্ঞান করিতেন। উপরোক্ত দেবেনবাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, আমারও ধারণা, প্রভু অবতার। আমার এই ধারণা শুনিয়া রাম বিভোর। "গিরিশ দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তদবধি আমিও "রামদাদা" বলিতাম। পঞ্চবটীতে রামদাদা গদগদকণ্ঠ, হৃদয়াবেগে কথা আটকাইয়া যাইতেছে, বলিতে লাগিলেন 'গিরিশ দাদা বুঝিয়াছ কি, এবার একে তিন—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব।' তাঁহার ভাব এই যে, একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গ অবতারে তিনাধারে তাহার বিকাশ ছিল। রামদাদা যত পারিলেন বলিতে লাগিলেন, ভাব কতক প্রকাশ পাইল, ভাবুকের ভাব কতক

অন্তরে রহিয়া গেল। রামদাদার তখন আমি এরূপ আত্মীয় হইলাম যে, আমাকে অদেয় তাঁহার কিছুই রহিল না। পুন পুন করজোড়ে কহিতে লাগিলেন—বোধহয়, আমি নিবারণ না করিলে পঞ্চবটীতে লুন্ঠিত হইতেন। আমাকে পবিত্র হইতে পবিত্র জ্ঞান করিলেন। তাঁহার পরমাত্মীয় হইলাম। নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি গানে আছে—"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে"।

আমি যেন রামদাদার প্রাণের অধিক প্রিয়তম হইলাম। সেদিন রামদাদা আনন্দে বিভোর। যেন তিনি কি অপূর্ব বস্তু পাইয়াছেন। ইহার পর সর্বদাই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইত। থিয়েটার যেন তাঁহার তীর্থস্থান হইল। থিয়েটারে না গেলে, আমার সহিত ঠাকুরের কথা না কহিলে যেন তাঁহার দিনযাপন হইত না। আমি যে কথা বলিতাম, সে কথার বিরুদ্ধে যে কোনও কথা হইতে পারে, তাহা তাহার মস্তিষ্কে স্থান পাইত না। কেহ যদি কোনো বিরুদ্ধ কথা কহিত, তিনি গর্জন করিয়া বলিতেন—"কি, গিরিশদাদার কথার উপর কথা? ঠাকুর বলিয়াছেন, ওর পাঁচসিকা পাঁচ আনা বুদ্ধি।' রামদাদা অপেক্ষা আমি যে কোনো অংশে বুদ্ধিমান বা বিবেচক, ইহা আত্মম্ভরিতা করিয়াও আমি বুঝিতে পারিতাম না। কেন না, পদে পদে আমি দেখিতে পাইতাম যে, রামদাদা অতি বিচক্ষণ। রামদাদার আর পরামর্শ কি, পরামর্শের বিষয় এক ঠাকুর। ঠাকুরকে লইয়া কি করিবেন ঠাকুরকে কিরূপে প্রচার করিবেন কিসে ঠাকুরের সেবা উত্তম হয়—দিবানিশি তাঁহার এই চিন্তাই ছিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'রাম আমায় বড় ভক্তি করে।" ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিবলে রাম অভ্রান্ত ছিলেন। প্রায় অনেকের বাড়ি মহোৎসবের আয়োজন হইলে, তাহাকে রামদাদার সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হইতে হইত। কারণ, ভক্ত পরিবৃত ঠাকুরকে লইয়া রামদাদার বাড়িতে যাতায়াত প্রবল ছিল। যাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে রামদাদার গৃহে উপস্থিত হইতেন প্রসাদ না পাওয়াইয়া রামদাদা তাঁহাকে আসিতে দিতেন না। সুতরাং মহোৎসবের আয়োজনে রামদাদার উপদেশ প্রয়োজন হইত। কিন্তু রামদাদা তাঁহার নিজ বাড়ির মহোৎসবে কি কি ভোজ্যদ্রব্য আয়োজন করিবেন, সে পরামর্শ আমার সহিতই হইত—"কি বলো গিরিশদাদা, মালপো করা যাক—জিলিপি ফরমাস দেওয়া যাক—অমুক হোক—তমুক হোক।' বলাবাহুল্য যে, তিনি যেরূপ স্থির করিতেন, তাহার একটিও পরিবর্তন করিবার শক্তি আমার ছিল না।

ভক্তের নানা ভাব, ভাবের অভাব পাষণ্ডেরও নাই। উন্মত্ততাবশত একদিন থিয়েটারে ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণামও করিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিয়া যাকে-তাকে বলেন, 'শুনেছ গা। গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালাগালি

দিয়েছে।" অনেকেই বলিতে লাগিল—"ওটা পাষণ্ড, আমরা জানি, ওর কাছেও আপনি যান? আমার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়া অনেকেই আমাকে তিরস্কার করিলেন। পরে রামদাদা উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর সমস্তই বলিলেন। রামদাদার চরিত্র এই ছিল যে, কোনও রূপে ঠাকুরকে যদি কেহ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিত, তাঁহার শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তখনই তিনি সে ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইতেন। রামদাদা কলিকাতাতেই আমার গালাগালির কথা শুনিয়াছেন, শেষে প্রণাম করিয়াছি, তাহাও শুনিয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর যখন তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন, তিনি বলিলেন, "বেশ তো করিয়াছে।" ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শোনো—শোনো, রাম কি বলে শোনো, আমার মাতৃ পিতৃ উচ্চারণ করিয়াছে, তবু বলে বেশ করিয়াছে।' রামদাদা অবিচল বলিলেন, 'হ্যাঁ গো। কালীয়নাগকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়না করিয়া বলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত বিষ উদগিরণ করো?' কালীয়নাগ বলিয়াছিল, 'ঠাকুর, তুমি আমায় বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্গিরণ কিরূপে করিব?' আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, তাই দিয়া আপনার পূজা করিয়াছে। কথা শুনিয়া প্রভুর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, তেজ পুঞ্জ বহির্গত হইতে লাগিল, তথাপি হাস্য করিয়া বলিলেন, "যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভাল?' অনেকেই বলিল, 'না।" পতিতপাবন বলিলেন, "রাম, তবে গাড়ি আনিতে বলো, চলো, তার বাড়ি যাই।" পাঠক, এই আমার রামদাদা। প্রণাম কেহ কাহাকে সহজে করিতে চায় না। কিন্তু রামবাবুর চরণে মস্তক অবনত হয় কি না হয়, পাঠক অনুমান করুন। পতিত ও পতিতপাবনকে রামদাদাই চিনিয়াছিলেন। ঠাকুর আমার বাড়িতে আসিলেন। অনেক ভক্ত সঙ্গে আসিল, রামদাদাও আনন্দে গদগদ হইয়া হাস্যমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। বিবেকানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমায়, 'ধন্য তোমার বিশ্বাস," বলিয়া আমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন। অবশ্যই তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছিল, পতিতপাবন আমায় কৃপা করিয়াছেন।

কি নিমিত্ত গালাগালি দিয়াছিলাম, জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। আমার মনে ধারণা ছিল, আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরকে সেবা করিতে পারিব না। কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহা হইলে মমতাবশত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিব। এই আমি মত্তার বেগে ধরিয়া বসিলাম, 'তুমি আমার ছেলে হও।" ঠাকুর বলিলেন, "তা কেন, তোর গুরু হব, তোর ইষ্ট হয়ে থাকবো।" তিনি ছেলে হইতে সম্মত হন না, এই আমি যা মুখে আসে—গালি পাড়ি।

রামদাদার কথা বলিতে অনেক আমার কথাই বলিয়া ফেলিতেছি, পাঠক মার্জনা করিবেন। কতক অবস্থা বুঝাইব—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কতদূর পূর্ণ

হইতেছে, তাহা পাঠক বুঝিবেন।

ঠাকুর সম্বন্ধে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী অনেকেরই রামদাদার সহিত কথোপকথন হইত, বিস্তর বাদানুবাদও হইয়া যাইত। বাদানুবাদে জয়ী হইব, এ প্রয়াস রামদাদার নাই। বাদী কিসে পরমহংসদেবের আশ্রিত হইবে, এই জন্যই রামদাদা ব্যাকুল। বাদানুবাদের পর যদি কেহ না বুঝিয়া চলিয়া যাইত, রামবাবু আক্ষেপ করিতেন, 'আহা, ঠাকুর আমায় ও-ব্যক্তিকে বুঝাইবার শক্তি দিলেন না। আহা, ও বড় অভাগা! এমন দয়াল ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইল না।' রামদাদা উচ্চকণ্ঠে তর্ক করিতেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার মনোভাব বুঝা যাইত। তিনি বাদীকে দাম্ভিক বর্বর বলিয়া গালি দিতেন না। নিজ শক্তির ত্রুটি অনুভব করিতেন ও তাহার নিমিত্ত ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা জানাইতেন। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই হইয়াছে। সেদিন পরমহংসদেব বলেন যে, "আমি আর বকিতে পারি না—রাম প্রভৃতিকে শক্তি দে মা। উহারা যা বলিবার বলিয়া আমার নিকট আনিবে, আমি স্পর্শ করিয়া দিব।" রামদাদার উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আগ্রহ দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলিত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিত, কিন্তু রামদাদার উৎসাহ দিন দিন দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইতে লাগিল।

'তত্ত্বমঞ্জরী'র পাঠক জানিয়াছেন, রামচন্দ্র বৈষ্ণব বংশে জন্ম, মৎস্য মাংসের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। বাল্যকালে পল্লী গ্রামে কোনও কুটুম্বের বাড়িতে তাহাকে মাংস খাইতে বলায়, তিনি বিনা সম্বলে একাকী সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টে কলিকাতায় ফেরেন। এ ঘটনার উল্লেখ তত্ত্বমঞ্জরীতে আছে। নাস্তিক অবস্থাতেও বংশ সংস্কারবশতঃ মাংস তিনি স্পর্শ করিতেন না। মাছ মাংস তাঁহার বহুমূত্র রোগের পথ্য ছিল, চিকিৎসক ও আত্মীয়বর্গের বহু অনুরোধে—মৎস্য খাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাংস কখনও স্পর্শ করেন নাই—এত মাংসের প্রতি বিদ্বেষ। কিন্তু একদিন থিয়েটারে আমি মাংস প্রস্তুত করি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার উপস্থিত, রামদাদাও উপস্থিত। সেই মাংস ঠাকুরকে মানসিক ভোগ দিলাম। ভোগ দিয়া বলিলাম, 'রামদাদা! এ তো প্রসাদ।' তিনি বলিলেন, 'অবশ্য যদি আমায় খাবার করিতে বল আমার মুখে দাও।' আমি বিপদগ্রস্ত হইলাম। অঙ্গুলি দ্বারা মাংস স্পর্শ করিয়া সে অঙ্গুলি তাঁহার জিহ্বায় দিলাম, রামদাদা অবিচল রহিল। কেহ যদি সে সময় দেখিত, হয় তো মনে করিত, ইনি যে মাংসে ঘৃণা বলেন, একথা মিথ্যা। ঘৃণাভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। প্রসাদ! রামদাদার ঘৃণা নাই। কাঁকুড়গাছির উদ্যান হইতে অন্নপ্রসাদ তিনি মুসলমান চালিত গাড়িতে লইয়া আসিতেন। প্রসাদ ব্যতীত কোনও অন্ন ধারণ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণ খাইলে তাঁহাকে যা দিবার একেবারে দিতে বলিতেন ও নিবেদন করিয়া আহার করিতেন। আহারে বসিবার পর আর কোনও

দ্রব্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। জগন্নাথদেবের প্রসাদে লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদেও তাহার অবিকল সেইরূপ ছিল। প্রসাদ জানিলে নীচ লোকেরও উচ্ছিষ্ট খাইতেন।

কাশীপুরের বাগানে যেদিন পরমহংসদেব কল্পতরু হন, সেদিন যাহারা রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি হইতে রামচন্দ্রের ছবি কখনও তিরোহিত হইবে না। আমার ভ্রাতা শ্রীমান অতুলকৃষ্ণ বলেন— পরমহংসদেবের কৃপা আমি তো রামবাবুর কৃপাগুণে লাভ করিয়াছি। আমি একপাশে দাড়াইয়া ছিলাম, রামবাবু হাত ধরিয়া টানিয়া আমায় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করেন। এ কথার উল্লেখ করিতে করিতে অতুলকৃষ্ণ গদগদ হন। রামবাবুর কৃপাগুণ সেদিন অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন। আমার সহিত রামবাবুর অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে, কিন্তু কখনও তর্ক হয় নাই। পূর্বে বলিয়াছি রামবাবুই আমার নিকট উপদেশ চাহিতেন, কিন্তু আমার যখন পত্নী বিয়োগ হয়, সহানুভূতিবশে অনেক ভক্তই আমার নিকট আসেন, রামবাবুও আসেন। সহানুভূতির কোনও কথা নাই কেবল বলিলেন, 'গিরিশদাদা, এবার তুমি মুক্ত আর বন্ধন গ্রহণ করিও না'। আমি ভাবিলাম, বুঝি পুনর্বার বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রামবাবু আমার মনোভাব বুঝিয়া— 'না না, আমি বিবাহের কথা বলিতেছি না। সে কল্পনামাত্র তোমার মনে উদয় হইবে না তাহা আমি জানি, তোমার সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদের লইয়া একটা আড়ম্বর করিয়া সংসার করিও না। যাহারা অনন্যোপায়, তাহারা এইরূপে পত্নীবিয়োগজনিত কষ্ট সংবরণ করে। তোমার তো রামকৃষ্ণ রহিয়াছে অন্য আড়ম্বরে তোমার প্রয়োজন কি?'

মহোদয় মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় রামদাদা রাসায়নিক শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাসায়নিক পরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আসিবার সময় একত্রে তাঁহার গাড়িতে আসিতাম। সে সময় কোনো রাসায়নিক পণ্ডিতের অনুমানে অম্লজান (Hydrogen) হইতে সমস্ত বস্তু উদ্ভব হইয়াছে। আসিবার সময় রামদাদার সহিত একত্রে আসিতাম। সেইসময়ে প্রায়ই অম্লজান লইয়া কথা হইত। কথার একই ধুয়া, এক হইতে বহু, জড় বিজ্ঞানেও ইহার প্রমাণ—এই আন্দোলন করিতে করিতে পরমহংসদেবের কথা উত্থাপন হইত। মুগ্ধ হইয়া রামদাদা বলিতেন—'আশ্চর্য প্রভুর মাহাত্ম্য। যে জড় বিজ্ঞানে আমাকে নাস্তিক করিয়াছিল—প্রভুর কৃপায় দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়ায় দেখিতেছি—প্রতি পরমাণু প্রকাশ করিতেছে—অনন্ত—অনন্ত—সকলই অনন্ত—আদিঅন্তহীন। অনন্ত চৈতন্য প্রতি পরমাণুতে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজিত। সত্তার রাসায়নিক আলোচনা—

উচ্চ জ্ঞান আলোচনায় পরিণত হইত এবং জ্ঞানাধার রামকৃষ্ণদেবের স্তুতিবাদের পর আমাদের সেই দিনকার মিলন সমাপ্ত হইত।

সকল কথা বর্ণনা করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইবে ও সর্বসাধারণের ভাল না লাগিতে পারে। এক্ষণে আর একটিমাত্র ঘটনা বর্ণন করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পীড়িত অবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরের একটি বাটী ভাড়া করিয়া আছেন। কালীপূজার দিন উপস্থিত হইল। ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়া ছিলেন, "আজ কালীপূজার উপযোগী আযোজন করিও। কালীপদ অতি ভক্তির সহিত উদ্যোগ করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রভুর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল। একদিকে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী, প্রভু অন্ন আহাব কবিতে পারিতেন না, তাঁহার জন্য বার্লিও আছে, অপবদিকে স্তূপাকার ফুল—রক্তকমল, রক্ত জবাই অধিক। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ। ঘরেব পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা—আমি তাঁহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায কি বলিলেন, ঠিক আমার স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নয, কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে। রামদাদা যেন আমায উৎসাহ দিযা বলিলেন—'যাও যাও। রামদাদার কথায় আর সংকোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম কবিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমায় দেখিয়া বলিলেন—'কি কি—এ সব আজ কবতে হয।' আমি অমনি—"তবে চবণে পুষ্পাঞ্জলি দিই বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া 'জয মা' শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম। অমনি সকল ভক্তই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। প্রভু বরাভয়কর—প্রকাশ হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। সে দৃশ্য যখন আমার স্মবণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে। মনে হয়, রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।

পরিশেষে একটি কথা—বামদাদার ভক্তেব ভালো লাগিবে, এই জন্যই আমি উল্লেখ করিতেছি। রামদাদার দেহত্যাগের পর একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখি—তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পা খোলা, ঠ্যাং ঠ্যাং-এ সাদা ধুতি পরনে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—রামদাদা, এখন কি করো?' রামদাদা উত্তর করিলেন— যাহা করিতাম, তাহাই করি, প্রভুর সেবা করি। পরমহংসদেব বলিতেন—'দেব-স্বপ্ন—স্বপ্ন নয—সত্য। আমাব ধারণা, দেবমূর্তি রামদাদাকে দেখিযাছিলাম, তাহা সত্য, তিনি পরমহংস দেবের সেবায় নিযুক্ত, তাহা সত্য, অনন্তকাল তিনি পরমহংসদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন—সত্য।*

[* তত্ত্বমঞ্জরীতে (নবম সংখ্যা ১৩১১) প্রকাশিত এই রচনার নাম ছিল 'রামদাদা'। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—"রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কিরূপ ?" কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া "কলির সন্ন্যাসী' বলেন। বলেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস ভালো লোক ছিলেন বটে, কিন্তু এঁরা কেমন, তা বুঝতে পারলেম না। জুতো পায়, জামা গায়, দিব্যি বাড়িতে থাকে, খাবারদাবার বাছবিচার নাই—এখন সন্ন্যাসী বলিলেই সন্ন্যাসী। ব্যস্। সব স্বামী—স্বামী।' এঁদের কৌতূহল নিবারণের জন্য দুই একটি কথা বলিব।

যেমন জামা জুতা দেখিয়াছেন, তেমনি যে পল্লীতে এই জামাওয়ালা সন্ন্যাসী থাকেন, তাহারা কি করেন, তাহার যদি বিশেষ অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে দেখিবেন—কাহারও ঘরে রুগ্ন শয্যায় গভীর রাত্রে রোগীর আত্মীয়দের বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিয়া এই জামা গায়ে দেওয়া সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। রোগীর পথ্য নাই—সন্ন্যাসী ভিক্ষার্জিত পথ্যসামগ্রী রোগীর উপযোগী রন্ধন করিয়া, কোনো ভগ্নাবাসে প্রবেশ করিতেছেন। প্লেগের সময়, যে বস্তীতে প্লেগ বলবান—ধাঙড় লইয়া সেই বস্তীর সঙ্কীর্ণ গলিঘুঁজি যাহা মিউনিসিপ্যালিটির চক্ষে পড়ে নাই, সেইসকল স্থান প্রাতঃকালে উঠিয়া পরিচ্ছন্ন করিতেছেন দরিদ্রদের শিক্ষা দিতেছেন, যথাসাধ্য দরিদ্রদের দুঃখমোচন ও জনহিতে রত আছেন। যদি কেহ কাশীধামে গমন করেন, তথায় দেখিতে পাইবেন যে, কাশীবাসী সমাজ পরিত্যক্ত হইয়া যে অসহায় ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় ঘাটে পড়িয়া আছে, তাহাকে এই জামা গায়ে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা-স্থাপিত অনাথ আশ্রমে লইয়া গিয়া সেবা করিতেছেন এবং অনেক মুমূর্ষুর জীবনদান করিতেছেন। কনখলে যাইলেও এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। বহরমপুরে অনাথ বালক আশ্রমে কতকগুলি অভিভাবকহীন বালক দুর্ভিক্ষের করাল বদন হইতে গৃহীত হইয়া সুশিক্ষিত ও পালিত হইতেছে। যথায় বন্যা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার উপদ্রবে বনের বানর পর্যন্ত স্থানত্যাগ করিতেছে, দূর হইতেই এই জামাওয়ালা সন্ন্যাসীর বিচারক দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের আলোচ্য সন্ন্যাসী কি করিতেছেন।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে দেখিতে পাইবেন, এই সন্ন্যাসীদল শিক্ষাদান, অন্নদান, রুগ্নসেবা প্রভৃতি কঠোর সন্ন্যাসব্রত সাধনে রত আছেন। এই সন্ন্যাসীরা যে পর্বতগুহায়

বা নির্জন স্থানে বাস করেন না, তাহার কারণ—তাঁহারা গুরূপদেশে বুঝিয়াছেন—নরসেবা অপেক্ষা ঈশ্বরের উচ্চ সাধন নাই। উক্ত সমালোচকশ্রেণী ব্যতীত যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করেন, তাঁহারা সামান্য দুইটি কথা বুঝিয়া দেখিবেন—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ পরমহংসদেবের আদেশ ছিল। যিনি এই দুইটি ত্যাগ করিবার কখনও চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি উপলব্ধি করিবেন যে, এ ত্যাগ সামান্য ত্যাগ নয়। কেহ বলিতে পারেন—"ভালো, ইহাদের সঙ্গে কামিনীর সংস্রব দেখিতে পাইনা বটে, কিন্তু কাঞ্চন?—কাঞ্চনের সহিত তো ইহাদের সংস্রব দেখিতে পাই?' উত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, কাঞ্চনের সহিত ইহাদের নির্লিপ্ত সম্বন্ধ, যে রৌপ্যখণ্ড এই শ্রেণীর কোনোও সন্ন্যাসীর হাতে দেখিতেছেন, তাহা তাহার নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত নয়। উপরোক্ত সমাজ হিতসাধন কার্যে অর্থের প্রয়োজন, যে রৌপ্যখণ্ড দেখিতেছেন তাহা সেই প্রয়োজনীয় অর্থ। যাঁহারা সাধক—তাহাদের নির্জন স্থান আবশ্যক। মহাত্মা বিবেকানন্দ পৃথিবী পর্যটন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ সাধনার স্থানের অত্যন্ত অভাব। সেই নিমিত্ত তিনি বিদেশীর নিকট ভিক্ষার্জিত অর্থে মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ সেই মঠ যে ফাণ্ড দ্বারা চালিত, তাহা অধিক না, মঠবাসী প্রতি ব্যক্তির প্রতি তিন টাকা কুলায় কিনা সন্দেহ। যদি স্বরূপ অবস্থা কেহ অবগত হন তাহা হইলে এই সন্ন্যাসীদের অর্থলোলুপ জ্ঞান না করিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইবেন।

আমরা অপরকে এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু অন্তরে বুঝিতেছি যে, এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমাদেরও অনেক বুঝিবার আছে। এই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেককে তাহাদের বাল্যাবস্থায় পরমহংসদেবের সেবায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলাম। তখন আমরা বিজ্ঞ ইহারা বালক। পরমহংসদেব আনন্দের সহিত পরিচয় দিতেন যে, এই বালকেরা আমার এক বলকের দুধ, ইহাদের শেষ জন্ম আর জন্ম হইবে না। বারবার এইকথা শুনিতাম, কিন্তু ভাবিতাম, তিনি আদর করিয়া এইরূপ বলেন। কিন্তু এখন পরমহংসদেবের কৃপায় কিঞ্চিৎ অনুভব হইতেছে। পরমহংসদেবকে সমাধি অবস্থায় দেখিতাম—এই বালকেরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি সকলের দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না কিন্তু এই বালকদের হস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতেন। পীড়িত অবস্থায় এই বালকেরাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত, রোগের যন্ত্রণা এই বালকদিগকে জানাইতেন, কখনও কখনও ইহাদের উপর স্নেহপূর্ণ অভিমান করিতেন। এখন বুঝিতেছি—এ সকল তো অন্তরঙ্গের লক্ষণ। এই বালকেরাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিল। এখন বুঝিতেছি—এইরূপ গুরুসেবার ন্যায় উচ্চ সাধনা—কয়জন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে? পুরাণপাঠে অবগত হওয়া

যায় যে, গুরুগৃহে শিষ্য যাইলে গুরু তাঁহাকে গরু চরাইতে দিতেন, গৃহকার্য ও নিজের সেবায় নিযুক্ত রাখিতেন। যে-শিষ্য এই সকল কার্যে মনোযোগী হইতেন, গুরু তাঁহাকে একদিনে 'তত্ত্বমসি' বুঝাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দান করিতেন এবং সেই লব্ধকাম শিষ্য তাঁহারও সেবারত শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান ঐরূপ একদিনেই দিতেন। এখন ভাবি—পরমহংসদেবের সেবা কি তাঁহার শিষ্যগণের নিষ্ফল হইয়াছে? এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিলে পরমহংসদেবের প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ হয়।

পরমহংসদেবের লীলাসংবরণের কিছু পরে বিবেকানন্দ গাজিপুরের পাওহারী বাবার নিকট যান। তিনি পাওহারী বাবার নিকট একটি অমূল্য উপদেশ লাভ করেন। পাওহারী বাবা বলিয়াছিলেন—'গুরুভাইকো গুরুসে অভেদ জাননা।' এই উপদেশ বিবেকানন্দের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত ছিল। যখন বিবেকানন্দ হিমালয়ে সাধন করিতে যান, আমাদের নিকট জোড়হাতে বিদায় লইয়াছিলেন। দীন ভিক্ষুকের মতো বলিয়াছিলেন— 'ভাই, আশীর্বাদ করো—আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হোক।'

বিবেকানন্দের গৌরব যখন জগতে প্রকটিত হইল, যখন তিনি অনেকের নিকট জগদ্‌গুরু বলিয়া বাচ্য হইলেন, যখন শত শত গৃহে তাঁহার প্রতিমূর্তি পূজা হইতে লাগিল—তখনও তিনি তাঁহার শিক্ষক গুরুভাই হইলেও তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রার্থী হইতেন। গুরুভাইয়ের কথা গুরুর আদেশের ন্যায় পালন করিতেন। কিন্তু দেখিতে পাই, এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা হয় নাই। গুরুভাইয়ের নিকট আমাদের দীনতা কোথায়? লঘুবুদ্ধির পরবশ হইয়া কখনও কখনও তাঁহাদের বিদ্রূপক হইয়া থাকি। তাঁহাদের দেখিয়া বুঝিতে পারি না যে, গুরুদেবই তাঁহাদের অন্তরে থাকিয়া লীলা করিতেছেন। জীবন্মুক্ত হইবার আমাদের বাসনা আছে, কিন্তু সহজ উপায় উপেক্ষা করিতেছি। একবার যদি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি যে, গুরুদেব তাঁহার শিষ্যে বিরাজিত, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত হইবার বাকি কি থাকে? গুরুদেবের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। সর্বজীবে সর্বস্থানে তাঁহার দর্শন পাই।*

* সাপ্তাহিক বসুমতী ৪ [illegible] ৩১১।]

চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রমুখ ধর্মস্থাপকদের বিরুদ্ধে যাজকদের শত্রুতা

ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে ধর্ম ইতিহাসে শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, যখন ধর্মের কলুষিত অবস্থায় কোনো মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের সারমর্ম ব্যাখ্যা করিয়া সত্য ধর্ম পুন সংস্থাপনের চেষ্টা পান, ধর্মযাজকেরা তাঁহার শত্রু হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, ধর্মের প্রকৃত মর্ম আচ্ছাদিত না হইলে, ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্মযাজকের স্বার্থের বিশেষ হানি হয়।

ঈশ্বরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য এই যে, অতি নীচ, অতি পাপীরও তাহার নাম উচ্চারণে অধিকার আছে। অকপট চিত্তে পূজা করিলেই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। জাতিতে বাধে না, স্থানে বাধে না, কালে বাধে না, সকল জাতি সকল সময়ে, অবস্থায়, ভগবানের নাম লইবার অধিকারী।—ইহা যে কেবল তিনি [ভক্ত] মুখে বলেন, তাহা নহে, ইহা তাঁহার উপলব্ধ কথা, অকপট চিত্তে তিনি ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। তিনি জোলা হইয়াও (যথা কবীর), চামার হইয়াও (যথা রুইদাস), ঈশ্বরের নামের অধিকারী হইয়াছেন, ও নামের গুণে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন। [এইরূপ ঘটিলে] পুষ্পের সৌরভে যেরূপ মধুমক্ষিকা আকর্ষিত হইয়া [থাকে] সেইরূপ [সকলে] তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন। [এক্ষেত্রে] যাজক গুরুর শিষ্যের বৃত্তি অপহরণে বিশেষ ব্যাঘাত পড়ে। [তাহারা] তখন প্রচারকের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে থাকে। যে শাস্ত্রের প্রতি জীবনে তাহার একবারও আস্থা জন্মে নাই, সেই শাস্ত্র হইতে বেদ বিরুদ্ধ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সঞ্চয় করে ও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায় যে, প্রচারক কোনো ধর্মবিরোধী অসুর, পাপ পঙ্কে মানবকে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত, কলির সাহায্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

নাব করে সূর্য আচ্ছাদন করা সহজ, তবু সত্য আচ্ছাদন করা যায় না। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে আলোক প্রদান করে, ইহা অনিবার্য। চামার রুইদাসের সত্য প্রভা এই নিমিত্ত নিবারিত হয় নাই। ঘৃণা, কটূক্তি প্রভৃতি চলিয়াছে, কিন্তু অন্য ফল ফলে নাই। যাজকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

জোলা চামার লইয়া যাজক ব্যঙ্গ পর্যন্ত করিয়াছে, কিন্তু রামানুজস্বামী ব্রাহ্মণ— তাঁহার আবির্ভাবে সে ব্যঙ্গোক্তি চলিল না। [ফলে, ধর্মব্যবসায়ী] যাজক বিব্রত। নাস্তিক প্রভৃতি নানা অপবাদ পরম বৈষ্ণবের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। শিবদ্বেষী বলিয়া

তাঁহাকে রাজার বিদ্বেষভাজন করিল। শোনা যায় যে, রামানুজের একজন শিষ্যকে রামানুজ জ্ঞানে যাজকেরা চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু সেই শিষ্যের একরূপ ক্ষমাবান চরিত্র যে, তিনি ধ্যানের সময় ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া ঐ ভীষণ শত্রুর মঙ্গলকামনায় বর প্রার্থনা করেন। একরূপ চরিত্রকে সাধারণের ঘৃণাভাজন করা যাজকের সাধ্য হইয়া উঠিল না। লোকে রামানুজকে লক্ষ্মণের অবতার জানিয়া পূজা করিতে লাগিল।

বঙ্গদেশে যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, তিনিও ধর্ম যাজকের বিষ দৃষ্টিতে পড়েন। তাঁহাকে লইয়া কতরূপ ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল। উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে ত্রিপুরাসুরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল।

উপস্থিত দেখা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যাজকেরা যে ভাষায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল কটূক্তি করিতেন, চৈতন্য সম্প্রদায়ও চৈতন্যদ্বেষী যাজক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, অবিকল সেইরূপ কটূক্তি রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। 'দেশ মজালে, দেশ উচ্ছন্ন গেল'—এ সকল কথা যেমন চৈতন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ উঠিতেছে। অক্রোধী, নিরভিমানী কাম কাঞ্চনত্যাগী, বিশ্ববিজয়ী, হিন্দুধর্ম সংস্থাপককে, শ্রী া া নাস্তিক প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইতেছে। ইহা স্থানীয় দোষ নয়, বাঙালার দোষ নয়, মানবচিত্তের দোষ। স্বার্থ-চালিত যাজকেরা স্বার্থহানির আশঙ্কায়, সর্বদেশে সর্বস্থানে এইরূপ গরল উদগিরণ করিয়াছে। ঈর্ষাপরবশ গ্লানিপ্রিয় সমাজও, যাহাতে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে না হয়, সেইজন্য ঐ যাজক উদ্গারিত গরল, সুধা বলিয়া পান করে। কিন্তু সত্যের শক্তি অনিবার্য—কলুষিত স্বার্থ-বিজড়িত, ঈর্ষান্বিত ব শ-মানে মান্য, কুচরিত্র, পাষণ্ডেরা তাহা কিরূপে বুঝিবে। এবং মহাপুরুষেরা ঈশ্বরপ্রেরিত তাহাদের আবির্ভাব নিষ্ফল নয়, তাহা যে অচিরে প্রতীয়মান হইবে, ইহাই বা কিরূপে জানিবে।*

[* আলয় পত্রিকায় ১৩ বৈশাখ ১৩ ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ধর্ম স্থাপক ও ধর্ম যাজক প্রবন্ধের অংশ। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

পরমহংসদেবের "তাও বটে! তাও বটে!"

পরমহংসদেব বলিতেন—"তাও বটে—তাও বটে।' এই সামান্য কথায় কত জটিল তর্কের মীমাংসা হইয়াছে। একদিন একজন শিষ্য সাকার নিরাকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন—"তাও বটে—তাও বটে। আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে। আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে।" এই কথা শ্রবণে, উপস্থিত শ্রোতার মনে সে কি বিপুল ভাবের বিকাশ পাইল, তাহা আমি অকপটে বলিতেছি—আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার মুখে কথাটি শুনিয়া মনে উদয় হইল যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর একেবারে তিনটি ভাব ফুটিয়া উঠিল। [শ্রোতা] যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র কথায় বৃহৎ বস্তুর বৃহৎ আভাস আসিয়া উদয় হইল। শুষ্ক তার্কিক বুঝিল যে সাকার-নিরাকার, এই দুই বিশেষণে সেই বৃহৎ বস্তু বিশেষিত হয় না। তিনি বলিলেন, "তাও বটে—তাও বটে—আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে।" 'আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে'—এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই পরম গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে উঠিল। বুঝিলাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে যাহা উঠে, তাহাই বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার আমার শক্তি নাই। সেই স্বরূপবুদ্ধি উদয় হইলে মনোবুদ্ধি লয় পাইবে। এই লয়ের নাম নির্বাণ। নির্বাণ যে পরমানন্দের কথা, তাহার আভাস পাইলাম। পূর্বে শুনা ছিল, যে, শুষ্ক জ্ঞানপন্থীরা নির্বাণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্বাণ আর একটা স্বতন্ত্র কথা। এ অতি সরস নির্বাণ—রসের সাগরে ডুবিয়া নির্বাণ—মধুর নির্বাণ—প্রার্থনীয় নির্বাণ। ভক্তিস্রোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে—সেই মহাসাগর মাঝে নির্বাণ। আশ্চর্য গুরু—আশ্চর্য উপদেশ। জ্ঞান ভক্তির পার্থক্য লইয়া বিচার একেবারে দূরীভূত। ইহাতে 'চিনি হওয়া—চিনি খাওয়ার" তর্ক নাই। আনন্দ-সাগরে আনন্দময় হওয়া—আনন্দ সাগরে আনন্দ আস্বাদ করা—উভয়েই এককালে।

প্রভুর আর একটি কথার সহিত ইহার সুন্দর সামঞ্জস্য অনুভূত হইল। গুরু বলিতেন—'তিনি রস—আমরা রসিক। কথাটি কি আনন্দময়। কথাটি শুনিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যেদিন—'তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে, তাও বটে"—এই কথাটি শুনিয়া রস কি তাহা বুঝিলাম, তখন সে

রসে রসিক হওয়া কি, তাহারও আভাস পাইলাম। মনে উঠিতে লাগিল যে, সে রসের রসিকের কর্ণে সাংসারিক কলরব উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সংসার মায়া, কি [মায়া] নয়—এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? কেন সৃষ্টি হইল—কেন সংসার এমন? এ পুত্র, এ কলত্র—এ কথা কে কানে তোলে? কে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখে? গুরু বলিতেন—"কে জানে তোর গাঁই গুই। বীরভূমের বামুন মুই।" দেখিলাম—গাঁই গুই জানিবার প্রয়োজন নাই। উপদেষ্টারা আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন—এ ত্যাগ করো, ও ত্যাগ করো। এরূপ হও—সেরূপ হও।" এসব গাঁই গুই আর কিছু প্রয়োজন নাই। যে রসোন্মত্ত—সে আর ত্যাগ করিবে কি? রসসাগরে রস পান করিতেছে, কি তার আছে বা না আছে—কি ছিল বা না ছিল—জরা মৃত্যু প্রভৃতি যাহার ভয়ে সংসার অভিভূত—এ সকলের ধার সে রসোন্মত্ত ধারে না। সে উন্মাদ—মাতাল।—সে ও সকল কথাই বুঝিতে পারে না।

'তাও বটে—তাও বটে, আর কিছু যদি থাকে—তাও বটে।' 'আর কিছু যদি থাকে,' একথা মনে আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়। চিন্তাতেই চিত্ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সে ও কি? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি? যেন কোনো বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, সে দেশে রজনী নাই, চেতন অচেতন অবস্থার ভেদাভেদ নাই, "বিপুল রাজ্য, অনন্ত রাজ্য, নির্বাক রাজ্য।" ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া আমি যত বুঝি—তও বুঝিতে পারিয়াছি না। যে "মন্ত্র মূলং গুরোর্বাক্যম্"—এবং গুরুর বাক্য গুরুর কৃপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই—"মোক্ষ মূলং গুরোর্কৃপা।" *

[* প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা ১৮ প্রবন্ধটির আদি নাম তাও বটে। তাও বটে। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

'নিশ্চেষ্ট' সংসারী : রামকৃষ্ণ-শিষ্য নাগ মহাশয়

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সাধন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিয়া সাধনা করিতে পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমরা তখন বুঝিয়াছিলাম যে, ইহা একটি উত্তেজনা বাক্য—গৃহীদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত। কিন্তু এখন অনুভব হয়—তাহা নয়, তিনি সত্যই বীরভক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আপনাকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করে বারবার দুর্গম কান্তার হইতে উদ্ধার

পাইয়া ভাবে—আমার রক্ষাকর্তা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। সন্ন্যাসগ্রহণে এই উচ্চশিক্ষা লাভ হয়, এই উচ্চশিক্ষাই ঈশ্বরলাভের প্রথম সোপান। [সন্ন্যাসী] দিবারাত্র বলে—"ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার রক্ষাকর্তা, তুমি এখন কোথায়?" এই উচ্চশিক্ষা গৃহে অতি কঠিন। [গৃহী] কখনো পথহীন কান্তারে প্রবেশ করেন নাই, সে কান্তারে রক্ষাকর্তা আছেন কিনা, তাহা তিনি জানেন না, রাজশাসিত রাজপথে সুখময় যানে বসিয়া যাতায়াত করেন। পীড়ার সময় ডাক্তার আছে। তিনি যে নিরাশ্রয়, এ কথা তাঁহার উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, ঘোর তরঙ্গে সাগরনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই নিরাশ্রয়, অর্থ সম্পদ জলবুদবুদের ন্যায় এখনই লয় হইবার সম্ভাবনা, প্রতি মুহূর্তে জীবননাশের সম্ভাবনা, বিপদকালে আশ্রয় নাই, তিনিই একমাত্র আশ্রয়,—তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ থাকে না। কিন্তু বিষয়বিজড়িত মলিন বুদ্ধি কিছুতেই বুঝিতে দেয় না যে, সাগরনিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় আমরা নিরাশ্রয়। চক্ষের উপর বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি নিত্যই দেখিতেছি। এই আছে এই নাই। এই স্বজন দাসদাসী পরিবেষ্টিত—[পরক্ষণে] মৃত্যুসময় জল দিতে সকলে ব্যস্ত শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষার নিমিত্ত কেহই নাই। ঘোর বিপদে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় জ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। আবার ভুলিয়া যায়, আমি নিরাশ্রয়—এই মহাজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যবান এই সংসারে থাকিয়া সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরমহংস, তাঁহার পক্ষে সংসার গৃহ নাই।

কেহ বলিতে পারেন এই অবস্থা কি হয়? পরমহংসদেব বলিতেন—হয়। আমরা দেখিয়াছি—হয়। পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি। এ মহাপুরুষ চরিত্র বর্ণনা করা আমার কতদূর সাধ্য জানি না কিন্তু সত্যই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ—ইনি পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামনিবাসী—ইনি যখন পরমহংসদেবের নিকট যান শুনিয়াছিলেন যে, ডাক্তার, উকীল, দালাল, এদের ঈশ্বরলাভ হওয়া কঠিন। নাগ মহাশয় (আমরা সকলে তাঁহাকে 'নাগ মহাশয়' বলিয়া ডাকিতাম) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক্সটি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্বে, ডাক্তারী করিতে গিয়া, দর্শনীর পরিবর্তে রোগীর পথ্য অনেক সময়ে নিজে দিয়া আসিতেন। কোনো দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, দোকানদারকে করজোড়ে বলিতেন, "কৃপা করিয়া এক টাকার সন্দেশ দেন। দোকানদার যাহা দিল—তাই। ঘরের বাঁশ বাঁকারি ভাঙিয়া অতিথিকে কাঠ দেন। গৃহ আছে—স্ত্রী আছে—ইনি গৃহী—কিন্তু

ইহার সন্ন্যাসী হইতে কিছু প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মচেষ্টারহিত। একদিন তাঁহার গৃহের পার্শ্বে অপর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাঁহার পরিবার যাহা জিনিস-পত্র ছিল, বাহিরে আনিতেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন—"কি করিতেছ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন, কে রক্ষা করিবে? আইস—আমরা অগ্নি-দেবের স্তব করি, যাহাতে রক্ষা হয়।" সত্যই রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি পরি-বর্তন হউক বা যাহাতে হউক, কিন্তু সত্যই রক্ষা হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেষ্ট মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি।

এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত? না, কখনই নয়। সাধারণের পক্ষে কখনই নয়। আলস্যবশত যদি কখনও নিশ্চেষ্ট হইবার চেষ্টা পাও, দেখিবে, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছ না। নিশ্চেষ্ট হওয়া একটি [বিশেষ] অবস্থা—[পথ] অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা নয়। তোমার বাসনা—তোমায় চেষ্টা করাইবে। নিরন্তর সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইতে পারো, [হও]। কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তবে নিশ্চেষ্ট হইতে পারিবে। পুন পুন বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—তবে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব। যিনি পঞ্চম পুরুষার্থসম্পন্ন ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট তিনি মহা ক্ষমতাশালী। মা লক্ষ্মী তাঁহার পশ্চাতে বনে অন্ন লইয়া যান, লক্ষ্মীর বরপুত্র ভূপতি তাঁহার দর্শনে অবনতশির হন। তিনি সুখ দুঃখে অটল, সঞ্চয়বুদ্ধিরহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিতৃ সংসার জ্ঞানে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শত গুণে কঠিন।

। * উদ্বোধন ১ মাঘ ১৩১। নিশ্চেষ্ট অবস্থা প্রবন্ধের অংশ। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কর্মাদর্শ

গৈরিক পরিধান, জটা বা কেশ মুণ্ডন, সন্ন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ নয়। বাসনার তাড়না যিনি অনুভব করিয়া বাসনা দমনের চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন, নতুবা গৈরিকবসন বিড়ম্বনা। একটি থিয়েটারের লোক বলিয়াছিল, 'দেখি, আর দিনকতক দেখি, যদি প্রোপ্রাইটার [আমাকে] ম্যানেজার করে ভালো, নচেৎ পরমহংসের দলে মিশিব।" বাসনাজড়িত গৈরিক-বসনধারীও সেইরূপ। কামিনী কাঞ্চনে চিত্ত সমভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু অভিমান শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরমহংসদেব বলিতেন, "গৃহীর অভিমান কচু গাছের শিকড়, সহজেই উৎপাটিত হয়, কিন্তু সন্ন্যাস-অভিমান অশ্বথের মূল, কোনোক্রমে উৎপাটিত হয় না।" তবে কি করিব ? জীবনমুক্ত মহাপুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ করো। গৃহী হও, [বা] সন্ন্যাসী হও, তাঁহাদিগের উপদেশ ধ্রুবতারার ন্যায় পথ দেখাইয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, "গৃহী, যাহা করিতেছ করো, স্ত্রী পুত্রের সেবায় যেরূপ নিযুক্ত আছ—সেইরূপই থাকো, কেবল মনে মনে অনবরত চিন্তা করো, তুমি ঈশ্বরের দাস। যেমন পরগৃহে দাসী থাকিয়া পরের সন্তান লালন পালন করে, তুমিও তাহাই করিতেছ, তোমার ঘর হেথা নয়, এরা সব তোমার নয়—এইটি হৃদয়ে নিশ্চিত করিবার চেষ্টা পাও। এ চেষ্টায় নিয়ত ঈশ্বরচিন্তা থাকিবে, বিবেক উদয় হইবে, বিবেক প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিবে—এ সকল তোমার নয়, [তখন] অপরের পুত্রের সহিত তোমার পুত্রের প্রভেদ থাকিবে না। স্বা[র্থ] ও ব্যক্তিতে তোমার মমতা আর আবদ্ধ থাকিবে না তোমার দয়া জগদ্ব্যাপী হইবে, শত্রু মিত্র দুটি কথা ভুলিয়া যাইবে, অতি ক্ষুদ্র জীব তোমার দয়ার অধিকারী হইবে, শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা লয় হইবে।

আবার মনে কুতর্ক উঠিতেছে [ত]বে তো সংসারই ভাল, এই যে গৈরিকধারী তরুতলবাসী—ও ভণ্ড। বিবেক বুঝাইয়া দিবে—তা নয়। উনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, আপন চিত্তের দুর্বলতা বুঝিয়াছেন। আমার পুত্র আমার নয়, ভগবানের—এ ধারণা নিয়ত রাখা কঠিন—এই বিচার করিয়া তিনি স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেছেন। 'আমার' আমার শব্দ সংসারে অনবরত হইতেছে। [সংসারে থাকিয়া] আমার নয়, এরূপ ধার[ণা] কিরূপে করিবেন ? পরমহংসদেব এক দিন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বলেন— তোমার শরীরে যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রচুর ধনলাভের সম্ভাবনা তোমার নিকট ধন থাকিলে ভালই হয়, সদ্ব্যয় হয়, কি বলো—ধনী হইবে ?' বালক শুনিয়া আকুল—চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—'ভগবান আমায় রক্ষা করুন, আমার যেন ধন না হয়।' কামের তাড়নায় কেহ কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন—কিসে কাম যাইবে, কিরূপে কামিনীর কটাক্ষ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন ? অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উপায় চাহিয়া থাকেন। সেই অর্থভীক, কামিনী ভীরু লোকেরাই পরে সন্ন্যাসী হন। কুসুমশয্যায় লালিত, স্বর্ণপাত্রে পালিত [তিনি]—হয়তো তোমার আমার দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান—ভয়ে, অভিমানে নয়। ইঁহাদের ভণ্ড বলিলে অপরাধ হয়। তাঁহারা সন্ন্যাসী, তথাপি কার্য করেন। পরমহংসদেবের উপদেশমতো আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জানিয়া তাঁহারা জীবের শুশ্রূষায় ব্যস্ত

থাকেন। নর-নারী ভগবানের নানা রূপ, এই ধারণায় তাঁহাদের সেবা করেন। ভিক্ষালব্ধ দুগ্ধ বুভুক্ষুকে দিয়া, বুভুক্ষুর সেবায় অবকাশ পাইয়া, দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিতে যান। অনবরত কর্ম করিতেছেন, অলসহীন [আলস্যহীন] হইয়া কর্ম করিতেছেন, জীবন উপেক্ষা করিয়া পরহিত চিন্তায় নিযুক্ত আছেন। [তাঁহারা] সুখ দুঃখ, জীবনধারণে অনিবার্য অবস্থামাত্র জানেন, সুখে স্পৃহা, দুঃখে বিদ্বেষ আর নাই, তবে পরহিতে জীবন অর্পিত। একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি কর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সেই যুদ্ধে মৃত্যু তাঁহার অভিলাষ, কর্ম করিতে যেন তাঁহার শ্বাস বোধ হয়। যিনি কর্ম না করিযা কর্মত্যাগ করিতে চান, যাঁহার কর্ম আপন হইতে ঘুচে নাই, অথচ কর্মত্যাগী অভিমান করেন, তিনি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। ভগবান্ রামকৃষ্ণের এরূপ কর্মস্পৃহা বলবান ছিল যে, একদিন জাহ্নবী জলে দেখেন, পিতৃলোকের তর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার করপুটে জল থাকে না, কাঁদিয়া আকুল, যাকে তাকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'এ আমার কি হইল ?' কর্মক্ষয় করিযাছেন তথাপি কর্ম করিতেন। অতি কঠোর কর্ম—জীবন উপেক্ষা করিয়া জীবকে পরমার্থ দান। নির্মল চরণ পাপীর স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যাইত তথাপি শ্রীচরণ সকলের নিমিত্ত ছিল। মুখ দিয়া শোণিত উঠিতেছে, শিক্ষাদানে বিরত নন। জীবের দুঃখে দুঃখিত, সঙ্কল্পরহিত মনে শতশত জন্মগ্রহণ সঙ্কল্প।

অবিবেকী মন [আমার], ভাবিতেছি, কি করিব—সন্ন্যাসী হই। কিন্তু পরমহংসদেব বলিতেন, "যে মূঢ় বাসনা থাকিতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তার ইহকালও যায়, পরকালও যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন শরাসন ত্যাগ করিয়া কমণ্ডলু ধারণ করিতে চান, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিবারণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জুন যখন যুদ্ধে বিরত হইতে চান, তখন তিনি তমোগুণে আবদ্ধ। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক মুখ অপ্রসন্ন, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ভগবানের উপদেশে তাঁহার তম দূর হইল, রজোগুণে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান্ তাহার ভয় নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জুন তাহাতে দেখিতে পান যে, তাহার বিপক্ষেরা মৃত, যাহাকে তিনি মহাবলশালী বিপক্ষ জ্ঞান করিতেন, যে অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণকে দুর্জয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, দেখেন, তাহারা হত হইয়া রহিযাছে, আর তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে না, তিনি নিমিত্ত মাত্র, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কার্য।

অবিদ্যা বারাঙ্গনার ন্যায় হাব ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত বারাঙ্গনার হস্তে পরিত্রাণ আছে। কিন্তু এ নটী তোমার [নিজের] বাসনা, সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ফলকামনায় ধর্ম করো—ধর্ম বিশ্বাসঘাতক নন

[যে] মুটেবিদায় করিবেন। মনে করো, একবার ধনকামনায় ধর্ম করিয়াছ—ধন পাইবে। [অথচ] সংসারে ধন অতি অবিদ্যাবলশালী। ধন পাইয়াছ, আর ধর্মের উপাসনা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারীরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছিল। বলে, "টাকা দিতেছি, আপনি ভাণ্ডারা খুলুন, এ টাকা তো আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি?' এ কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, "আমি বললুম, 'না'।" আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এতে আপত্তি কি?" তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্ত কালস্রোতে কেহ কখনও দেখে নাই—ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন, (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে), 'ও মনে পড়বেক, আবার আসতে হবেক। যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শত শত জন্মগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প সুকর্ম ফলভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে দেহধারণে কুণ্ঠিত দেখিলাম।

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলি। তিনি ধ্যান করিতে বলিতেন। ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, লোচো, জুয়া চোর রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখিতেছ মনে করিবে। কিন্তু যদি কোনো বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে, তোমার ধ্যানে মহা বিঘ্ন হইয়াছে ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।'

[* উদ্বোধন মাঘ ও ফাল্গুন ১৩১৫। রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত কর্ম প্রবন্ধের অংশ এখানে উৎকলিত। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

রামকৃষ্ণের মহাবাক্য : জীবনের ধ্রুবতারা

ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, এরূপ মতভেদ বোধহয় আর কোনো বিষয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন কিনা, তিনি সাকার বা নিরাকার এবং কোন্ সাকার মূর্তি তাঁহার স্বরূপ মূর্তি, অজ্ঞানতাবশত ইহা লইয়া বাদানুবাদ নিয়তই চলিতেছে। ম্যাক্সমূলার বলেন যে, প্রধানতঃ আট প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে। [আরও] অধিক থাকুক বা না থাকুক, দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে নানাপ্রকার সম্প্রদায়, ও প্রতি

সম্প্রদায় যেন বিরোধী ধর্মাবলম্বী। প্রতি সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের জন্য নরক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। হিন্দুধর্মেও এইরূপ বিরোধ। এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের [মধ্যেও] উপাসনা লইয়া পরস্পরে এইরূপই বিরোধ। কিরূপে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস এই সকল বিরোধ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা যিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোনো কথা কিছু শুনিয়াছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু সে বিষয় উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নয়। পরমহংসদেব সকল প্রকার উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, মনুষ্যমাত্রেই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই উপাসনাই প্রশস্ত। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিতেন ও সেকথা আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইব।

ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশিত করেন। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর কি সহজে পাওয়া যায়? একজন বড় লোকের [সঙ্গে] দেখা করিতে হইলে কত লোকের উমেদারী, কত প্রকার পরিশ্রম, কত লোকের কত প্রকার স্তব স্তুতি করিতে হয়। এইসকল উমেদারী ও পরিশ্রমের ফলে সেই বড় লোকের দেখা পাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এরূপ কষ্ট ব্যতীত যে, দেখা পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ শত উপাসনা করো, কিছুতেই কিছু হইবে না, আপনাকে নির্গুণ অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করো, বহু সাধনার পর সেই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কেহ মনে করেন, তাঁহার উপাসনার প্রথাসকল রহিয়াছে সেই প্রথা অনুসারে কার্য করো, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চনা করো, শুদ্ধরূপে মন্ত্রসকল উচ্চারণ করো—এইসকল কার্য করিতে করিতে যদি ত্রুটি না হয়, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেও পড়িতে পারে। কেহ বা বলেন, ও সকল বাহ্যপূজায় কি ঈশ্বরের তৃপ্তি হয়? ও সকল বাহ্যপূজা নিম্ন অধিকারীর নিমিত্ত। তাঁহার নাম করো, ধ্যান করো, কীর্তন করো, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। কেহ বলেন, অতি শুদ্ধাচারে থাকিতে হইবে, প্রত্যহ স্নান করিয়া শুচি হও, সকাল বিকাল সন্ধ্যাহ্নিক করো, হবিষ্যান্ন আহার করো, আগে দেহশুদ্ধি করো তারপর সে কথা। কেহ বা বলেন প্রাণায়াম করিয়া আগে মনস্থির করো, নেতি ধৌতি করিয়া দেহশুদ্ধি করো—উপাসনার কথা পরে। কেহ তাঁহাদের কথায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংসারে থাকিয়া নানা সাংসারিক কার্য করিয়া—ও-সকল কার্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে যোগপন্থী বলেন—"সত্যই তো, তাহা হইবার নয়, অতএব সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করো।" সে কথায় প্রত্যুত্তরে তাঁহার প্রতিবাদী বলেন, "কেন, গার্হস্থ্যধর্ম কি ধর্ম নয়? গার্হস্থ্যধর্মে কি হয় না?" এই বাদ প্রতিবাদের অন্তর্ভূত একটি কথা আছে 'হওয়া' কাহার নাম, এ কথা তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই।

"নিয়তই ঈশ্বরে মনোনিবেশ," তাহার নাম যদি 'হওয়া' হয়, সংসারে যে, সে পক্ষে পদে-পদে বিঘ্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, এই তো বাদানুবাদ। ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, ইহা স্থির করিতে না পারাতেই এই সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর বহুদূরে, এইরূপ ধারণাই এই বাদানুবাদের মূল। কিন্তু যে ভাগ্যবান গুরুকৃপায় বুঝিযাছেন যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দূরে নাই, আমার অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে যে-মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্নেহ—সাকার মাতৃমূর্তি হইতে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারই কৃপায় চলিতেছি, বলিতেছি, তাঁহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি কোলে লইতে চান, আমরাই দূরে যাইতেছি, আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে স্থির করতে পারিতেছি না, তিনি নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন,—এরূপ ভাগ্যবানের পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি যখন পুষ্প চন্দন লইয়া পূজা করিতে বসেন, তিনি কি হয় না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। ফুলগুলি সুন্দর, আমার মা'র পাদপদ্মে [কি] দেবো না—এই ভাবিয়া পূজা করিতে বসেন। সুন্দর সুমিষ্ট ফল, সুস্বাদু আহার্য, সেইসকল দ্রব্য তিনি স্বয়ং বড় ভালবাসেন—তিনি তাঁহার মাকে আনিয়া দেন। তাঁহার মনে নিশ্চিতই ধারণা, তিনি শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করুন বা না করুন, মা তাঁহার ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মা'র গুণানুকীর্তন করেন, কেননা, তাঁহার প্রাণ টলিয়া উঠে, না করিলে মহা অশান্তি জন্মে। তাঁহার নিকট অপরাধ নাই, পাপ নাই, তিনি অপার স্নেহময়ী মায়ের সন্তান। তিনি নিজেকে যত ভালবাসেন, তার শতগুণে মা তাঁহাকে ভালবাসেন। এ মা'র কেন দেখা পাইতেছি না, বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।

এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তির অবস্থা অতি প্রার্থনীয়। গুরুর কৃপায় এই প্রার্থনীয় অবস্থায় যাঁহার দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনীয় অবস্থা যিনি চান, তাঁহার ও কঠোর পন্থা নয়। সেই অবস্থা পাইবার [জন্য] ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থা। হয়তো তিনি ভাবেন, আমার মন অতি দুর্বল, এরূপ প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই দুর্বলের নিমিত্ত কৃপাময় রামকৃষ্ণদেব কি সহজ উপায়ই করিয়াছেন। তোমার এই মনের দুর্বলতা অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট জানাও, যতটুকু পারো জানাও, তিনি বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তুমি দুর্বল—তিনি জানেন। তুমি একবার শরণাগত হইলে, তিনি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন না—তিনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণ পরায়ণ। এই রামকৃষ্ণের মহাবাক্য।—কেহ এরূপ দীন নয় কেহ এরূপ সাংসারিক হীন অবস্থাগত নয় যে দিনান্তে একবার এইরূপে তাঁহার মনের অবস্থা ঈশ্বরকে জানাইতে না পারে।

হয়তো শাস্ত্রাভিমানী বলিবেন, একবার প্রার্থনা করিলেই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ কি প্রার্থনা করে না? করে কি না করে, তাহা আমরা বিচার করিতে বসি নাই। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যিনি রোগ, শোক, মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে আপনার অসহায় অবস্থা, আপনার হীনতা, আপনার দুর্বলতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা করিবেন সন্দেহ নাই, এবং সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারসমুদ্রে নির্ভয়ে তাঁহার জীবনতরণী সঞ্চালন করিতে পারিবেন। সন্দেহের ঝটিকা উদয় হইলে, অন্ধকারে দিকনির্ণয় করিতে না পারিলে, সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন, দেখিতে পাইবেন, সেই উজ্জ্বল তারকার অলক্ষিত প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গ মাঝে তাঁহার ক্ষুদ্র তরণীখানি অটুট রাখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঝটিকা শান্ত হইয়া যাইবে, আবার নির্বিঘ্নে চলিবেন। যদি কেহ আমাদের ন্যায় হীন, আমাদের ন্যায় দুর্বলচিত্ত থাকেন, তাঁহার চরণে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্থান দেন এই মহাবাক্যের প্রভাব দিন দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ হৃদয়ে আশা আসিয়া বসিবে বলবান্ আশা—কোনোরূপ সংসার তাড়নায় তাহা টলিবে না। যাহা বলিতেছি যদি না উপলব্ধি করিতাম একরূপ দৃঢ়বাক্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। একবার সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে, তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অতুল প্রভাব প্রকাশ করিবেন, ও হৃদয় উচ্ছ্বাসে "জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া করতালি দিবেন।*

* উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩১৫। প্রবন্ধের মূল নাম ধ্রুবতারা। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ

সাধনগুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ

হিন্দুরা বলেন স্পেন্সার ও অপরাপর সাহেবরাও বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর মনোবুদ্ধির অগম্য। তন্মধ্যে হিন্দুর বিশেষত্ব এই যে, [তাঁহারা বলেন] ঈশ্বর জড় মনোবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে। শুদ্ধ মনোবুদ্ধি সাধন সাপেক্ষ। সাধন কাহাকে বলে? যাহা না জানি তাহা শিখিতে হয়, যে জানে তাহার কাছে যাইতে হয়। এখানে একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে—কেন পণ্ডশ্রম করিব? বড় বড় সাহেব বলেন, জানা যায় না। যিনি বলেন জানা যায়,

তিনি প্রমাণ করিয়া দিলে আমরা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিব। অবশ্য কোনো সাহেব যখন বলিয়াছিলেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শ ব্যতীত সূচিকা সঞ্চালিত হয়, তখন আমরা [পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়] ভাড, এসিড ও কার্বন প্রভৃতি আনিতে কোনো আপত্তি করি নাই। বলি নাই যে, ছুঁচ নাড়িবে, তবে এ-সকল কেন? তবে যদি এখন বলেন, পুষ্প চন্দনাদি সংগ্রহ করো, শিবলিঙ্গ নির্মাণ করো, আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এ কথাগুলি উচ্চারণ করো—আমরা হাস্য সহকারে বলিব, আমাদিগকে বাতুল পাইয়াছ? কি ইকৃডি-মিকৃডি চামচিকডি কানের গোড়ায় বলিলে তাহা জপ করিব, না মাটির উপর ফুল চাপাইব? এত আহাম্মক নহি। তাহা অপেক্ষা এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে মরণ ভাল।

সাধন শিক্ষক বলেন—"বাপু। [আমায়] কখনো মিথ্যা কথা কহিতে শুনিয়াছ? তোমার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইলে আমার কি কিছু লাভ হইবে? দেখ আমি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী, আমার কিছুই প্রয়োজন নাই, তোমার নিকট কিছুই চাহি না, তুমি ত্রিতাপে জর্জরীভূত হইতেছ, তোমার দুঃখ নিবারণ হয়—এই আমার বাসনা। দিবারাত্রি আমার সহিত থাকিয়া দেখ, ইচ্ছা হয়, বর্ষাবধি থাক, আমার কোনো অসৎকার্যে প্রবৃত্তি আছে কিনা অনুসন্ধান করো তোমায় ঠকাইতে চাই কিনা দেখ। অমনি মনে মনে আন্দোলন করিব, আশ্চর্য করিয়াছে, সত্য, এ ব্যক্তি সত্যবাদী বটে, কাঞ্চন ত্যাগী, কেননা কাঞ্চন স্পর্শে ইহার শ্বাসরোধ হইয়া যায় দেখিয়াছি, অতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেও কোনো ছল ধরিতে পারেন নাই; কামিনী কটাক্ষ ইহার অন্তরে বিদ্ধ হয় না, বালকের ন্যায় সকলকেই মাতৃসম্বোধন করে—একি মিথ্যাকথা কহিতেছে?

না, [মিথ্যাবাদী নয়, কিন্তু] উহার ভ্রম হইয়াছে। [উনি] অতি সরলপ্রকৃতি বটে কিন্তু ভ্রম—ভ্রম। বিদ্যাহীন—বিজ্ঞানপাঠ করে নাই, সুতরাং অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ।

সাধন গুরু আবার অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল, "তুমি মনে মনে এইসকল কথা আন্দোলন করিতেছ [কিন্তু] আমার ভ্রম নয় বাপু আমার ভ্রম নয়। এখনও সেই জগৎ ব্রহ্মময়ী মাতাকে আমি সম্মুখে দেখিতেছি, ঊর্ধ্ব অধ মধ্যে পূর্ণ দেখিতেছি, আমার বড় সাধ—তোমায় দেখাই, আমার কথা শুন, যাহাতে দেখিতে পাও, তাহার উপায় করো"—বলিতে বলিতে অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য আমার মনোভাব কিরূপে জানিল? [বুঝিয়াছি] এ ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, অনুমানে ধরিয়াছে। ভালো, আমার জন্য কাঁদে কেন? অশ্রুধারার আবার রকম আছে আমাদের অশ্রু নাসিকার পাশ দিয়া বহে ইহার অশ্রু চক্ষুর অপর পার্শ্ব দিয়া পড়িতেছে, ইহার কারণ কি? আমার ভালোর নিমিত্ত ইহার এত গরজ কেন? যাহা হউক, দেখা যাক—ঈশ্বর দেখিয়াছি বলিতেছে একটা প্রশ্ন করিলেই বিদ্যা-

বুদ্ধি বোঝা যাইবে, দেখা যাক। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাক। যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে, অবশ্যই বলিতে পারিবেন। "ভালো, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, বলুন দেখি, সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে?" সুচতুর বৈজ্ঞানিক মনে-মনে ভাবিতেছেন—কেমন প্রশ্ন করিয়াছি, একেবারে নীরব।

এদিকে সাধন গুরু অচেতন, কাষ্ঠবৎ সংজ্ঞাহীন, চক্ষু স্পন্দহীন, মুখমণ্ডলে এক বিচিত্রভাবাপন্ন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। একি মৃত নাকি? না না, ক্রমে ক্রমে ভাবের পরিবর্তন দেখি। এই যে চৈতন্য হইয়াছে, কিছু না, মূর্চ্ছাগত [হইবার] বাই আছে।—"মহাশয়, অমন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন কেন?" সাধন গুরুর উত্তর—সৃষ্টির প্রকরণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি ব্রহ্মযোনি দর্শনে অভিভূত হইয়াছিলাম, দেখিলাম—

'এক রূপ অরূপ নাম বরণ, অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন সর্বহীন 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়,
তথা হতে বহে কারণ ধারা— ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি 'অহং অহং' ইতি সর্বক্ষণ॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সে সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতি মগন॥
তাহে বাহে কত জড় জীব প্রাণ, সুখ, দুখ, জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য তারই কিরণ— সেই সূর্য—সেই কিরণ॥*

[এই বৈদান্তিক গীতটি স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত।]

[* সৌরভ ভাদ্র ১৩২ সংখ্যায় সাধু গুরু নামক প্রবন্ধের অংশ। বর্তমান শিরোনামা সম্পাদকগণ প্রদত্ত।]

প্রলাপ না সত্য?

একটি গল্প আছে যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভূকৈলাসের রাজারা আবাদের নিমিত্ত মাটি খনন করিতে করিতে, মাটির নীচে সমাধিস্থ একজন মহাপুরুষকে পান। মহাপুরুষকে ভূকৈলাসে আনিয়া, সমাধিভঙ্গের নানাবিধ চেষ্টা হয়, কিন্তু কিছুদিন কোনোরূপে সমাধিভঙ্গ হইল না। ক্রমে নানা উপায়ে সমাধিভঙ্গ হইল এবং তৎপরে মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। এ কথা পরমহংসদেবের নিকট উঠিয়াছিল। এক ব্যক্তি পরমহংস-

দেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, এ কিরূপে হইল ? এরূপ সমাধিস্থ মহাপুরুষের অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগের কারণ কি ?" পরমহংসদেব উত্তর করিলেন, যে সমাধিস্থ মহাপুরুষের দেহের আর আবশ্যক ছিল না। উপমা দিলেন যে, বৈদ্যেরা বোতলে করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করে—যখন মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে।

সাময়িক কথার উত্তর হইল , কিন্তু [শ্রীরামকৃষ্ণের] সে কথার যত আন্দোলন করা যায়, ততই মনুষ্যদেহধারী জীবের অবস্থা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন। ঈশ্বরজ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মন স্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায, সেই ইন্দ্রিয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বরপথ হইতে অন্তর করে। ইন্দ্রিয় প্রলোভনে মন সুখ আশে ব্যাকুল হয়, অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জমে। উচ্চাশয় ব্যক্তিরা সাধারণের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রলোভনে মুগ্ধ না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করুন যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বিস্ফোরণপূর্বক যতই জড নিযমের জ্ঞানলাভ করুন, মানসিক চিন্তার দ্বারা যতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিন্তায় বুঝিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান, নিশ্চিত জ্ঞান তাহার আদৌ জন্মে নাই।

তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোনো দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোনো ইন্দ্রিয প্রস্ফুটিত না হইলে, নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভের কোনোই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন—কোথায কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া, বৃথা চেষ্টা বিবেচনায নিরস্ত থাকেন। কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, [তিনি] যন্ত্রণায় আকুল হন, নানাপ্রকার উপায অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান।

যখন [তিনি] একান্ত আকুল—কি এক আশ্চয নিয়ম সংসারে চলে—এমন কথা তাঁর কানে আসে, এমন ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে, একেবারেই স্থির করেন—এ ব্যক্তি যা বলে, শুনিব, দেখি, এ পথে কি হয় ? তাঁর কথায় বুঝিতে পারেন যে, তার প্রার্থনা বিফল হয় নাই , যদিচ অন্ধকার পথে চলিয়াছেন, তথাপি তিনি অগ্রসর , আরো কিছু অগ্রসর হইলে আলো পাইবেন। সেই পথে চলিতে থাকেন, ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পান এবং উপলব্ধি করেন যে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের রুচি প্রভেদ। যে সকল পান ভোজন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক ছিল, সে সকল আর তৃপ্তিকর নয়, এমন কি—দেহের অসুখপ্রদ। দেখিতে পান, যে-সকল মনের রুচি ছিল, যে-সকল আলোচনা করিতেন, সে সকল নীরস, এবং যৎকালীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ ছিলেন, তৎকালীন যে-সকল বিষয় নীরস ছিল, এক্ষণে তাহা ব্যতীত আর সরস

জিনিস নাই।

এখন সত্য সত্যই তাঁহার দেহের অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সে তীব্রতা নাই কেন? সুখ-ইচ্ছা নাই কেন? অপর চিন্তা নাই কেন? দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের বিকার না জন্মিলে ইন্দ্রিয়েরা সতেজ থাকে, তাহাদের স্পৃহাও সতেজ থাকে। তবে এ কি বিকার উপস্থিত?—এ কি পীড়া? স্থূল দৃষ্টিতে পীড়াই বটে। মস্তিষ্কের বিকার—নচেৎ অতবড় পণ্ডিত, অতবড় বিজ্ঞ, অতবড় মানী সমস্ত ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়া, দীনহীনের ন্যায় পরের চরণ সেবা করিতে ব্যাকুল, দিবা রাত্র রোদন করে, রোদনের ধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে। নাসিকার দিকে চক্ষের ধারা না বহিয়া চক্ষের অপর কোণ হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া ধারা বয়। পরম উপভোগের দ্রব্য ভোগ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করাইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুললিত নারীসঙ্গ কাল সর্পের ন্যায় জ্ঞান হয়। দেহেও সেরূপ তীব্র যন্ত্রণাবোধ নাই, যে সকল কঠিন রোগে সকলে ব্যাকুল হয়, তাহাতে তিলমাত্র কাতর নয়—যেন অঙ্গের সাড় নাই, দিবারাত্র বিভোর। অধিক সুরাপানে যেরূপ বিভোর থাকে, সেইরূপ বিভোর।

দেখা যায়, এমন কথা বলে, যাহা জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তবে আর কিছু নয়, ও Clairvoyance—একটা রোগবিশেষ। এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়, এই ইন্দ্রিয়েরই কার্য, তবে ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা মাত্র। এ কী, বলা যায়না, রোগের প্রলাপ অবস্থায় এরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এর কিছু স্বতন্ত্র—এ কিসব বলে—প্রলাপ? প্রলাপই বটে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই—শাস্ত্রে একপ অবস্থার কথা আছে। জ্ঞানীর এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আবার মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহার একটি কথাও প্রলাপ নয়। অবশ্যই যেসব অতীন্দ্রিয় কথা বলে, তাহা যদি প্রলাপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত না, প্রলাপে মিল থাকে না—আজ একরকম, কাল একরকম। পাগলের মুখেও কখনো কখনো ভবিষ্যৎ কথা শোনা যায—সত্য হইতেও দেখা যায। কিন্তু ইহার [ক্ষেত্রে] এক আধটা নয়, যাহা মিলানো যায় তাহার সমস্তই সত্য। আবার কতকগুলি শক্তির বিকাশও দেখা যায়—এই উন্মাদ ব্যক্তি মন আকৃষ্ট করে, তাহার কথায় দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আসে, মৃত্যুভয় দূর হয। এ এক অদ্ভুত পাগল। এ পাগল যথায় যায়, তথায় ইষ্ট। গ্রাম মাতায়—দেশ মাতায়—ইষ্ট ব্যতীত ইহার দ্বারা অনিষ্ট হয় না।

যে ছবি আমরা দিলাম, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কি সত্য?—সত্য। আমরা এ পাগল দেখিযাছি এবং যে পাগল তাহাকে পাগল করিয়াছে, তাহাকেও দেখিয়াছি। বিবেকানন্দের সহিত রামকৃষ্ণের যিনি সম্বন্ধ জানেন, তিনি আর আমাদের বর্ণনা অলীক বিবেচনা করিবেন না। বোতলের মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল বৈদ্য

বোতল ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

তবে কি আমাদেরও দেহবোতলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে? পরমহংসদেব বলিতেন, 'নিশ্চিত'। সে কথায় নিশ্চিত ধারণা কেন না করিব?—যে কথায় যমভয় দূর হয়, যে কথায় সংসার সাগর তরঙ্গে বিচলিত করে না, যে কথার ফলিত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি—সে কথায় কেন না নির্ভর করিব? যাহাতে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়, সে পথে কেন না চলিব? আরে বাতুল, তুমি আমায় বাতুল বলো? অহঙ্কার করিয়া বলিব—আমি বাতুল নই। মনুষ্যত্ব লাভের উপায় পাইয়াছি—মনুষ্যত্ব লাভ করিব।—মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে, বোতল যাক না।—জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়।*

* উদ্বোধন অগ্রহায়ণ ১৩১ ।]

গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : গুরুর প্রয়োজন

পরকাল চিন্তা করে না এমন মনুষ্য নাই। মৃত্যুর পর কি হয় এ চিন্তা সকলকেই ব্যাকুল করে। পরকাল চিন্তা করিতে ঈশ্বরচিন্তা আসে, ঈশ্বর আছেন কিনা—এ সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ মনে উঠিতে থাকে। একেবারে নাস্তিক প্রায় কেহ হয় না এবং ঠিক আস্তিকও অতি বিরল। যিনি [ঈশ্বরের] প্রমাণাভাব বলেন তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে একবার কল্পনা করুন কিরূপ প্রমাণ পাইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন, তিনি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। ঈশ্বর বলিলেই জড় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুঝায়, জড় পরীক্ষায় জড় সম্বন্ধে যে সত্য প্রকাশ পায়, সে প্রমাণে যাহা চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি [কেহ] বলেন ঈশ্বরকে দেখিলে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেখা কাহাকে বলে? চোখে দেখিয়া?—স্পর্শে?—বা কিরূপ দেখিলে তিনি বিশ্বাস করেন? এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত আছে, চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন [যে] সে ব্যক্তি উপস্থিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন—তিনি ঈশ্বর? কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার ঠিক ধারণা হইবে? আমরা অসীম অনন্ত বলিয়া ঈশ্বরের উপাধি দিয়া থাকি। যাহা অনন্ত, তাহা চক্ষু বা স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি হইবে, একথা যুক্তিতে পরিহাসের বিষয়।

তারপর এরূপ [জড়] প্রমাণ চাওয়া অসঙ্গত। ঈশ্বর তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল নন। যদি এরূপ প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদা ব্যাকুল থাকেন,

তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর নন। বরং যাঁহাদের কাছে তিনি এরূপ প্রমাণ দেন, তাঁহারা তাঁর ঈশ্বর। মোট কথা এই, বুদ্ধিদ্বারা এরূপ প্রমাণ কল্পিত হইতে পারে না, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা অসিদ্ধ, তাহা মানিব কেন? শাস্ত্র বলেন যে, মনোবুদ্ধির অগোচর ঈশ্বর—ভক্তের গোচর হন। শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস করিয়া যে মহাপুরুষ শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান করিয়াছেন—তিনি বলেন, আমি ঈশ্বর পাইয়াছি। কেবল তিনি পাইয়াছেন, তাহা নয়, তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বরলুব্ধ ব্যক্তি মাত্রেই, নিঃসন্দেহে ঈশ্বরলাভ করিবে। দেখা যায় যে, মহাপুরুষ নিষ্কাম, অথচ সাধারণ সকাম ব্যক্তির ন্যায় দ্বারে দ্বারে এ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তর্কের নিমিত্ত ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলে, যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি অতি নির্মল হইবেন, কল্পনা করা যায়। বস্তুত দেখা গিয়াছে যে, যিনি ঈশ্বর আছেন প্রচার করেন, তাঁহার চরিত্র অতি নির্মল। যাঁহার ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তাঁহার সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। বাস্তবিক প্রচারকও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, ইহা শত পরীক্ষায় দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই এই মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইয়া, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারেন। ইহারও শত পরীক্ষায় শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরলব্ধ ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ আছে, সেইসকল লক্ষণ এই মহাপুরুষে প্রকাশ। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রমাণ পাইলাম, কিন্তু ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহা সাব্যস্ত করিবার বিশেষ বাধা জন্মিল।

এক্ষণে সন্দিহানচিত্ত মনুষ্যের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? ঈশ্বর আছেন কিনা যাঁহার জানিবার সাধ, তাঁহার কর্তব্য কি? সদযুক্তি অবশ্য বলিবে, এই মহাপুরুষের আশ্রিত হও। যদি ঈশ্বর চাও, এই গুরুর আনুগত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি যাহা বলেন তাহাই করো। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি কোনো নীতিবিরুদ্ধ কথা বলেন না। যে-সকল আচার অবলম্বন করিতে তিনি আদেশ দেন, তাহাতে মানবহৃদয় অতি উচ্চ হয়। তিনি সত্যবাদী হইতে বলেন, জিতেন্দ্রিয় হইতে বলেন, হিংসাদ্বেষাদি পরিহার করিতে বলেন, নির্মলচরিত্রে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বলেন, এবং দৃঢ় করিয়া বলেন—এইসকল অনুষ্ঠানে নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ হইবে। সত্য যিনি ঈশ্বরলাভ করিতে চান তিনি এই গুরুকে শত প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশ মতো ব্রতী হইবেন নিশ্চয়। গুরু বলেন—"এইরূপ অনুষ্ঠানে তোমার সন্দেহ দূর হইবে, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন।" গুরু বলেন—"আমার সন্দেহ তিনি দূর করিয়াছেন।"

সন্দিহান চিত্ত আপত্তি করিতে পারে, এ মহাপুরুষ অতি উচ্চব্যক্তি সত্য, কিন্তু

ঈশ্বর সম্বন্ধে ইনি তো ভ্রমে পড়েন নি? যেমন, কি না কি-একটা দেখিয়া লোকে বলে, ভূত দেখিয়াছে,—ইঁহার তো সে অবস্থা নয়? এ আপত্তির উত্তর একটি আছে— মনোবুদ্ধির অগোচর পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করাই সম্ভব। এই মহাত্মা আত্মাতে পরমাত্মা অনুভব করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে যাহা হইতেছে, তাহা আমরা অনুভব করি এবং তাহা ভুল নয়। ক্রোধ হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি —ভুল নয়। দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি—ভুল নয়। তবে যে, গুরু বলিতেছেন, অসীম অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত, তিনি অনুভব করিয়াছেন, সত্যসেবী মহাপুরুষের কি সেইটি ভুল? সন্দেহ নির্মূল না হইতে পারে কিন্তু এরূপ চিন্তায় সন্দেহের বেশী জোর থাকে না, [মনে] ইচ্ছা আপনি উদয় হয়—এই মহাপুরুষের অনুসরণ করি। শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বরলাভ হয়। ইনি বলেন, লাভ করিয়াছি। শাস্ত্র কত পূর্বে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্য ইঁহাব জীবনে পরীক্ষিত। অতএব নির্মলচিত্ত ব্যক্তি বুঝিবে যে গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আমার আর উপায় নাই।*

[উদ্ব ধন ১ ভাদ্র ১ ৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপ হারী, সাধ ধরি হৃদিপরে ॥

২

আমি সাধে কাঁদি,
হৃদয় রঞ্জনে না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ফুল্ল ফুল হারে সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হল বাদ

ভাবে ভোলা মাতোয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা
ঢলে ঢলে ঢলে নাচ কুতূহলে, এসো গুণনিধি সাধি ।।
চলে গেলে, আর এলে না জীব তো হরিনাম পেল না,
পার পাবে না ঋণে, যদি দীনহীনে, কর পদে অপরাধী ।।

৩

গগনভেদী উঠেছে জয়রব,
আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ উৎসব ।।
মত্ত ধরা সসাগরা পরশে শ্রীপদ
নাই তো আর ভবসিন্ধু হয়েছে গোষ্পদ ।।
ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম সম্পদ ।।

৪

আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ ।
হয়েছি রতনহারা বিহনে যতন ।।
সেই রবি শশী তারা সেই ধরা তৃণ হারা,
বহিছে সময়ধারা বহিত যেমন ।
সেই পক্ষীকুল কল অনিলে দোলে অনল
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ।।
রসিক প্রেমিকবর জগমন ফুল্লকর
ধরেছিলে কলেবর আমার কারণ ।
তব প্রেম নাহি মনে ভুলে আছি তোমা ধনে
শত ধিক এ জীবনে, ধিক তোরে মন ।।

৫

যদি স্মরণ নিতে পারি রাঙা পায়
নাম নিলে তার হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথা পলায় ।।
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তার করুণায় ।।
যে জন করুণা যাচে, (ঠাকুর) আসেন তার কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে,
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায় ।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

সকল মঙ্গলালয়,   পূর্ণ বিরজিত,
প্রেমের আধার।
নির্বিকার, হর্ষ শোচ-বাসনা বর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার।
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্মল—অনিল স্পর্শে যার,
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা ভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার।

(২)

শুভাশুভ এ সংসারে সম প্রবাহিত,
মিশ্রিত ধারায়,
সুখে দুখে মানব জীবন আন্দোলিত
তুষ্ট রুষ্ট কহে দেবতায়,
গৃহ দগ্ধ অনল প্রভায়,
পূতবারি—প্রাণনাশ তায়,
পবন জগৎ প্রাণ, ধ্বংসকারী বেগবান
রবি তাপে জীবন হারায়,
অন্ন বিষ, শস্য ক্ষয় কভু বরিষায়।

(৩)

কভু রোষান্বিত হন জনক জননী,
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহ—সর্পের বিবর,
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র প্রাণহর,

স্নেহমায়া পাশরিয়া, দুষ্টা কন্যা দহে হিয়া,

শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর,

অবিশ্বাসী—পুত্রসম পালি কিঙ্কর।

(৪)

ভাস্কর নাহি মাত্র তব করুণায়

হে দীনশরণ।

মাগে বা না মাগে—কৃপা বিলাও ধরায়,

বারমাস বারি বরিষণ;

বিধবার ধনাপহরণ

ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রী গমন,

ত্যজি কন্যা পুত্র যারা পাপাসক্ত, অত্যাচারী,

লোক লাজ্য ঘৃণিত জীবন—

তব দানে মুক্ত তারা পতিত পাবন।

(৫)

ভবে প্রান্ত ধর্মশাস্ত্র রচে লোকে নানা

লক্ষ্য তাহাদের

পিতা তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর

অসীম বুদ্ধিবলে যাহে,

তর্ক বল শাস্ত্রের বিচারে—

সন্দেহ উদয় বারে বারে,

নিত্য শ্রী পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,

ঐক্য জ্ঞান প্রচার সংসারে,

মতে দ্বন্দ্ব ঘুচে সদা বিশ্বাস সঞ্চারে।

(৬)

কলিকালে পাপ তাপ জন্ম মৃত্যু মাঝে,

হে প্রাণ,

দিয়ে স্থান ভগবান শ্রীচরণ রাজে

তাব নামে কপালমোচন।

নিরন্তর ত্রিতাপ দহন,

দণ্ড করে পশ্চাতে শমন,

কর্মফল নিজদেহে সহিয়া অপার স্নেহে,

পি

করো দূর শমন-শাসন,
বার ত্রাস, হর পাশ, ত্রিতাপ হরণ।

(৭)

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণজ্ঞান,
প্রেম ভ্রমে কাম রসে আর নাহি রসে,
দুখ সুখ নেহারে সমান,
ঠেলে পায় ধন জন মান,
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ,
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয় বন্ধন টোটে
বৈরাগ্য আলোক দৃশ্যমান
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অনুমান।

(৮)

কে গো তা পূজিতে পারে পূজা জানে কেবা
অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ সেবা
তব ধ্যান পরম উৎসব,
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব
দুষ্ট ষড় রিপু পরাভব,
ভুলায় যন্ত্রণা জ্বালা তব নাম জপমালা
অহংকার দমিত দানব,
অর্চনার অধিকার—অতুল বৈভব।

(৯)

নিরৈশ্বর্য আসিয়াছ মাধুর্য লইয়া
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব মাঝে, পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য অধরে,
পাছে নর নাহি আসে ডরে
দীনবেশে ডাক সকাতরে,
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান,

সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন মাধুরী হেরি অভিমান হরে।

(১)

চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব,
পুরুষ প্রধান।
মত্তচিত্ত মহা ঘোর বিষয় আহব
হৃদয়ে না রহে তব স্থান,
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান
জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টিদান,
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ,
ইন্দ্রিয় তাড়না বলবান্।
হৃদপদ্ম বিকাশিয়া হও অধিষ্ঠান

সারদাদেবী-সঙ্গীত

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে 'আমি আমি' ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী॥
বরাভয় করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি, শমন বিজয় যার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী "কেঁদো না, রামকৃষ্ণ পদ দেখো না।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা॥"
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে
ভুবন তারণ গুণমণি॥*

[পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শন প্রার্থনা করেন। মাতাঠাকুরাণী সে সময় জয়রামবাটীতে ছিলেন। সুতরাং সশরীরে না গিয়াও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ডাকাইয়া গানের ভাবটি স্বয়ং বলিয়া দিয়া গানটি রচনা করান। এই গান শুনিতে শুনিতে বা শ্রবণের পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।— সঙ্গীত সংগ্রহ।]

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

(১)

তারা উজ্জ্বল শশিল ধরাপর, নির্মল গগন বিকাশ।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥
রবিকর কষিত কুজ্ঝটিকা ঘন, আবরে দিনকর কান্তি
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি॥
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ, মহানন্দে নন্দ মহাসম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী,
জনমন মার্জিত শান্তিপ্রদান, সশিষ্য গুরুপদে হৃদে সাধে ধনি
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষ॥

(২)

কে গো নরেন্দ্রবর বীরেশ্বর দেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যা বিনাশকারী।
তমাচ্ছন্ন বসুন্ধরা, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান জ্যোতি কে এসেছে সহাকারী॥
রহি পর কাজে রত, শিখাবে কি মহামন্ত্র,
এসেছ আশ্রিত যত জন মন তাপহারী।
গুরুপদে নিদান, জীবন যৌবন মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দ্বারের ভিখারী॥

(৩)

ভুবন ভ্রমণ কর যোগিবর যার ধ্যানে।
তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথপানে॥
উচ্চরবে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা
মোহিলে মানব চিত, প্রভুর গৌরব গানে।
নানাদেশে নানাভাবে জয়ধ্বনি একতানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক আলোক দানে।
জনমন পুলকিত, মোহনিশা অবসানে॥

দ্বিতীয় পর্ব

গিরিশ-সংক্রান্ত ডায়েরি, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র,
জীবনী প্রভৃতি থেকে সংকলিত
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও
স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ সংবাদ

[শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে সংকলিত]

২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪—ঠাকুরের গাড়ি বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুয্যে ও আরও দু একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরিশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের বক্সে বসানো হইল। ঠাকুরের পাশে মাস্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম, আরও দু'একটি ভক্ত।

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নীচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপ সিন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বক্সে লোক হইয়াছে। এক একজন বেহারা নিযুক্ত, বক্সের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন। ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে)—বা, এখান বেশ! এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাস্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কত নেবে?

মাস্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মার মাহাত্ম্য।

ড্রপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল। প্রথমে, পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তারপর বনপথে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা। ভক্ত বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই বিদ্যাধরীগণ আর মুনি ঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

ধন্য ধরা নদীয়ায় এলো গোরা।
দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে, আসিতেছে হরি দরশনে।
দেখ, প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোল, মুনি ঋষি আসিছে সকল।

বিদ্যাধরীগণ আর মুনিঋষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে স্তব করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, আহা! কেমন দেখো!

বিদ্যাধরীগণ ও মুনিঋষিগণ গান করিয়া স্তব করিতেছেন—

পুরুষগণ—কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
স্ত্রীগণ—মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী।
সকলে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।
পুরুষগণ—ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর ভয় ভঞ্জন।
স্ত্রীগণ—নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন।
পুরুষগণ—গোবর্ধন ধারণ, বনকুসুম ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
স্ত্রীগণ—শ্যাম রাসরসবিহারী।
সকলে—হরিবোল, হরিবোল হরিবোল মন আমার।

বিদ্যাধরীগণ যখন গাইলেন—"নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা রাধিকা হৃদিরঞ্জন" — তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিমধ্যে মগ্ন হইলেন। কনসার্ট হইতেছে। ঠাকুরের কোনো হুঁশ নাই।

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দ সমবয়স্কদের সহিত গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন—

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাঈ।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী কাঁহা মেরি মোহন মুরলী।
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মেরে ভাই॥
কাঁহা মেরি যমুনাতট, কাঁহা মেরি বংশীবট
কাঁহা গোপনারী মেরি কাঁহা হামারা রাই॥

অতিথি চক্ষু বুজিয়া, ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি ভগবান বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া প্রসন্ন করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব করিতেছেন—

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ।
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ

নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভাব ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাসরসবিহারী,
দীন আশ কলুষনাশ দুষ্ট ত্রাসকারণ।
স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর—গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা, মেয়ে পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন। নিমাই নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেছেন। একজন ব্রাহ্মণ ভারী রেগে গেলেন আর বললেন, আরে বেল্লিক! বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস সর্বনাশ হবে তোর! নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের প্রাণে সহ্য না। তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই ফিরে আয়, নিমাই, ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না। একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই 'হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে ফিরিলেন।

মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা! ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'আহা' বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরাম ও মাস্টারকে)—দেখ যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তাহলে গোলমাল করো না। ঐহিকেরা ঢঙ মনে করবে।

কিছু পরে উঠিলেন। নিমাই সন্ন্যাস সাজিয়াছেন। শচী ও প্রতিবাসিনীগণ চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া। নিমাই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছেন—

দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।
ওগো ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি,
ওগো তাই তো আসি দেখ মা উপবাসী।
দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'।
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে
একাকী থাকি মা যমুনাতীরে
আঁখিনীরে মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধারে ধারা মৃদু নাদে।

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বেশে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন।

পুরুষগণ—চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরূপধারী।
স্ত্রীগণ—গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জচারী।
নিমাই—জয় রাধে শ্রীরাধে।
পুরুষগণ—ব্রজবালক সঙ্গ, মদন মান ভঙ্গ।
স্ত্রীগণ—উন্মাদিনী ব্রজকামিনী উন্মাদ তরঙ্গ।
পুরুষগণ—দৈত্যছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী।
স্ত্রীগণ—ব্রজবিহারী গোপনারী মান-ভিখারী।
নিমাই—জয় রাধে শ্রীরাধে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। যবনিকা পতন হইল। কনসার্ট বাজিতেছে।

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুকণ্ঠে গান গাইতেছেন—

আর ঘুমাইওনা মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে আপনারে ভুলে গেলে
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন ॥
রয়েছো অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দে হের প্রাণে
তম পরিহরি হের তরুণ তপন ॥

মুকুন্দ বড় সুকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা করিতেছেন।

নিমাই বাটীতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন। আগে শচীর সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন পুত্র আমার গৃহধর্মে মন দেয় না।

যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী।

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন। শচী শ্রীবাসকে বলিতেছেন—

আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়
আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়, বলো বলো, এ ভাব কেমনে যাবে?

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—

কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল।
বল প্রভু কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদগদ স্বর। গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন—নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়াছেন। আর বলিতেছেন, 'কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি তো হলো না।

এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন —শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা করে থাকি, আপনারা মিলে দেখেছি সংসারটা ছারখার করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে)—এ সংসারীর শিক্ষা—এও করো, ও-ও করো। সংসারী যখন শিক্ষা দেয়, তখন দুদিক রাখতে বলে।

মাস্টার—আজ্ঞা হাঁ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন—ওহে নিমাই, তোমার তো শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করো, সংসারধর্ম অপেক্ষা কোন ধর্ম প্রধান আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী গৃহীর মতো আচার না করে অন্য আচার কেন করো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) দেখলে? দুই দিক রাখতে বলছে।

মাস্টার—আজ্ঞা হাঁ।

নিমাই বলিলেন আমি ইচ্ছা করে সংসারধর্ম উপেক্ষা করি নাই আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—

> প্রভু কোন হেতু কিছু নাহি জানি,
> প্রাণ টানে কি করি কি করি,
> ভাবি কূলে রই, কূলে আর রহিতে না পারি,
> প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে,
> সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন এমন সময় নিমাই এর সহিত দেখা হইল। নিমাইও তাঁকে খুঁজিতেছিলেন। মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন—

> সার্থক জীবন সত্য মম ফলেছে স্বপন,
> লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে গদগদ স্বরে)—নিমাই বলছে স্বপ্নে দেখেছি।

শ্রীবাস ষড়্‌ভুজ দর্শন করছেন, আর স্তব করছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়্‌ভুজ দর্শন করিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ঈশ্বর-আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাইতেছেন—

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।
দে রে কৃষ্ণ দে কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ ঐভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল

যবনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তস্রোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসীর কানা ছুড়িয়া মারিয়াছেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেখিতেছেন নিতাই—জগাই মাধাইকে কোল দিবেন। নিতাই বলিতেছেন—

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥
বল রে হরিবোল প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল।
তোল রে তোল হরিনামে তোল।
পাবি রে প্রেমের স্বাদ, এবে হরি বলে কাঁদো, হেরবি হৃদয়চাঁদ।
ওরে প্রেমে তোদের যাচি বিলাব প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥

এইবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন। শচী মূর্ছিতা হইলেন। মূর্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, কেবল নয়নের কোণে একবিন্দু জল দেখা দিয়াছে।

অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়িতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আসল নকল এক দেখলাম।

গাড়ি মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা আপনি বলিতেছেন—

"হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ!' আবার বলিতেছেন "প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!'

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৪। শ্রীরামকৃষ্ণ আজ স্টার থিয়েটারে "প্রহ্লাদ চরিত্রে"র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। স্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে, এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত।

আজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাস্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ বসিয়া আছেন। গিরিশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) বা! তুমি বেশ সব লিখেছো।

গিরিশ—মহাশয় ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তোমার ধারণা আছে। সেইদিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায়না। ধারণা চাই। কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটী, ৮০০ টাকা মাহিনা পায়, সকলে বললে খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। ছেলেটি কিসে ভালো জায়গায় বসবে, কিসে সে নাচ দেখতে পাবে, এইজন্য ব্যাকুল। এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না। ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, ওটা কি? —তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা হয় নাই।

গিরিশ—মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না না ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহ্লাদ পাঠশালে লেখাপড়া করিতে আসিয়াছেন। প্রহ্লাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ' এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

প্রহ্লাদকে হস্তীপদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। অগ্নিকুণ্ডে যখন ফেলিয়া দিল তখনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য ভাবিতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলো।

রঙ্গালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরিশ বলিলেন, 'বিবাহ বিভ্রাট' কি শুনবেন? ঠাকুর বলিলেন, 'না, প্রহ্লাদ

চরিত্রের পর ওসব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা ব'লো। বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ বিভ্রাট—সংসারের কথা। যা ছিলুম তাই হলুম। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে।

ঠাকুর গিরিশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। গিরিশ বলিতেছেন, 'মহাশয় কি রকম দেখলেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে কিনা তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল, কল্লোল—নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায় কখনও পিশাচের ন্যায়—শুচি অশুচি ভেদজ্ঞান নেই। কখনও বা জড়ের ন্যায়, কেননা অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন করে অবাক হয়ে থাকে। কখনও বালকের ন্যায় আঁট নাই। বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখনও বাল্যভাব, কখনও পৌগণ্ডভাব ফষ্টি নাষ্টি করে কখনও যুবার ভাব—যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয় তখন সিংহতুল্য।

—তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম আর বেশী তোমায় বললে দলটল থাকবে না। কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম বালকের আমি 'দাস আমি', এতে দোষ নাই।

—যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে ঈশ্বরই জীব জগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।

গিরিশ (সহাস্যে)—সবই তিনি তবে একটু 'আমি' থাকে—কফ দোষ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওতে হানি নাই। ও আমি টুকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি তুমি একটি হলে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য সেবকের ভাব। আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে—ঈশ্বর আছেন, ঐ ঈশ্বর—অর্থাৎ আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য)।

—গোলোকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হলো সেই (ঈশ্বরই) সব হয়েছেন। যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তাঁর ঠিক বোধহয় ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব করছেন।

গিরিশ—মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি জড়, তুমি চেতয়িতা,

যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।

গিরিশ—মহাশয়, আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম ভালো। জমি পাট করা হলে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে কর হয়।

—পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেন। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময় ঝুড়ি কোদাল আনে খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকুয়াতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্য রাখবে।

গিরিশ—আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস করো হয়ে যাবে।

গিরিশ—আমি যে পাপী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।

গিরিশ—মহাশয় আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে সে কি একটু একটু করে আলো হয় ? না একেবারে দপ করে আলো হয় ?

গিরিশ—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার যদি আন্তরিক হয়—আমি কি বলবো। আমি খাই দাই তাঁর নাম করি।

গিরিশ—আন্তরিক নাই কিন্তু ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি ? নারদ, শুকদেব এঁরা হতেন তো—

গিরিশ—নারদাদি তো আর দেখতে পাচ্ছি না—সাক্ষাৎ যা পাচ্ছি—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা বিশ্বাস।

কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে।

গিরিশ—একটি সাধ, অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়। জীবকোটির হয় না।

সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরিলেন, দৃষ্টি ঊর্ধ্ব দিকে—

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)
(অবোধ) মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।

গিরিশ—নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেমন করে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন আমার সঙ্গে এসো—এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল। শিষ্য বললে প্রাণ আটুবাটু কচ্ছিল—যেন প্রাণ যায়। গুরু বললেন দেখ এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে। তাই বলি তিন টান একসঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান সতীর পতির প্রতি টান আর মায়ের সন্তানের প্রতি টান—এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

—ডাকো ডাকো মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে। সেইরূপ ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু দুদিনের জন্য—এইটি পাকা বোধ চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥

আর একটি কথা। কামাদি কুমিরের ভয় আছে।

গিরিশ—যমের ভয় কিন্তু আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না কামাদি কুমিরের ভয় আছে, তাই হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়। বিবেক—বৈরাগ্যরূপ হলুদ।

গিরিশ—এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর ঊর্ধ্ব দৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন—

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি ॥

ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—

তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।

এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্যে কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে—

উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবি রে—

কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে। তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব—সন্তান ভাব, দাসী ভাব আর সখী ভাব। দাসী ভাব, সখী ভাবে অনেকদিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মতো কাপড়, গয়না, ওড়না পরতুম। সন্তান ভাব খুব ভালো। বীরভাব ভালো না। নেড়া নেড়ীদের, ভৈরব ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা। এ ভাবে প্রায়ই পতন আছে।

গিরিশ—আমার এক সময়ে ঐ ভাব এসেছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন।

গিরিশ—ঐ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তাঁকে আমমোক্তারী দাও—তিনি যা করবার করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, মা আর কিছু চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

গিরিশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, তোমার এই অবস্থাই ভালো, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।

ঠাকুর নাট্যালয়ে ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বলিলেন—'আপনি 'বিবাহ বিভ্রাট' দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।'

ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন, 'একি করলে? প্রহ্লাদ চরিত্রের পর বিবাহ বিভ্রাট? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সুক্তনি

অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাহারা দেখিয়া অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে

হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, মা, থাক্ থাক্, মা, থাক্ থাক্। কথাগুলি করুণামাখা।

তাঁহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—সবই তিনি, এক এক রূপে।

এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাদি ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গাড়ির মধ্যে সমাধিমগ্ন হইলেন।

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উত্তরপূর্ব লম্বা বারান্দায় গোপীগোষ্ঠ ও সুবলমিলন কীর্তন শুনিতেছেন। নরোত্তম কীর্তন করিতেছেন। আজ রবিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন ১২৯১, শুক্লাষ্টমী। ভক্তেরা তাঁহার জন্মমহোৎসব করিতেছেন।

গিরিশের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মতো। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢং করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরূপ হয়। গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!

গিরিশ বুঝেছি আপনাকে এখন বুঝছি।

শ্রীযুক্ত রামলালকে [ঠাকুর] বলিতেছেন গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর্ তাহলে থিয়েটার দেখতে পাবি। (হাস্য)।

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন, গিরিশও আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি, আর আমি ওর অনুগত।

গিরিশ—আপনি কারই বা অনুগত নন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওর মদ্দের ভাব (পুরুষভাব) আর আমার মেদীভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের উঁচুঘর, অখণ্ডের ঘর।

গিরিশ বাহিরে তামাক খাইতে গেলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড় লোক। (মাস্টারের প্রতি) আপনার কথা হচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা ?

নরেন্দ্র—আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল। (হাস্য)।

মণি মল্লিক (ঠাকুরের প্রতি)—আপনি না পড়ে পণ্ডিত।

এইবার গিরিশ ঘরে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—হাঁ গা আমার কথা সব তোমরা কি কচ্ছিলে ? আমি খাই দাই থাকি।

গিরিশ—আপনার কথা আর কি বলব। আপনি কি সাধু ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধু টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নাই।

গিরিশ—ফচকিমিতেও আপনাকে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, 'আজ বড় যে রঙ লালপেড়ের বাহার। আমি বললুম, কেশবের মন ভুলাতে হবে তাই বাহার দিয়ে এসেছি

সন্ধ্যা হইল। ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপ দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।

ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া, দাঁড়াইয়া গিরিশের গায় হাত দিয়া গান গাহিতেছেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়—
কালী কালী কালী বলে (আমার) অজপা যদি ফুরায়

গান— এবার আমি ভালো ভেবেছি
ভালো ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা সেই
দেশের এক লোক পেয়েছি।...

গিরিশকে দেখিতে দেখিতে যেন ঠাকুরের ভাবোল্লাস আরও বাড়িতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার গাহিতেছেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।

ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া আবার গাহিতেছেন—

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে
শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গিরিশাদি ভক্তের প্রতি—'ভাবেতে ভরল তনু হরল গেয়ান।' সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এ সব চাই। ভক্তিই সার। সকাম ভক্তি আছে। আবার নিষ্কাম ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি, এও আছে। কেশব সেন ওরা অহেতুকী ভক্তি জানত না, কোনো কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি।

গিরিশ—আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে—এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল হল, কে বলবে?

—লক্ষ্মণ লবকুশকে বললো তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লবকুশ বললে, ঠাকুর সব জানি সব শুনেছি পাষাণী যে মানবী হল, সে মুনিবাক্য ছিল। গৌতমমুনি বলেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন, তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বলো?

—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয়, আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদমামা সকলের মামা। ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।

গিরিশ (সহাস্যে)—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো! আমিও তো তাই বলছি। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বরলাভ হয়। কয়েকজনের জ্ঞান হয় না। ১ম—যার বাঁকা মন, সরল নয়, ২য়—যার শুচিবাই, ৩য়—যারা সংশয়াত্মা।

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষের বসুপাড়ার বাটীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। বেলা ৩টা বাজিয়াছে। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আজ বুধবার ১৫ই ফাল্গুন শুক্লা একাদশী—২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ। গত রবিবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। আজ ঠাকুর গিরিশের বাড়ি হইয়া স্টার থিয়েটারে বৃষকেতুর অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন। কাজ সারিয়া আসিতে মাস্টারের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। তিনি আসিয়াই দেখিলেন,

ঠাকুর উৎসাহের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয়কথা কহিতেছেন।

গিরিশ—আমাদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজ, ভক্তির তম আছে। ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব। ভক্তির তম যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।

গিরিশ (সহাস্যে)—ভক্তির তম আপনিই তো শেখান।

গিরিশ—তাঁকে কি সাধন করে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা রকমে তাঁকে লোকে লাভ করেছে। কেউ অনেক তপস্যা, সাধনভজন ক'রে সাধনসিদ্ধ, কেউ জন্মাবধি সিদ্ধ, যেমন নারদ, শুকদেবাদি এদের বলে নিত্যসিদ্ধ। আবার আছে হঠাৎ সিদ্ধ, হঠাৎ লাভ করেছে। যেমন হঠাৎ কোনো আশা ছিল না, কেউ নন্দ বসুর মতো বিষয় পেয়ে গেছে। আর আছে, স্বপ্নসিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ।

এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাহিতেছেন—

শ্যামাধন কি সবাই পায়

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা সম্মুখে আছেন। কিছু দিন পূর্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশ অনেক কথা বলিয়াছিলেন, এখন শান্তভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তোমার এ ভাব বেশ ভাল, শান্তভাব। মাকে তাই বলছিলাম—মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরিশ (মাস্টারের প্রতি)—আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে। আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করিবেন। বিডন স্ট্রীটে যেখানে পরে মনোমোহন থিয়েটার হয়, পূর্বে সেই মঞ্চে স্টার থিয়েটার অভিনয় হইত। থিয়েটারে আসিয়া বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়াছেন। মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা কাছেই বসিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—নরেন্দ্র এসেছে?

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ।

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুই দিকে দুইজন ধরিয়া বৃষকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে মাংস রন্ধন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-

অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিতেছেন, এইবার এসো, আমরা একসঙ্গে বসে রান্না মাংস খাই। অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারবনা, পুত্রের মাংস খেতে পারব না।

একজন ভক্ত সহানুভূতিব্যঞ্জক অস্ফুট আর্তনাদ করিলেন। ঠাকুরও সেইসঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গমঞ্চের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশ, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রের কাছে গিয়া দাড়াইলেন ও বলিলেন, আমি এসেছি।

কনসার্ট থামিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ কি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের ?

গিরিশ—আজ্ঞা আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'আমাদের' কথাটিই ভালো। 'আমার' বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি, এ সব হীনবুদ্ধি অহংকেরে লোকে বলে।

নরেন্দ্র—সবই থিয়েটার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ ঠিক। তবে কোথাও অবিদ্যার খেলা।

নরেন্দ্র—সবই বিদ্যার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ তবে উটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তি ভক্তের পক্ষে দুই-ই আছে বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই একটু গান গা।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। গান হইয়া গেলে আবার ভক্তসঙ্গে কথা হইতেছে।

গিরিশ—দেবেন্দ্রবাবু আসেন নাই, তিনি অভিমান করে বলেন, আমাদের ভিতরে তো ক্ষীরের পোর নাই, কলায়ের পোর, আমরা এসে কি করব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিস্মিত হইয়া)—কই, আগে উনি ওরকম করতেন না ?

ঠাকুর আবার বিবাহ বিভ্রাট অভিনয় শুনিবেন বক্সে গিয়া বসিলেন। ঝির কথা-বার্তা শুনে হাসিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ শুনিয়া অন্যমনস্ক হইলেন। মাস্টারের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ যা বলছে (অর্থাৎ অবতার) তা কি সত্য ?

মাস্টার—আজ্ঞা ঠিক কথা, না হলে সবার মনে লাগছে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, এখন একটি অবস্থা আসছে, আগেকার অবস্থা উল্টে গেছে।

ধাতুর দ্রব্য ছুঁতে পারছি না।

মাস্টার অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই যে নূতন অবস্থা, এর একটি খুব গুহ্য মানে আছে।

এইবার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাইবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

ঠাকুর কোনো ভক্তের কাছে গিরিশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, রসুন গোলা বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায়? গিরিশও তাই মনে মনে অভিমান করিয়াছেন, যাইবার সময় গিরিশ ঠাকুরকে কিছু নিবেদন করিতেছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—রসুনের গন্ধ কি যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাবে।

গিরিশ—তবে বললেন—'যাবে'?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অত আগুন জ্বললে গন্ধ কন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড়ি হয়ে যায়।

—যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে আমি মুক্ত হয়েছি সে মুক্তই হয়। যে রাতদিন 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বলে সে বদ্ধই হয়ে যায়।

১ মার্চ, ১৮৮৫। নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ভালো আছিস? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস?

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরিশ কয়মাস হইল নূতন আসা যাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ। বাড়িতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। নরেন্দ্র প্রায় যান, হরিপদ, দেবেন্দ্র ও অনেক ভক্ত তাঁর বাড়িতে প্রায় যান, গিরিশ তাঁহাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই কন। গিরিশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিবেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস? কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন গন্ধ একটু থাকবেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার। কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই, অনেক দিন ধরে কামিনী কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়। যেমন

কাকে ঠোকরানো আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

—ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব— নাগকন্যা, দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে। অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।

নরেন্দ্র—গিরিশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া, গাইগরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি হলো, এ তো দামড়া। তখন গাড়োয়ান বললে, মশাই, এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল, তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।

—এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা করছে, একজন আড চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।

—তবে কি এদের ঘৃণা করি? না ব্রহ্মজ্ঞান এখন আনি। তিনি সব হয়েছেন, সকলেই নারায়ণ, সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেশ্যা ও সতীলক্ষ্মীতে কোনো প্রভেদ দেখি না।

নরেন্দ্র—গিরিশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে খুব ভালো। তবে এত গালাগাল মুখ খারাপ করে কেন? সে অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস কিছু নড়ে না, কিন্তু শার্সি খট্ খট্ করে। আমার সে অবস্থা নয়। সত্ত্বগুণের অবস্থায় হৈচৈ সহ্য হয় না। হৃদে তাই চলে গেল, মা রাখলেন না। শেষাশেষি বড বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত। হাঁকডাক করতো।

—গিরিশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিললো?

নরেন্দ্র—আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলো, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু খুব বিশ্বাস। দেখেছিস?

১১ই মার্চ ১৮৮৫—স্কুলের ছুটির পর মাস্টার [বসু বলরাম মন্দিরে] আসিয়া দেখিতেছেন—ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিশ করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(গিরিশের প্রতি)—তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার করে দেখো, সে কি বলে।

গিরিশ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র বলে ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দেখি, শুনি—জিনিসটি, কি ব্যক্তিটি—সব তাঁর অংশ, এ [কথা] পর্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই—Infinity (অনন্ত আকাশ) তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে! তিনি অবতার হয়ে থাকেন—এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হলো, পা টা বা লেজটা ছুলেও গরুটাকে ছোঁয়া হলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময় সময়ে অবতীর্ণ হন।

গিরিশ— নরেন্দ্র বলে তাঁর কি সব ধারণা করা যায়? তিনি অনন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হলো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হলো। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শ করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (সকলের হাস্য)। তোমার পাটা যদি ছুই, তোমায় ছোঁয়াই হলো। (হাস্য)। যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তাহলে সাগর স্পর্শ করাই হলো। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে)—যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে ঊর্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

গিরিশ—নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙমনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, এ মনের গোচর নয় বটে—শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, আমায় ব'লেছে, 'গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে অত বিশ্বাস, এখন আমি আর কি বলবো অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নাই।'

গিরিশ (সহাস্যে)—মহাশয়। আমরা সব হল্ হল্ ক'রে কথা কচ্ছি কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়। কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—মুখহলসা ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল বড়ই মন্দকারী। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)—কিন্তু ইনি তা নন—ইনি গম্ভীরাত্মা। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ—মহাশয়। শ্লোকটি কি বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই কটি লোকের কাছে সাবধান হবে। প্রথম মুখহলসা—হল্ হল্ করে কথা কয়, তারপর ভেতরবুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না, তারপর কানতুলসে—কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য, দীঘল ঘোমটা নারী—লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে সন্নিপাতিক হয়। (হাস্য)।

ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় একঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন—কি বলেন শুনিবো, কি করেন দেখিবেন

শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিতেছেন—

'কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আহা, বেশ গানটি। তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

একজন ভক্ত—হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ গানটি খুব উতরেছে।

শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসিছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্যবদনে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি তো কি? ইনি (গিরিশ) তোমার চেয়ে।

সুরেশ (হাসিতে হাসিতে)—আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি)—আচ্ছা, মহাশয়। আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখা-

পড়া করি নাই তবু লোকে বলে বিদ্বান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে—খুব আধার। (মাস্টারের প্রতি)—কেমন গা?

মাস্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

গিরিশ—কি? বিদ্যা? ও অনেক দেখেছি। ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—এখানকার ভাব কি জান? বই শাস্ত্র এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

—একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দিবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক জন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই—পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, আর একখানা কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। এখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড় আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

—শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ।

—শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী কাঞ্চনে মনে মনে ভালোবাসা আছে, তার শাস্ত্রধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে)—মহাশয়! পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (হাস্য)। কেবল খুঁজছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

—(গিরিশের প্রতি)—নরেন্দ্র খুব ভালো, গাইতে বাজাতে, পড়ায় শুনায়,

বিভায় এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ। (মাস্টারের প্রতি)—কেমন গা, খুব ভালো নয়?

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ, খুব ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাস্টারের প্রতি)—দেখ ওর (গিরিশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাস্টার অবাক হইয়া গিরিশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাস্টার কিন্তু দেখিলেন যেন পূর্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ—পরমাত্মীয়—যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটি মণি।

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাত হবে না?

গিরিশ—না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমার আজ থিয়েটারে যেতে হবে। তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

গিরিশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা, ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার বলরামও প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরিশের বাড়ি যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন—'বলরাম! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।'

দুতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতে ভগবদ্ভাবে বিভোর। যেন মাতাল। সঙ্গে নারাণ ও মাস্টার। পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেকে। একজন ভক্ত বলিতেছেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন 'একজন হলেই হলো।' নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সস্নেহে বলিলেন, হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি আপনি চলে যাবো।'

বোসপাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরিশের বাড়ি। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মতো পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র বলরামের বাড়িতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য মনের অতীত নহেন, তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করছেন। এই কি দেখছেন—"যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়?"

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। 'নরেন্দ্র', 'নরেন্দ্র' বলিয়া পাগল। কৈ, নরেন্দ্র

সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর তো কথা কহিতেছেন না।

গিরিশের বাড়ি প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন। নরেন্দ্রকে বলছেন, 'ভালো আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।' —কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা।

দ্বারদেশে গিরিশ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দুতলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত। নরেন্দ্র, গিরিশ, রাম, হরিপদ, চুণি বলরাম, মাস্টার—অনেকে আছেন।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরিশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন আর মানবদেহ ধারণ করে মর্ত্য লোকে আসেন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দু'জনের বিচার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বলিতেছেন, 'একটু ইংরাজীতে দুজনে বিচার করো আমি দেখবো।'

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজীতে হইল না, বাংলাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজী কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—ওরও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ। তিনি কোনোখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনোখানে বিদ্যাশক্তির। কোনো আধারে শক্তি বেশী, কোনো আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রাম—এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) না, না, ওর একটা মানে আছে।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র—তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা একই, ঋষিরা শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—মানুষে অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র—কেন ? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক। ইনফিনিটি—তার কি অংশ হয় ? আবার হ্যামিলটন কি বলেন ? হার্বার্ট স্পেনসার কি বলেন ? টিণ্ডেল, হাক্সলে বা কি বলে গেছেন, এই কথা হতে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—দেখ ঈগুনো আমার ভাল লাগছে না। আমি সব তাই দেখছি। বিচার আর কি করবো ? দেখছি তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়। (গিরিশের প্রতি)—তার কি করলে বলো দেখি।

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে)—ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আমি যা দেখছি সাক্ষাৎ—তার কি বিচার করবো ? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন। তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক রাখতে হবে, জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ—থিয়েটারগুলো ছোড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্ছে।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে)—এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে। আবার থিয়েটার টানে।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে যাইবেন। গাড়িতে উঠিবেন। ভক্তেরা গাড়ির কাছে দাড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাহাকে উঠানো হইতেছে। এখনো গর্গবমাতোয়ারা।

গাড়ি চলিয়া গেল। ভক্তেরা যে যার বাড়ি যাইতেছেন।

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছবি—স্মৃতি-মধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখ স্বপ্নের ন্যায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে-ভাবিতে মণি [শ্রীম] সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন, কি ভালবাসা গিরিশকে। গিরিশ থিয়েটারে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়িতে খেতে হবে। শুধু তা নয়! এমনও বলছেন না যে, ত্যাগ করো—আমার জন্য গৃহ পরিজন, বিষয়-কর্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করো। বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হলে, তীব্র বৈরাগ্য না হলে, ছাড়লে কষ্ট হবে।

আর গিরিশের কি বিশ্বাস। দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, 'প্রভু তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরিশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মতো কে শিক্ষা দেবে কে জানিয়ে দেবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী করবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা যাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগেনা, তাঁরা কি করে কাটাবেন?

৬ এপ্রেল ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়ির বৈঠকখানায় ৬ এপ্রিল সোমবার ১৮৮৫, ভক্তের মজলিশ করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘরটি একতলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাস্টার, গিরিশ, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্তরা কাছে বসিয়া আছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ। স্পন্দহীন দেহ। অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন। ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ, কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

(গিরিশের প্রতি)—তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো, তা হউক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

—উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

—তুমি দিনদিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিনদিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো না—তা হউক, তোমার এমনিই হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—মা। যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে যাওয়া কি বাহাদুরি? মা। মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে তো তোমার মহিমা।

একজন ভক্ত—রামবাবু আপনার কথা লিখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি লিখেছে ?

ভক্ত—'পরমহংসের ভক্তি'—এই বলে একটি বিষয় লিখছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে।

গিরিশ (সহাস্যে)—সে আপনার চেলা বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার চেলা-টেলা নাই। আমি রামের দাসানুদাস।

১২ এপ্রিল, ১৮৮৫। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। গিরিশ, মাস্টার, বলরাম—ক্রমে ছোট নরেন পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুয্যে ইত্যাদি—অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিযাছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন।

আজ ১লা বৈশাখ চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ১২ই এপ্রিল রবিবার ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ, বেলা ৩টা হইবে।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব—এই কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেটে চলে যাওয়া—এই সব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না।

—গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মতো।—ছার টাকাকড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ করে রাখা ভালো নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—ঘুটে রে, গোবর রে, তক্তাপোশ, দুখানা বাসন হয়েছে বিছানা মাদুর, তাকিয়া—কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে। অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে। সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ।

কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন এখনও তোমাদের দেখছি—কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ,

কখন এসেছ, কোথায় এসেছ, এসব কিছু মনে নাই।

ঠাকুর কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন— 'জল খাব'। সমাধিভঙ্গের পর মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এইকথা প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ নূতন আসিতেছেন, জানেন না, তাই জল আনিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, 'না বাপু, এখন খেতে পারবো না।'

গিরিশ মাস্টার প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর নিজের মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—এই দেহ মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা বড় হাতি কুঁড়েঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়! হয়তো ভেঙেচুরে যায়। ঈশ্বরের বিরহ অগ্নি সামান্য নয়। আমি এই অবস্থায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। নড়তে চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁশ হলে বামনী আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপরে হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যেসব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিছল।

—যখন সেই অবস্থা আসতো শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে ফাল চালিয়ে যেত। প্রাণ যায় প্রাণ যায়—এই করতাম। কিন্তু তারপরে খুব আনন্দ।

ভক্তেরা এই মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এতদূর তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না। তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যে)। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে। গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়—সামলাতে পারি নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল।—(সকলের হাস্য)। কামিনী কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

গিরিশ—কামিনী কাঞ্চন ছাড়ে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্য প্রার্থনা করো।

ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক। জল ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে—ভালো জল একদিকে পড়ে, বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। এরই নাম বিদ্যার সংসার।

একজন ভক্ত—মহাশয়, নব হুল্লোল বলে এক মত বেরিয়েছে। শ্রীযুক্ত ললিত চাটুয্যে তার ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সবাই মনে করে, আমার মতই ঠিক—আমার ঘড়ি ঠিক চলছে।

গিরিশ (মাস্টারের প্রতি)—পোপ কি বলেন? **It is with our judgements** ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—এর মানে কি গা?

মাস্টার—সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু ঘড়িগুলো পরস্পর মেলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে অন্য ঘড়ি যত ভুল হউক না, সূর্য কিন্তু ঠিক যাচ্ছে। সেই সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

গিরিশ 'কেশবচরিত পড়িতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ঐ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকে লেখা আছে যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু কেশবের সহিত দেখাশুনা হবার পরে তিনি মত বদলাইয়াছেন—এখন পরমহংসদেব বলেন যে, সংসারেও ধর্ম হয়। এই কথা পড়িয়া কোনো কোনো ভক্তরা ঠাকুরকে বলিয়াছেন। ভক্তদের ইচ্ছা যে, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়া কথা হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া ঐ সকল কথা শোনান হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইল। গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা এখনও আছেন। 'কেশবচরিত' গ্রন্থে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের কথা যাহা লেখা আছে, ত্রৈলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন করিবেন, ভক্তেরা ঠিক করিয়াছেন। গিরিশ কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, "আপনি যা লিখেছেন—যে সংসার সম্বন্ধে এঁর মত পরিবর্তন হয়েছে—তা বস্তুত হয় নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এ দিকের আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়।

শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।

ত্রৈলোক্য—সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বলছি—যারা ত্যাগী তাদের কথা বলছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব তোমাদের কি কথা। যারা 'সংসারে ধর্ম, সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভালো লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না—কেবল সেই আনন্দ খুজে খুজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ। একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

ত্রৈলোক্য—সংসার থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দান-ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর। আর দান ধ্যান দয়া কত। নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া।

ত্রৈলোক্য—সংসারে তো ভাল লোক আছে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যদেবের ভক্ত। তিনি তো সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল, যদি আর একটু খেত তাহলে আর সংসার করতে পারত না।

ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাস্টার গিরিশকে জনান্তিকে বলিতেছেন—'তা হলে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয়।'

গিরিশ—তা হলে আপনি যা লিখেছেন একথা ঠিক না?

ত্রৈলোক্য—কেন, সংসারে ধর্ম হয়, উনি কি মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয়, কিন্তু জ্ঞানলাভ করে থাকতে হয়—ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্কসাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকতে পারে। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার—সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে, ঘরে ঘটিবাটিও আছে, হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে, এদের জন্যও ভাবি।

একজন ভক্ত (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনার বইয়েতে দেখলাম, আপনি অবতার

মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম।

ত্রৈলোক্য—তিনি নিজেই প্রতিবাদ করেছেন। পুরীতে যখন অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা 'তিনিই ভগবান' এই বলে গান করেছিলেন, গান শুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য। ইনি যেমন বলেন, ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু ঐশ্বর্য নাই?

গিরিশ—ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ—যে মানুষ দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাঁকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন, গরুর দুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরের অন্য কিছু দরকার নাই, হাত, পা, কি শিং।

ত্রৈলোক্য—তাঁর প্রেমদুগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে। তিনি যে অনন্তশক্তি।

গিরিশ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনি অবতার মানেন?

ত্রৈলোক্য—ভক্ততেই ভগবান অবতীর্ণ। অনন্ত শক্তির Manifestation হয় না—হতে পারে না। কোনো মানুষেই হতে পারে না।

গিরিশ—ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' বলে সেবা করতে পারেন, মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলে কি পূজা করতে পারা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—অনন্ত ঢুকতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? 'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল', যতক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি। 'আমি' গেলে কি রইল তা কেউ জানতে পারে না—মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে। তখন খানিকটা এতে প্রকাশ হয়েছে, আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে—এসব মুখে বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ সাগর। তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে—এক জল—তাও বলবার যো নাই।—কে বলবে?

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তো আনন্দে আছ?

ত্রৈলোক্য—কৈ এখান থেকে উঠলেই আবার যেমন তেমনি হয়ে যাব। এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

ত্রৈলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—"ওদের সঙ্গে বকচো কেন? দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।

—সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে—সব বন্ধ—ছাদের ফুটা দিয়ে একটু আলো আসছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়। সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না, বন্দী হয় না। তাদের 'আমি'—'মোটা আমি' নয়—সংসারী লোকদের মতো। অবতারাদির 'আমি' 'পাতলা আমি।' এ আমির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে—পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে, পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়। এর মানে দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছে হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে, সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।"

২৪ এপ্রিল, ১৮৮৫। ঠাকুর গিরিশের বাড়ি যাইবেন সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া গিরিশ উৎসব করিবেন।

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাস্টারকে বলিতেছেন 'দেখ গো, কি বলে? পরমহংসের ফৌজ আসছে? শালারা বলে কি।' (সকলের হাস্য)।

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গিরিশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিশ অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাও সকলে বসিলেন। গিরিশ, মহিমাচরণ, রাম, ভবনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, বাবুরাম যোগীন দুই নরেন্দ্র, চুনি, বলরাম ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)—গিরিশ ঘোষকে বললুম, তোমার নাম করে, 'একজন লোক আছে—গভীর, [আর] তোমার একহাঁটু জল।' তা এখন যা বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি। তোমরা দুজনে বিচার করো, কিন্তু রফা কোরো না। (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণ ও গিরিশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ভ হইতে না হইতে

রাম বলিলেন—"ওসব থাক—কীর্ত্তন হোক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—না, না, এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশ-ম্যান, এরা কি বলে দেখি।

মহিমাচরণের মত—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারে, সাধন করিতে পারিলেই হইল। গিরিশের মত—শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার সাধন করুক, অবতারের মতো হইতে পারিবে না।

মহিমাচরণ—কি রকম জানেন? যেমন বেলগাছটা আমগাছ হতে পারে, প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায়।

গিরিশ—তা মশাই যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন আর যাই বলুন, সেটি হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হতে পারেন। যদি সেইসব ভাব, মনে করুন রাধার ভাব, কারু ভিতরে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেই ই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাধা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যদি কারু ভিতরে দেখিতে পাই তখন বুঝতে হবে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি।

মহিমাচরণ বিচার বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিলেন না। অবশেষে একরকম গিরিশের কথায় সায় দিলেন।

মহিমাচরণ (গিরিশের প্রতি)—হাঁ মহাশয় দুই ই সত্য। জ্ঞানপথ সেও তাঁর ইচ্ছা; আবার প্রেমভক্তি তাঁর ইচ্ছা। ইনি যেমন বলেন ভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পৌঁছান যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি একান্তে)—কেমন ঠিক বলছি না?

মহিমা—আজ্ঞা যা বলেছেন। দুই ই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনি দেখলে ওর (গিরিশের) কি বিশ্বাস। জল খেতে ভুলে গেল। আপনি যদি না মানতে, তা হলে টুটি ছিঁড়ে খেত, যেমন কুকুরে মাংস খায়। তা বেশ হল। দুজনের পরিচয় হলো, আর আমারও অনেকটা জানা হলো।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—একাঙ্গী, কিনা, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্ছে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়—তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা—আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা। সকলের উচ্চ অবস্থা—সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক। গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।

৯ মে, ১৮৮৫। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। আজ শনিবার—বেলা ৩টা—বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী, ৯ই মে, ১৮৮৫।

নরেন্দ্র—Proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।

গিরিশ—বিশ্বাসই Sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত—External World (বহির্জগৎ) বাহিরে আছে—ফিলসফার (দার্শনিকরা) কেউ prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে, irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না। হয়ত বলবে ও বলছে আমি ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই?

গিরিশ—তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।

নরেন্দ্র—অমর past ages-এতে ছিল, প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—অনাদি কি দরকার? অমর হতে হলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (সকলের হাস্য)।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরিশ, মাস্টার প্রভৃতিকে)—শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন করে করি। মহানির্বাণতন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে। আবার বলে, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই। মনুসংহিতায় মনু লিখেছেন মনুরই কথা।

মোজেস লিখছেন পেন্ট্যাটিউক, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা। সাংখ্যদর্শন বলেছেন, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য। তা বলে এসব নাই, বলছি না। বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও। শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোন্‌টা লব? হোয়াইট্ লাইট্ (শ্বেত আলো) রেড মিডিয়ম্ এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়, গ্রীন মিডিয়ম এর মধ্য দিয়ে এলে গ্রীন দেখায়।

একজন ভক্ত—গীতা ভগবান বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, এক খানি ছোট গীতা থাকবে।

একজন ভক্ত—গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন।

নরেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না ইঁয়ে বলেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শুনিতেছেন।

ভক্ত—ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম করবো। এ কর্ম ত্যাগ করলে হবে না।

গিরিশ—সুলভ সমাচারে ঐ রকম লিখেছে দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যেসব কর্ম—তাই করে উঠিতে পারা যায় না আবার অন্য কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া মাস্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, 'ও যা বলছে তাই ঠিক।'

মাস্টার বুঝিলেন, কর্মকাণ্ড বড় কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারাদির প্রতি)—ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি। ন্যাংটা বলতো 'আরে মন বিলাতে নাহি।

—মনে করো দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। ক'টা সূর্য দেখা যাচ্ছে?

ভক্ত—দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে করো, একটা ঘট ভেঙে দিলে, এখন ক'টা সূর্য দেখা যায়?

ভক্ত—নয়টা, একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা নয়টা ঘট ভেঙে দেওয়া গেল, কটা সূর্য দেখা যাবে?

ভক্ত—একটা প্রতিবিম্ব সূর্য। একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাঙলে কি থাকে?

গিরিশ—আজ্ঞা, ঐ সত্য সূর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। কি থাকে, তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কি করে জানবে। সমাধিস্থ হলে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না।

২৩ মে, ১৮৮৫। ঠাকুর [অশ্বিনীকুমার দত্তকে]—গিরিশ ঘোষকে চেনো?

অশ্বিনীকুমার—কোন গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর—হাঁ।

অশ্বিনীকুমার—দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠাকুর—ভাল লোক।

অশ্বিনীকুমার—শুনি মদ খায় নাকি?

ঠাকুর—খাক্ না, খাক্ না—ক'দিন খাবে?

১৫ জুলাই, ১৮৮৫। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র মুখুজ্যে বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন।

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনার কোষ্ঠী দেখছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি, চন্দ্র, বুধ—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।

গিরিশ—কুম্ভ রাশি। কর্কট যার বুনে বা। আর বৃষ,—সিংহে চৈতন্যদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটি সাধ ছিল। প্রথম ভক্তের রাজা হব, দ্বিতীয়—শুটকে সাধু হবো না।

গিরিশ—আপনার সাধন করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন—পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা। স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ দুই-একটি বন্ধু সঙ্গে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কিছু পান করিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন। একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন—ওরে একে তামাক খাওয়া।

গিরিশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা করতে পেলুম না। (এই কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিতেছেন যে, দু একটি ভক্ত কাঁদিতেছেন।) দাও বর ভগবন, এক বৎসর তোমার সেবা করবো? মুক্তি ছড়াছড়ি—প্রস্রাব করে দি। বলো, তোমার সেবা এক বৎসর করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার লোক ভাল নয়—কেউ কিছু বলবে।

গিরিশ—তা হবে না, বলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার বাড়িতে যখন যাবো—

গিরিশ—না, তা নয়। এইখানে করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(জিদ্ দেখিয়া)—আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঠাকুরের গলায় অসুখ। গিরিশ আবার কথা কহিতেছেন—বলো আরাম হয়ে যাক্।—আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো। কালী। কালী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার লাগবে।

গিরিশ—ভাল হয়ে যা। (ফু)। ভাল যদি না হয়ে থাকে তো—যদি আমার ও পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে। বলো ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—যা বাপু আমি ও সব বলতে পারি না। রোগ ভালো হবার কথা মাকে বলতে পারি না। আচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

গিরিশ—আমায় ভুলানো। [বলো] তোমার ইচ্ছায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছি, ও কথা বলতে নেই। ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান—তা বলে ওসব কথা বলায় অপরাধ হয়—ওকথা বলতে নাই।

গিরিশ—বলো, ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরিশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হ্যাগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা?' কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—'এবার বুঝি বাঙলা উদ্ধার।' কোনো কোনো ভক্ত ভাবিতেছেন, 'বাঙলা উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার।'

গিরিশ আবার বলিতেছেন—ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝছো? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন তাদের উদ্ধার করবার জন্য।

গাড়োয়ান ডাকিতেছিল। গিরিশ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন—ছাখো কোথায় যায়—মারবে না তো।

মাস্টারও সঙ্গে-সঙ্গে গমন করিলেন।

গিরিশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন—ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ চিন্তা না হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি পবিত্র তো আছো।—তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি। তুমি তো আনন্দে আছ ?

গিরিশ—আজ্ঞা, না। মন খাবাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশ আবার বলিতেছেন—ভগবন্, আশ্চর্য হচ্ছি যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি। এমন কী তপস্যা করিছি যে, এই সেবার অধিকারী হয়েছি ?

গিরিশ—হ্যাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট,—গুরু রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা ? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয় গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইষ্ট)। এই কথা বলেই ইষ্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

একজন ভক্ত—গুরুর মাথা শিষ্যের পা।

গিরিশ—(আনন্দে) হাঁ।

নবগোপাল—শোনো মানে। শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিস, আর গুরুর পা শিষ্যের জিনিস। শুনলে ?

গিরিশ—না ও মানে নয়, বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই শিষ্যের পা।

নবগোপাল—সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে তো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দু' রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লির ছা'র স্বভাব। সব নির্ভর —মা মা করে। বিল্লির ছা কেবল মিউ মিউ করে, কোথায় যাবে, কি করবে— কিছুই জানে না, মা কখন হেঁসেলে রাখছে—কখন বা বিছানার উপরে রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়। আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্ত।

১৮ অক্টোবর, ১৮৮৫। ঠাকুর মাস্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্বদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাস্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সঙ্গে কি কি কথা হল ?

মাস্টার—গিরিশ ঘোষের ভারী খবর নেন। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, গিরিশ

ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে? তাঁর উপর বড় চোখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি গিরিশ ঘোষকে ওকথা বলেছিলে?

মাস্টার—আজ্ঞা হাঁ, বলেছিলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি বললে?

মাস্টার—তিনি বললেন—তোমরা যেকালে বলছো সেকালে ঠাকুরের কথা বলে মানি—কিন্তু আর জোর করে কোনও কথা বলবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(আনন্দের সহিত)—কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন।

ডাক্তার— অবতার আবার কি। যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব। হাঁ, তবে Reflection of God's Light (ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে প্রকাশ হয়ে থাকে) তা মানি।

গিরিশ—(সহাস্যে) আপনি God's Light দেখেন নি—

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্বে একটু ইতস্তত করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধু বসিয়া ছিলেন—আস্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার—আপনিও তো প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরিশ—I see it! I see the light! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার prove (প্রমাণ) করবো—তা না হলে জিব কেটে ফেলবো।

২২ অক্টোবর ১৮৮৫। আশ্বিন শুক্লা চতুর্দশী। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিন মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া, তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্তী সেই শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি গলায় ক্যান্সার। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ। শ্যামপুকুরস্থিত একটি দ্বিতল গৃহমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, দু'তলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—তুমি বড় বদলোক। আমায় কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—কি বলছে, আমি বুঝতে পারছি না।

মাস্টার—ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—তুমি কিছু বলো না। এ (ডাক্তার) অবতার মানছে না।

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)—অহঙ্কারের দরুন আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভুষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখলে যে রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিলে, রামের শরণাগত হল। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেললেন। ভুষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে। অহঙ্কার চূর্ণ হলে তবে কাক ভুষণ্ডী জানতে পারলে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মতো মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত, জীব জন্তু, গাছ ইত্যাদি

ডাক্তার—যেটুকু ভালো, বিশ্বাস করলুম। ব'লে দিলেই চুকে যায়, কোনো গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলব? প্রথমে দেখ বালীবধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এ তো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরিশ ঘোষ—মহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার—তারপর দেখ সীতাবর্জন।

গিরিশ—মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর সায়েন্সে (ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়। (সকলের হাস্য)।

—একটা গল্প শোনো। একজন এসে বললে, ওহে। ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে। যাকে ওকথা বললে, সে ইংরাজি লেখাপড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতে হবে। আপনাকে

মানুষ মানতে দেব না। বলতে হবে Demon or God (হয় শয়তান, নয় ঈশ্বর)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার এই সব। ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয়! কি বলেন? কুকুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার—রাম বলো! তাও কখনো হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ— বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক পাতা, খোসা, ভুসি, যা দাও, গব গব্ করে খায়, সে গর হুড হুড করে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার—কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরী কাশি (whooping cough)—আমি দেখতে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল সে গাধার দুধ সে মেয়েটি খেতো। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলো গো। তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিছিলো তাই আমার অম্বল হয়েছে। (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে)—জাহাজের কাপ্তেনের বড মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (Blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)—আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন, কই, রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না?

ডাক্তার—আর ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, কর্মনাশা বলে একটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে কর্মনাশ হয়ে যায়—সে ব্যক্তি আর কোনো কর্ম করতে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (মাস্টার, গিরিশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—দেখ আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে করো, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে করো, তা হলে আমি তোমাদের।

২৩ অক্টোবর, ১৮৮৫। ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাটু, শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, গিরিশ প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। গিরিশের সঙ্গে থিয়েটারের শ্রীযুক্ত রামতারণ আসিয়াছেন—গান গাইবেন।

গিরিশ—পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, 'আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর মনটা আনবেন—তা হলে অসুখ সেরে যাবে।' ইনি ভাবে দেখলেন যে, শরীরটা যেন ধ্যাড ধ্যাড করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেকদিন হল—আমার তখন খুব ব্যামো। কালীঘরে বসে আছি, মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু ঠিক আপনি বলতে পারলাম না। বললুম মা হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে। আর বেশী বলতে পারলাম না—বলতে বলতে অমনি দপ করে মনে এলো সুসাইট্ (Asiatic Society's Museum)। সেখানকার তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ (Skeleton)। অমনি বললুম—মা তোমার নামগান করে বেড়াব—দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও, সেখানকার মতো। সিদ্ধাই চাইবার জো নাই।

এইবার রামতারণের গান হইতেছে—

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী।
বাজেনা আলগা তারে, টানে ছেঁড়ে কোমল তার॥

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—গান এসব কি অরিজিন্যাল (নূতন)?

গিরিশ—না, Edwin Arnold-এর thought (আর্নল্ড সাহেবের ভাব লয়ে গান)।

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাহিতেছেন—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই?

এই গান শুনিতে-শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

২৬ অক্টোবর, ১৮৮৫। সোমবার, ১১ই কার্তিক—২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

বেলা ১টা। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। ডাক্তার ও মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসনগ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেজোবাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে করো না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মানছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটা কথা আছে—মানুষ কি করবে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো।

ডাক্তার—তুমি কি মনে করেছ, অমুক তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানবো? তবে তোমায় সম্মান করি বটে। তোমায় রিগার্ড করি, মানুষকে যেমন রিগার্ড করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি মানতে বলছি গা?

গিরিশ ঘোষ—উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—তুমি কি বলছো—ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি বলছি। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে?

ডাক্তার—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকেদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বলাচ্ছেন তাই বলি। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার—যন্ত্র তো বলছো, হয় তাই বলো নয় চুপ করে থাকো। সবই ঈশ্বর।

গিরিশ—মশাই যা মনে করুন, কিন্তু তিনি করান তাই করি। A single step against the Almighty Will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

ডাক্তার—Free Will তিনিই দিয়েছেন তো। আমি মনে করলে ঈশ্বরচিন্তা করতে পারি, আবার না করলে না করতে পারি।

গিরিশ—আপনার ঈশ্বরচিন্তা বা অন্য কোনো সৎকাজ ভালো লাগে বলে করেন। আপনি করেন না—সেই ভালো লাগাটা করায়।

ডাক্তার—কেন, আমি কর্তব্যকর্ম বলে করি—

গিরিশ—সেও কর্তব্যকর্ম করতে ভালো লাগে বলে।

ডাক্তার—মনে করো একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে, তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্তব্য বোধে—

গিরিশ—ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান, আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেইসঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেইসঙ্গে আনন্দ

হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে-খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কাণা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এইরকম ক্রমে-ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

ডাক্তার—কিন্তু আগুন তাপও দেয়, আর লাইট ও দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে কিন্তু উত্তাপে পা পুড়ে যায়। ডিউটি করতে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে।

মাস্টার (গিরিশের প্রতি) পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—ডিউটি শুষ্ক।

ডাক্তার—কেন?

গিরিশ—তবে সরস। (সকলের হাস্য)।

মাস্টার—বেশ একবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়ল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—সরস নচেৎ ডিউটি কেন করেন?

ডাক্তার—এইরূপ মনের ইনক্লিনেশন (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাস্টার (গিরিশের প্রতি)—'পোদ্দা স্বভাবে টানে।' (হাস্য)। যদি একদিকে ঝোঁকই (ইনক্লিনেশন) হল, Free Will কোথায়?

ডাক্তার—আমি Free (স্বাধীন) একেবারে বলছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর ফ্রি। দড়ি টান পড়লে আবার—।

গিরিশ—Free Will কেমন করে আপনি জানলেন?

ডাক্তার—Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it।

গিরিশ—Then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি যে আমরা পরতন্ত্র)। (সকলের হাস্য)।

২৭ অক্টোবর, ১৮৮৫। বেলা সাড়ে পাঁচটা। আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার—আমি থাকতে উনি (গিরিশবাবু) আসবেন না! যাই চলে যাব যাব হয়েছি অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য)।

গিরিশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞানসভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমায় একদিন সেখানে লয়ে যাবে ?

ডাক্তার—তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বটে ?

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—আর সব করো—but do not worship him as God (ঈশ্বর বলে পূজা করো না)। এমন ভাল্লা লোকটার মাথা খাচ্ছ!

গিরিশ—কি করি মহাশয় ? যিনি এ সংসার সমুদ্র ও সন্দেহ সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি করবো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয় ?

ডাক্তার—গু'র জন্য হচ্ছে না। আমারও ঘৃণা নাই। একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেললে। সকলে নাকে কাপড় দিলে। আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আর মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি সেও যা আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা করব ? আমি কি এঁর পায়ের ধুলা নিতে পারি না ?—এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরিশ—Angels (দেবগণ) এই মুহূর্তকে ধন্য ধন্য করছেন

ডাক্তার—তা পায়ের ধুলা লওয়া কি আশ্চর্য। আমি যে সকলেরই নিতে পারি। —এই দাও। এও দাও। (সকলের পায়ের ধুলা গ্রহণ)।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—এঁকে আমরা ঈশ্বরের মতো মনে করি। কিরকম জানেন ? যেমন ভেজিটেবল্ ক্রিয়েসন (উদ্ভিদ) ও অ্যানিম্যাল ক্রিয়েসন্ (জীব জন্তুগণ)—এদের মাঝামাঝি এমন একটি পয়েন্ট (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man world (নরলোক) ও God world (দেবলোক)—এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।

ডাক্তার—ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র—আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) বলছি।

ডাক্তার—ওসব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভালো নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends (যারা আমার পরম বন্ধু) আমাকে কঠোর নির্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—সে কি !—এরা তোমায় কত ভালবাসে। তুমি আসবে বলে বাসকসজ্জা করে জেগে থাকে।

গিরিশ—Every one has the greatest respect for you (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে)।

ডাক্তার—আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহমমতাশূন্য)—কেননা আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।

গিরিশ—তবে মহাশয়। আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at least out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রতি অন্তত কৃপা করে)—এই মনে করে যে তারা আপনাকে বুঝতে পারছে না।

ডাক্তার—বলবো কি হে। তোমাদের চেয়েও আমার feelings woked up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)। (নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude — (আমি একলা একলা বসে কাঁদি)।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ভালো, তুমি ভাব হলে লোকের গায় পা দাও, সেটা ভালো নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি জানতে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কিনা।

ডাক্তার—ওটা ভালো নয়, এটুকু তো বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায় কি বলবো ? সে অবস্থার পর এমনি ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্য। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করবো ?

ডাক্তার—ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does কাজটা sinful (অন্যায়) এটি বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই তো খুব শঠ (বুদ্ধিমান), তুই বল না, একে বুঝিয়ে দে না।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয়। আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সেজন্য দুঃখিত হননি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও-কখনও ভাবেন। আপনার যখন কলিক (শূলবেদনা) হয়েছিল তখন আপনার কি রিগ্রেট (দুঃখ) হয় নাই কেন রাত জেগে এত পড়তুম ? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ ? রোগের জন্য রিগ্রেট (দুঃখ কষ্ট) হতে পারে, তা বলে জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না।

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া, গিরিশের প্রতি)—তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলা দাও। (গিরিশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—আর এক কথা দেখুন, একটা Scientific discovery (জড়বিজ্ঞানে সত্য) বাহির করবার জন্য আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) করতে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all Sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান)—এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) করবেন না ?

ডাক্তার—যত religious reformer (ধর্মাচার্য) হয়েছেন, যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ, শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—বলে 'আমি যা বললুম, তাই ঠিক!' এ কি কথা!

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয় সে দোষ আপনারও হচ্ছে। আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—We offer to him worship bordering on Divine worship (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

৬ নভেম্বর, ১৮৮৫। বেলা আন্দাজ ২টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে অধ্যাপক নীলমণি। ঠাকুরের কাছে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। গিরিশ কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা (মণীন্দ্র), লাটু, মাস্টার, অনেকে।

ডাক্তার গিরিশকে বলিতেছেন—তোমার ঐ গানটি বেশ—বীণের গান—বুদ্ধ চরিতের।

ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন—

আমার এই সাধের বীণে,
যত্নে গাঁথা তারের হার।

গান—জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই

শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা, পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ঠাকুরের সম্মুখে

ভক্তেরা আনিয়াছেন। ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শশী, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

ঠাকুর বলিতেছেন, 'ধুনা আনো।' কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়া [ঠাকুর] বলিতেছেন, 'একটু সবাই ধ্যান করো'। ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরিশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাস্টারও গন্ধপুষ্প দিলেন। তার পরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে 'জয় মা। জয় মা!' ধ্বনি করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল। দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ বাহ্যশূন্য। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতরে আবির্ভূতা হইলেন! সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবারে ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। আর একজন গান গাহিয়া স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাহিতেছেন।

গিরিশ স্তব করিতেছেন

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুর সমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণযুগল উরসে বিরাজে॥
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে॥

আবার গাহিতেছেন —

দীনতারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন পালন নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা, সর্বস্বরূপিণী।

১৬ এপ্রিল, ১৮৮৬। কাশীপুর বাগানের পূর্বধারে পুষ্করিণীর ঘাট। চাঁদ উঠিয়াছে। উদ্যানপথ ও উদ্যানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়াছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে দ্বিতল গৃহ। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পুষ্করিণীর ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে। কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শয্যার উপর বসিয়া আছেন। একটি-দুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন বা এ ঘর হইতে ও-ঘর যাইতেছেন। ঠাকুর অসুস্থ, চিকিৎসার্থে বাগানে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সেবার্থ সঙ্গে আছেন। পুষ্করিণীর ঘাট হইতে নীচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহার আলো দেখা যাইতেছে। সে ঘরটি দক্ষিণদিকের ঘর। মাঝের আলোটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘর হইতে আসিতেছে। মা ঠাকুরের সেবার্থ আসিয়াছেন। তৃতীয় আলোটি রান্নাঘরের। সেই ঘর গৃহের উত্তরদিকে। উদ্যান মধ্যস্থিত ঐ দুতলা বাড়ির দক্ষিণপূর্ব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে গিয়াছে। পূর্বাস্য হইয়া ঐ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের দুই ধারে, বিশেষত দক্ষিণপার্শ্বে, অনেক ফল ফুলের গাছ।

চাঁদ উঠিয়াছে। পুকুরঘাটে গিরিশ, মাস্টার, লাটু, আরও দুই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে। আজ শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল ১৮৮৬, ৪ঠা বৈশাখ, ১২৯৩। চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশ ও মাস্টার ঐ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাস্টার—কি সুন্দর চাঁদের আলো। কত কাল ধরে এই নিয়ম চলছে।

গিরিশ—কি করে জানলে?

মাস্টার—প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature)। আর বিলাতের লোকেরা নূতন নূতন নক্ষত্র টেলিস্কোপ দিয়ে দেখেছে। চাঁদে পাহাড় আছে দেখেছে।

গিরিশ—তা বলা শক্ত, বিশ্বাস হয় না।

মাস্টার—কেন, টেলিস্কোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায়।

গিরিশ—কেমন করে বলবো, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোনো জিনিস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আসতে আসতে হয়তো অমন দেখায়।

গিরিশ, লাটু, মাস্টার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। সেবার্থ শশী ও আরও দু'একটি ভক্ত ঐ ঘরে ছিলেন, ক্রমে বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইহারাও আসিলেন।

ঘরটি বড। ঠাকুরের শয্যার নিকট ঔষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসাদি রহিয়াছে। ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই দ্বারের সামনাসামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া দক্ষিণের ছোট ছাদটিকে যাওয়া যায়। সেই ছাদের

উপর দাড়াইলে বাগানের গাছপালা, চাঁদের আলো, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়।

আজ ঠাকুরের অসুখ কিছু কম। ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাস্টারকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিরিশকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—ভালো আছ? (লাটুর প্রতি) এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন—কিছু জলখাবার এনে দে।

লাটু—পান টান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে।

ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়ে দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন। ভক্তরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরিশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—জলখাবার কি এলো?

গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তার পর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন—বেশ কচুরি।

গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন—এখানে বেশ জল আছে।

ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন—ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর। বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কি না। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভালো জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ জলই দিলেন।

গিরিশ খাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন।

ঠাকুর সর্বদা কথা কহিতে পারেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের ওষ্ঠাধর অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, পরিবারদের খাওয়াদাওয়া কিরূপে হবে—তাদের

কিসে চলবে ?"

গিরিশ—তা কি করবেন জানি না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিরিশ খাবার খাইতে খাইতে কথা আরম্ভ করিলেন।

গিরিশ—আচ্ছা, মহাশয়—কোন্‌টা ঠিক ? কষ্টে সংসার ছাড়া, না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—গীতায় দেখনি ? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যে জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বরলাভ হয়। যারা কষ্টে সংসার ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

—সংসারী জ্ঞানী কিরকম জানো? যেমন শার্সির ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুই দেখতে পায়।

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—কচুরি গরম আর খুব ভালো।

মাস্টার (গিরিশের প্রতি)—ফাগুর দোকানের কচুরি বিখ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিখ্যাত।

গিরিশ (খাইতে খাইতে, সহাস্যে)—বেশ কচুরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লুচি থাক, কচুরি খাও। (মাস্টারকে) কচুরি কিন্তু রজোগুণের।

গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নীচু হয় কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে থাকতে গেলেই ওইরকম হয়। কখনও উঁচু কখনও নীচু।

ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে, কেবল হরিরস পান করতে পারে। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু পাবে বলে। অন্য কোনো জিনিস মৌমাছির ভালো লাগে না।

গিরিশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাতে সব মন হয়।

অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে বলে এসো, আজ আর কিছু না খায়।

গিরিশ পুনরায় ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—রাখাল টাখাল এখন বুঝেছে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর

বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই।

গিরিশ—মহাশয়, ওসব আমি বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী কি ত্যাগী, সব্বাইকে ভালো করে দিতে পারেন। মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সার না থাকলে চন্দন হয়না। শিমূল ও আরও কযটি গাছ, এরা চন্দন হয়না।

গিরিশ—তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে এরূপ আছে।

গিরিশ—আপনার সব বে আইনি।

ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন। মণির হাতে পাখা এক একবার স্থির হইয়া যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হা, তা হতে পারে, ভক্তি নদী ওথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানেনা। দুর্বা তোলে তা বাছে না যা হাতে আসে তাই লয়। তুলসী তোলে পড়পড় করে ডাল ভাঙে। আহা কি অবস্থা গেছে।

বিজয়ের [বিজয় গোস্বামী] সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে একটি পাগলের ন্যায় লোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য উপদ্রব করে। ভক্তদের সেইজন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি)—পাগলীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথা ব্যথা করছে। (সকলের হাস্য)।

—আর একদিন গিছলো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, 'দয়া করলেন না?' আমি উদার বুদ্ধিতে খাচ্ছি। তারপর বলছে, 'মনে ঠেললেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোর কি ভাব?' তা বললে, 'মধুরভাব।' আমি বললুম, 'আরে আমার যে মাতৃযোনি। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।' তখন বলে, তা আমি জানি না।' তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, 'ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে, শোন্ দেখি।' ওর এখনও সেই ভাব আছে।

গিরিশ—সে পাগলী—ধন্য। পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক্, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে। সে যে-ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ

হবে না।

—মহাশয়, কি বলব। আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি। আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি। আর কি বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র

[স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ থেকে সংকলিত]

বকলমা কাহিনী

শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর একদিন তাঁহাকে সর্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—এখন থেকে আমি কি করব?

ঠাকুর—যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চলো, তারপর যখন একদিক ভাঙবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো। এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার যে কাজ তাহাতে স্নান আহার নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে বিকালে স্মরণ মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে তো মুশকিল—শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনে মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব একথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সেকথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে—।' গিরিশ মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, 'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোনো একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে একথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।" কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক-ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকু প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত। আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—কোনোরূপ ব্রত বা নিয়মে 'চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'—একথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়মভঙ্গ হয় ততক্ষন যেন প্রাণে অশান্তি। কাজেই আপনার

নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে-করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—"করিব' বা "করিতে পারিব না" কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

ঠাকুর গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া, তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগতভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পারো তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করো। ও।'

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন। দেখিলেন—কোনোদিন খান বেলা দশটায় আর কোনোদিন বৈকাল পাঁচটায়, রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা মকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁশ নাই। কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন—'ব্যারিস্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পৌঁছিল কিনা খবরটা পাইলাম না, মকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহা হইলেই তো বিপদ' ইত্যাদি। কাজগুলিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে—আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়—তাহা হইলে সেদিন ভগবানের স্মরণ মনন করিতে তো নিশ্চয় ভুলিবেন। হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না। গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—"তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা তবে আমায় বকল্‌মা* দে। ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা।

কথাটি যেন মনে হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, "যাক, নিয়মবন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন, এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তিবলে কোনো না কোনো উপায়ে তাহাকে উদ্ধার করিবেন।' শ্রীযুত গিরিশ তখন বকল্‌মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন—বুঝিলেন তাহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন ভজন করিয়া কোনো বিষয় ছাড়িতে হইবে না, ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজ শক্তিবলে ছাড়াইয়া লইবেন। কিন্তু [তিনি] নিয়মের বন্ধন গলায় পরা

* অর্থাৎ ভার দাও। বিষয়কর্মে এক ব্যক্তি তাহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোনো ব্যক্তিকে দিলে সে-ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন দেন করে রসিদ চিঠিপত্র লিখে এবং তাহার নামে ঐ সকলে সহি করিয়া নিম্নে ব (অর্থাৎ বকলম)—অমুক' বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয়।

অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা। আর বাড়িয়া উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল—"সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?' শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে শুইতে বসিতে ঐ এক চিন্তা—'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'—সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে, ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে, তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার।

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, 'কখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই' এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষাসকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোনো একটি সামান্য বিষয়ে আমি পারব বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, ও কি গো? অমন করে 'আমি করব' বলো কেন? যদি না করতে পারো? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব। গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা, আমি যখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কায আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব?—বুঝিয়া তদবধি, আমি করিব, যাইব, ইত্যাদি বলা ও ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল, স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল— তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল দিয়াছেন। তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস্ তিনিও লইয়াছেন, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি? ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে

পারা গিয়াছে ? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "এখনও ঢের বাকি আছে। বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি। এখন দেখি যে, সাধন-ভজন, জপ তপ রূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয়—তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে—না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে ?"

গিরিশের সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি

আমরা তখন কলেজে পড়ি। সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই এক দিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। এক দিবস অপরাহ্নে ঐরূপে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ ও গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছে,

আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনোরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জমজম করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত্ লিখেছি আপন হাতে
অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল

তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, 'বল্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' ঐরূপে উপর্যুপরি তিনবার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকার কোনো কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। গোস্বামী যেমন ভক্তিমান, দেখিতে তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে গিরিশের কালীপূজা

দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ কোনো সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্বক কালীপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাহার ভক্তগণের সম্মুখে ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া তিনি শ্যামপুকুরের বাটীতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। কিন্তু পূজার উৎসাহ উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাহাকে ঐরূপ কার্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্ব দিবসে কয়েকজন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্—কাল কালীপূজা করিতে হইবে। তাহারা তাঁহার ঐ কথায় আনন্দিত হইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিল। কিভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয় লইয়া নানা জল্পনা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। স্থির হইল, গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন করা যাইবে। কিন্তু সেইদিবস এবং পূজার দিনের অর্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোনো কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

ক্রমে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্য দিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সন্নিকটে পূর্বদিকের কতকটা স্থান মার্জন করিয়া সংগৃহীত দ্রব্যসকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ দীপসকল প্রজ্বলিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর

তথনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ-বা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ এককালে নীরব, এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকল উপস্থিত ছিলেন—তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস* বলিয়া—ঠাকুর কখনো কখনো নির্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকে এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান্ গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্যভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল আপনার জন্য ঠাকুরের ⁄কালীপূজা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি বলো, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া একরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও বোধ হইতেছে না। তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?—নিশ্চয় তাহাই।

রূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন। এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণ পূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখ মণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণপূর্বক তাঁহাতে ⁄জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারংবার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, এবং যাহারা কিঞ্চিৎদূরে ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনোরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ

*অর্থাৎ ষোল আনার উপর চারি পাঁচআনা অধিক বিশ্বাস।

ঐরূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্ধবাহ্য অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফলমূল মিষ্টান্নাদি পদার্থ সকল তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐ সকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের উল্লাসে ৺দেবীর মহিমা কীর্তন ও নামগুণ গানে অতিবাহিত করিল।

ছদ্মবেশী বিনোদিনীর রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুরের শরীর পূর্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে কোনো নূতন লোক আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্বক প্রণাম না করে, তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের বিশেষত যুবক ভক্তদিগের মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল।

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করিতেছ করো, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে কারণ, উনি (ঠাকুর) যে ঐজন্যই দেহধারণ করিয়াছেন। ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকসকলকে নিবারণ করা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তিসকলকে পূর্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন।

ঐরূপ নিয়ম লইয়া একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইযাছিল। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাটকবিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিযাছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল তাহার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐদিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদবন্দনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং আর একদিবস তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয়-বিনয়পূর্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করায়, দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শ করিলে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইবে—একথায় আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে

তাঁহার মনে কোনোরূপ দ্বিধা বা ভয় আসিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট-কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোনো বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী, ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই চারিটি তত্ত্বকথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জন করিতে-করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

গিরিশ-প্রভৃতিকে ঠাকুরের আশীর্বাদ 'চৈতন্য হোক' আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান'

ক্রমে পৌষমাসের অর্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐদিন বিশেষ সুস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপে অপরাহ্ণ ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তি গৃহমধ্যে অথবা উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের তলে বসিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিল, এবং তিনি নিম্নের হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যানপথে নামিয়া দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া তাহারা অনুসরণ করিতে লাগিল। ঐরূপে বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজনকে পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। কেহ কোনো কথা কহিবার পূর্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ,

তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া, ঊর্ধ্বমুখে কর-জোড়ে গদ্‌গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি।" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হউক।" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে 'জয় জয়' রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ এবং কেহ বা আসিয়া পাদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পাদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর এরূপ অর্ধবাহ্যাবস্থায় তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক হইতে উপরদিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য হোক।" দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকে ঐরূপ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ। চতুর্থকেও ঐরূপ। এইরূপে ক্রমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে-একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান কবিতে আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে চীৎকার ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ। ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল।

অদ্যকার ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট দশ জনের নামই মাত্র আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, যথা—গিরিশ অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধহয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণের এক-জনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদিভির পূর্বরাত্রে অধিকক্ষণ সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া

গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও, স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই।

পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, কাহারও সিদ্ধির নেশার মতো একটা নেশা ও আনন্দ, কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্য দর্শন, কাহারও ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড় সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে, এইরূপ বোধ ও আনন্দ এবং কাহারও কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতি চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ-সারদা

[শ্রীশচন্দ্র মতিলাল উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩১৯ সালের চৈত্র এবং ১৩২ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যায় ভক্ত গিরিশচন্দ্র নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সেটি স্বামী সারদানন্দের দ্বারা সম্যক সংশোধিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। বর্তমান অংশ ঐ প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।]

৮৭৫ বা ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের ছয় মাস আন্দাজ পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এমন একটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়, যাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস পুনরায় সজীব হইয়া উঠে। ঘটনাটি স্বসংবেদ্য, অথবা কেবলমাত্র তাঁহার নিজ মন বুদ্ধিরই গোচরীভূত হইলেও, আজীবন তাঁহার অন্তরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাঁহার পরলোক-বিশ্বাস বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। ঘটনাটি এই—

বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া গিরিশচন্দ্র ঐকালে মৃত্যু মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। অশেষ চিকিৎসাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হইয়া উহা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, ডাক্তার বৈদ্য এবং রোগীর আত্মীয়বর্গ তাঁহার জীবনাশায় হতাশ হইয়া তাঁহার আসন্ন-মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রোগীর অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সুদূরে সুনীল অম্বরপথে অদৃষ্টপূর্বা এক করুণাময়ী স্ত্রীমূর্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই সমীপে আগমন করিতেছেন।—তাঁহার পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুররাগ এবং দক্ষিণহস্তে কি এক বস্তু তিনি সযত্নে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মূর্তি ক্রমে নিকট-

বর্ত্তী হইয়া সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। অন্য কোনোদিকে লক্ষ্য না করিয়া ঐ দেবী-মানবী গিরিশচন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন এবং হস্তস্থিত পদার্থ তাঁহার মুখে অর্পণ করিয়া বলিলেন, 'এই মহাপ্রসাদ খাও, ইহাতে তোমার রোগের শান্তি হইবে।' অনন্তর গিরিশচন্দ্র উহা ভক্ষণ করিলে দেবী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার দিকে সস্নেহে দেখিতে দেখিতে পুনরায় শূন্যপথে ঊর্ধ্বগমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঐ অপূর্ব দর্শনের পর রোগীর পুনরায় সংজ্ঞালাভ হইল এবং ডাক্তারও সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'রোগীর অবস্থা ফিরিয়াছে, নাড়ী আসিয়াছে।' ডাক্তার ও আত্মীয়বর্গ স্থির করিলেন, ঔষধের গুণে রোগী প্রাণ পাইলেন—রোগী নিজে কিন্তু জানিলেন, জননীসদৃশা দেবী মানবীই অহেতুক কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিয়া যাইলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "মুমূর্ষু অবস্থায় রোগশয্যায় পড়িয়া তখন নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম, এ করুণাময়ী কে? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, নিশ্চিত ইনি আমার সেই বহুকাল হইল পরলোকগতা জননী, নতুবা অন্য কোন্ দেবী আর এ দুর্দান্তকে দুর্দিনে কৃপা করিতে আসিবেন? আবার ভাবিলাম, আমার একাদশ বর্ষে পরলোকগতা জননীর চেহারা তো আমি ভুলি নাই এ চেহারায় ও সে চেহারায় তো কিছুমাত্র মিল নাই, তবে ইনি কে? ঐ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা করিতে না পারিয়া ভাবিলাম, নিশ্চিত ইনি আমার সেই স্নেহময়ী জননী, বহুকাল দেবীলোকবাসিনী হওয়ায় ঐরূপে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। ঐ ভাবিয়া তখন চিত্তের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেও আরোগ্যলাভ করিয়া ঐ কথা যখন তখন প্রাণে উদিত হইত এবং অধীর হইয়া ভাবিতাম, কে আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন ও আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন? পরে ঐ ঘটনার কিঞ্চিদধিক আট বৎসর কাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা লাভ করিয়া ভাবিলাম শ্রীগুরুই ঐ দেবমূর্তি ধারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য সঙ্গে থাকিয়া নিজ শক্তিপ্রভাবে এ দুর্দান্ত দানবকে আবাল্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের কিছুকাল পরে জয়রামবাটীতে গমন করিয়া যখন শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিলাম, তখনই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল—নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম, বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার কালে কাহার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম, এবং কেইবা আমাকে ঐ দুর্দিনে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।"

ঘটনাটি বলিতে-বলিতে গিরিশবাবু বলিতেন, "সে মহাপ্রসাদের অপূর্ব স্বাদ এখনও আমার স্মরণে আছে।"

বহু পূর্ব হইতে গিরিশের পানাসক্তি জন্মিয়াছিল। ধর্মপথে আসিয়াও গিরিশ উহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কখনো অনুভব করেন নাই। লোকনিন্দা—গিরিশ ভাবিতেন, উহা তো আমার একরূপ অঙ্গের আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, ঠাকুর তো তাঁহাকে উহা নিষেধ করেন নাই, তবে আর কাহার কথা তিনি গ্রাহ্য করিবেন? বাস্তবিক, ঠাকুরও তাঁহাকে কখনো উহার বিরুদ্ধে বলেন নাই। এবং ঐ আসক্তির জন্য যখন অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া গিরিশের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইত, তখন বলিতেন, "ওর তাতে দোষ হবে না। আমি দেখিয়াছি, গিরিশ মা কালীর অঙ্গ হইতে কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ শিশুর আকারে সুধাভাণ্ড ও পানপাত্র হস্তে লইয়া নির্গত হইল এবং পান করিতে করিতে দিব্যানন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল।—কোনো ভৈরবের অংশে উহার জন্ম, সে জন্যই অত পানাসক্তি, এবং সে জন্য উহা তাহাকে বিপথগামী করিবে না।" গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতাগণ বলেন, ঠাকুরের ঐরূপ কথায় তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, গিরিশ ঐ পানাসক্তি ক্রমে ত্যাগও করিতে পারিবেন।

সে যাহা হউক, পানাসক্ত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে করিতে গিরিশ একদিন এইসময়ে বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অভয়দাতার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একজন সহচর সমভিব্যাহারে তদ্দণ্ডেই নৌকারোহণে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন—তখন রাত্রি এগারটারও অধিক হইয়াছে। অলৌকিক ঠাকুরেব রাত্রিতে একপ্রকার নিদ্রাই ছিলনা এবং তাঁহার গৃহদ্বার অনেকসময়ে উন্মুক্তই থাকিত। ঠাকুর অন্যমনে ভাবাবেশে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে গিরিশ ও তৎসহচর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা, কথাবার্তা এব চালচলনে তাহাদের অবস্থা বুঝিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাঁহাদের কারণানন্দ দর্শন করিয়া ঠাকুরের মনে জগৎকারণের উদ্দীপন হইয়া গেল এবং তিনি ভাবাবেশে উলঙ্গ হইয়া গান ধরিলেন—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমার মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ মাতালে মাতাল বলে।"

ঐ গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর ভাবাবেশে টলমল করিতে করিতে ঐ দুইজনের সহিত যোগদান করিয়া এমন নৃত্য আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে তখন উঁহাদের অপেক্ষা অধিক মাতাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন অপূর্ব দিব্য আনন্দে গৃহ পূর্ণ হইল এবং গিরিশ ও তৎসহচর ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহারে এককালে বিহ্বল হইয়া বালকের ন্যায় ঠাকুরের সহিত গীত ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে কাটিলে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইল এবং গিরিশ ও তৎসহচর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় নৌকারোহণে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গিরিশ ও তৎসহচরের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল, ঠাকুর সাক্ষাৎ ঈশ্বর এবং জগাই মাধাইয়ের ন্যায় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতেই তাঁহার আগমন হইয়াছে। "নতুবা," তাঁহারা বলিতেন, "যে দুর্দান্ত মাতালদের মত্তাবস্থা দেখিয়া বারনারীকুলও সশঙ্কচিত্তে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে—তাহাদিগকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় ঐরূপে সাদরাহ্বান করিয়া, স্বর্গীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়া, ধর্মভাবে এককালে বিমোহিত করিতে অন্য কে আর সমর্থ হইবে।" তাঁহারা বুঝিলেন, অজ্ঞানতায় শতসহস্র অপরাধ করিয়া ফেলিলেও ইনি কখনও তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ করিবেন না—ইনি সাক্ষাৎ করুণাময় পতিতপাবন!

আদরের সন্তান নির্গুণ হইলেও যেমন পিতামাতার ভালবাসায় আপনার পূর্ণাধিকার জ্ঞান করে, গিরিশও তদ্রূপ আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়াটে আদরের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সকল বিষয়ে তাঁহাকে ইচ্ছামতো আব্দার করিয়া ধরিতে বসিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্য ভক্তেরা কোনোরূপ সাংসারিক কামনা পূরণের জন্য ঠাকুরকে প্রার্থনা করাটা অন্যায় জ্ঞান করিতেন—ঐরূপ করিতে ভয়ও পাইতেন। কারণ, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, ঠাকুর সর্বপ্রকার বিষয়কামনা কাকবিষ্ঠার ন্যায় সর্বথা ত্যাগ করিয়াছেন, বিষয় ও বিষয়ীর কথা শুনিতেও কষ্ট বোধ করেন এবং মনে কোনোরূপ কামনাপূরণের জন্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে মিষ্টান্নাদি খাইতে দিলে তিনি উহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া ঐ মিষ্টান্নাদি খাদ্য কিছুতেই ভক্ষণ করিতে পারেন না। গিরিশ কিন্তু ঐরূপ করিতে কখনো সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। তিনি বলিতেন, "যাঁহাকে ভগবান বলিয়া স্থির জানিয়াছি, তাঁহার কাছে কেবল ধর্মের জন্যই যদি প্রার্থনা করিব, তবে আমার অন্য সকল কামনা কি শয়তান পূরণ করিবে?—অবশ্য যাহার মনে বিষয় কামনা নাই, সে ঐরূপ করিবে, কিন্তু যাহাকে ঠাকুর নানা সাংসারিক কর্মে লিপ্ত রাখিয়াছে, সে ঐ সকলে সিদ্ধিলাভের জন্য আবার কাহাকে ডাকিবে? এক ভগবান ছাড়া কর্মফলদাতা আবার কে আছে।" ঐরূপ ভাবের প্রেরণায় তিনি বলিতেন—"তোরা সব তাঁর শিষ্ট শান্ত ছেলে, তোরা ঐরূপ করিতে পারিস, কিন্তু আমার মতো বয়াটে ছেলের ঐ সকল ক্ষুদ্র কামনাও পিতা পূর্ণ করিবেনই করিবেন। তবে যে তোমরা বলিস, কামনাপূরণের জন্য ধরিলে ঠাকুরের কষ্ট হইবে, সেটা আমার বোধ হয়, তোদের মঙ্গলের জন্য ঠাকুর ঐরূপ ভাণ করেন—যাহাতে তোরা ঐরূপ ভেবে সব কামনা ছেড়ে কেবল ভক্তিকামনা করিস, সেজন্য। নতুবা সর্বশক্তিমান ঠাকুরের নিজের জন্য ভালো বা মন্দ কোনো কার্যেরই আবশ্যকতা নাই।" আশ্চর্যের বিষয়, গিরিশ ঐরূপ ভাবের প্রেরণায়, ঠাকুরকে যাহা কখনো কেহ করিতে দেখে নাই, সে সকল কর্ম করিতে ধরিলেও ঠাকুর অনেক সময় তাহা

করিতেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত পাঠককে এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিবেন—

ঠাকুরের রীতি ছিল, ভক্তদের বাটী যাইলে যাহা হয় কিছু চাহিয়া খাইয়া আসিতেন। কারণ, তিনি বলিতেন, সাধু বাটীতে আসিয়া কিছু গ্রহণ না করিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। ঠাকুরের আর এক স্বভাব ছিল—যাহা হইতে অগ্রে কাহাকেও কিছু দেওয়া হইয়াছে, সে সকল খাদ্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না—কেমন করিয়া তিনি উহা জানিতে পারিয়া ঐরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতেন না।

বাগবাজারের প্রসিদ্ধ নন্দলাল বসুর বাটীতে ঠাকুর একদিন কোনো কারণে গমন করিয়া বিদায় গ্রহণকালে এক গেলাস জল পান করিতে চাহিলেন। নন্দবাবু জল আনাইয়া দিয়া নিজ পানের ডিবা তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া উহা হইতে পান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর জলপান করিলেন, কিন্তু পান গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "অগ্রভাগ দেওয়া জিনিস খাইতে পারি না।' নন্দবাবু বাটীর ভিতর হইতে পান সাজাইযা আনিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন, "আপনি পরমহংস, আপনার আবার বিধিনিষেধ মানা কি জন্য?—অজ্ঞানীরাই ঐরূপ করিবে, আপনি কেন ঐরূপ করেন?" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "ও (নিয়ম) আমার একটা আছে গো, (উহার ব্যতিক্রম করিতে) পারি না, কি করিব বলো।" নন্দবাবু ইতিপূর্বে পণ্ডিত রাখিয়া বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, তবে, পরমহংসের এখনও ঠিক-ঠিক জ্ঞান হয় নাই। আচার্যদিগকে অপরের কল্যাণের জন্য বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, একথা নন্দবাবুকে বুঝাইলেও বুঝিবেন না দেখিয়া ঠাকুর আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

গিরিশচন্দ্রের কর্ণে ঐকথা উঠিল। পরমহংসদেব এখনও অদ্বৈতজ্ঞানের পূর্ণাধিকারী হয়েন নাই, নন্দবাবুর ঐরূপ ধারণা হইয়াছে জানিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বিদ্যার অহঙ্কার লইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেজন্যই নন্দবাবুকে ঠাকুর ধরা দিলেন না, নন্দবাবুর দুর্ভাগ্য। নিজের কল্যাণের জন্য ঠাকুর যে বিধিনিষেধ মানিয়া চলেন না, তাহা আমি দেখাইয়া দিব।" নন্দবাবুর ঐরূপ শ্রদ্ধারহিত ধারণায় গিরিশের মনে তখন বাস্তবিকই বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন গিরিশের বাটীতে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে কোনো কথা না বলিয়া বাটীর ভিতর হইতে পান সাজাইয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার গ্রহণ করিবার পূর্বেই স্বয়ং একটি পান গ্রহণ করিলেন। এবং অবশিষ্ট হইতে ঠাকুরকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে-করিতে উহা হইতে একটি গ্রহণ করিলেন। গিরিশ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিলেন

এবং পরে সকলকে ডাকিয়া ঠাকুরের ঐ আচরণের কথা বলিতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্রের ভৃত্য একদিন পিচ্ছিল স্থানে পতিত হইয়া হস্তে বিষমাঘাত প্রাপ্ত হইল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে নানা ঔষধের সাহায্যেও উহা হইতে আরোগ্যলাভ করিতেছে না দেখিয়া গিরিশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "তুই মনে মনে পরমহংসের নিকট মানত কর যে, ভাল হলে তাঁকে রসগোল্লা দিবি।' দরিদ্র ভৃত্য বাবুর কথায় ঐরূপ করিল। কিন্তু পরদিন স্নান করিবার স্থানে পুনবায় পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে ভাবিল, তাহার হস্তে আবার গুরুতর আঘাত লাগিল। সে কিন্তু স্নানান্তে গিরিশচন্দ্রকে আসিয়া বলিল, "বাবু, তবে আজ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংস ঠাকুরকে রসগোল্লা দিয়া আসি।" গিরিশ বলিলেন, "সে কি রে, এই যে শুনিলাম, আবার আজ পড়িয়া তোর ঐ হস্তে আঘাত লাগিয়াছে?" ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞা হা, কিন্তু উঠিয়াই দেখি, হাতে আর ব্যথা যন্ত্রণা কিছুই নাই, সারিয়া গিয়াছে। গিরিশ ঠাকুরকে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তবে নাকি তুমি কামনা পূর্ণ করো না এবং কামনা করিয়া তোমাকে ধরিলে মঙ্গল হয় না?" গিরিশ দুই টাকার রসগোল্লা কিনিয়া দিয়া ভৃত্যকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সে যাহা হউক, গিরিশচন্দ্রের ঠাকুরের নিকট আবদার অনুরোধের চূড়ান্ত কথা আমরা এখনও বলি নাই। উহাই এখন পাঠককে বলিতে আরম্ভ করি—

গিরিশ বলিতেন, ঠাকুরের শান্তশিষ্ট ভক্ত সকলকে তাঁহার নানাভাবে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে দেখিয়া তাঁহার অনেক সময়ে এমন মনে হইত—"আহা, ইহারা কত সৌভাগ্যবান্। ইহারা ঠাকুরের মনোমতো কেমন সেবা করিতে জানে—ঠাকুরও তাহাতে কত সুখী হন। জগাই মাধাইয়ের সাজ সাজিয়া সংসারে আসিয়া ঠাকুরের ভালবাসা যথেষ্ট পাইলাম বটে, কিন্তু চিরকাল নিজের সেবা করিতেই শিখিয়াছি, ঠাকুরের সেবা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তো শিখি নাই, অতএব আমার দ্বারা ঠাকুরের সেবা করা কিছুই হইল না।"

গিরিশ একদিন ঠাকুরকে খুলিয়া জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, মহাশয় আমার মনোমতো সেবা একদিন গ্রহণ করিবেন না?' ঠাকুরও গিরিশের অন্তর দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, রাজসিক ভক্তিপ্রধান গিরিশ তাঁহাকে তাঁহার যাহা খাইতে ভালো লাগে তাহা না খাওয়াইতে পারিলে তৃপ্তিবোধ করিবে না এবং উহা বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন —"এখন নয় রে, সে এখন নয়।"—অর্থাৎ, যতদিন না গিরিশ স্বয়ং সত্ত্বগুণপ্রধান হইতেছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার মনোমতো খাদ্যপানাদি তাঁহাকে প্রদান করিলেও তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং গিরিশও তজ্জন্য তৃপ্তিবোধ করিবেন না। গিরিশ ঠাকুরের ঐ কথা বুঝিলেন। কারণ তিনি ইতিপূর্বে বহুবার দেখিয়াছিলেন,

মাছ-মাংসাদি খাইতে বসিয়া নিজের ভালো লাগিলেই ভাবিতেছেন, "আহা, ঠাকুর যদি এ সকল খাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে খাওয়াইতাম।" গিরিশ বুঝিলেন, কিন্তু ক্ষুণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, "তবে আর আমার দ্বারা ঠাকুরের সেবা কেমন করিয়া হইবে ? আমার এ স্বভাবও বদলাইবে না, ঠাকুরের সেবা করাও হইবে না। আমার স্বভাবও এমন যে, আমার যাহা ভালো লাগে না, তাহা খাইয়া ঠাকুরের যে তৃপ্তি হইতেছে, একথা ভাবিতেও পারি না এবং তিনি যাহা ভোজন করেন, তাহা শুদ্ধাচারে দেবতার ভোগের মতো রাঁধিয়া দিতেও বিষম হাঙ্গাম বলিয়া মনে হয়। তবে আর আমার দ্বারা কেমন করিয়া ঠাকুরের সেবা করা হইবে ?"

উহার অনতিকাল পরে গিরিশ একদিন থিয়েটারে রহিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর কয়েকটি ভক্তসঙ্গে অভিনয় দেখিতে আসিলেন। গিরিশ ঠাকুরকে সযত্নে উপরে লইয়া গিয়া বসাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া গিরিশের মনে হইল, "হায় হায়, আমার দ্বারা ঠাকুরের কোনো সেবাই হইল না।—আজ অভিনয় দেখিতে যদি কোনো উচ্চপদস্থ সাহেব বা ধনী ব্যক্তি আসিত, তাহা হইলে লাল বনাত দিয়া রাস্তা পর্যন্ত মুড়িয়া, বঙ্গাসয় পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতাম, কিন্তু আমার ইহকাল পরকালের অবলম্বন ঠাকুর আসিবেন শুনিয়া কি করিয়াছি ?—বড় জোর একটা আলাদা আসনে বসিতে দিয়াছি।

ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে গিরিশের মনে বিষম দুঃখ হইল এবং পানাসক্তদিগের যেমন হইয়া থাকে গিরিশ দুঃখভার অসহ্য বোধ করিয়া মদ্যপান করিতে-করিতে ভাবিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা ঠাকুরের সেবা হওয়া অসম্ভব, তবে যদি তিনি অহেতুক কৃপায় আমার সন্তান হইয়া কোনোদিন আমার গৃহ উজ্জ্বল করেন, তবে মমতায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাহার প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের আহরণাদি করিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা করিতে পারি। সে অদৃষ্ট কি আর আমার হইবে ?" আবার ভাবিলেন, "কেনই বা হইবে না ? ঠাকুরকে ঐরূপ হইতে ধরিয়া বসিব, তাহা হইলেই ঠাকুর স্বীকৃত হইবেন।

মদ্যপের খেয়াল—মনে উদয় হইলে তাহা না করিয়া শান্তি কোথায় ? অভিনয় শেষ হইলেই গিরিশ ঠাকুরকে যাইয়া ধরিয়া বসিলেন—"তুমি বলো, তুমি কোনো সময়ে আমার পুত্র হইবে ?" অতঃপর ঘটনাটি গিরিশচন্দ্রের নিজের মুখেই পাঠকের শুনা ভালো—

[এখানে 'রামদাদা' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, যার মধ্যে গিরিশের প্রার্থনা, ঠাকুরের অস্বীকার, তাতে গিরিশের ক্রুদ্ধ গালিগালাজের কথা আছে। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণতঃ কিছু পূর্বে উৎকলিত হয়েছে।]

গিরিশচন্দ্রের কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মত্ততাবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দুর্বাক্য প্রয়োগের পূর্ব হইতে তিনি যদি ঠাকুরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া দৃঢ় ধারণা না করিতেন, তাহা হইলে কখনই ঐরূপ কার্য করিতে পারিতেন না। হরিপদ নামক যে ভক্তের কথা, শ্রীযুত গিরিশ তাঁহার চতুর্থবার ঠাকুরকে দর্শন কালের কথায় উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি ঐ দিন গিরিশের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত গিরিশ ঐদিন ঐ অবস্থাতেও ঠাকুরকে গালি দিবার পরে তাঁহার প্রতি অদ্ভুত ভক্তি বিশ্বাসের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর যে, তাঁহার উপর কিছুমাত্র কুপিত হইবেন, একথা এক ক্ষণের জন্যও মনে স্থান দেন নাই। তিনি বলেন "ঠাকুর ঐ সময়ে পাছে সমভিব্যাহারী ভক্তগণ একটা হাতাহাতি কাণ্ড করিয়া বসে, এজন্য তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে-মধ্যে বলিতেছিলেন, এটা (গিরিশ) কোন থাকের (শ্রেণীর) ভক্ত রে? এটা বলে কি?" কিন্তু ঐদিন থিয়েটার হইতে ফিরিবার সময়ে ঠাকুর যখন গাড়িতে উঠিলেন, তখন গিরিশ ঐ গাড়ির সম্মুখে কর্দমাক্ত রাস্তার উপরে লম্বমান হইয়া শুইয়া পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। পরে গৃহে ফিরিবার কালে এবং তাঁহার বাটীতে সঙ্গে আসিয়া, আমি গিরিশবাবুকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার ঐরূপ আচরণ করাটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে এবং ঠাকুরের অসন্তুষ্টিতে তাঁহার সর্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, গিবিশবাবু ততবারই উত্তরে বলিলেন, 'তুই জানিস নে, ওঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নিন্দা ও স্তুতি উভয়ই সমান; উনি আমার উপর কিছুমাত্র কুপিত হন নাই, গালি দিবার সময়ে উনি যদি আমার কিছুমাত্র অপরাধ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমাকে কি আর এখনও দেখিতে পাইতিস?—এতক্ষণে কোথায় রেণুর রেণু হইয়া যাইতাম!' তাঁহার ঐরূপ ভক্তিবিশ্বাসপূর্ণ কথাতেও যখন আমি প্রত্যয় না করিয়া তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকটে যাইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলাম, তখন তিনি 'আমার ঘুম পাইয়াছে,' বলিয়া আমার নিকট হইতে সহসা বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীর অন্দরে চলিয়া গেলেন। অগত্যা আমি তাঁহাকে 'দুর্দান্ত পাষণ্ড' স্থির করিয়া ঠাকুরের করুণা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিত অন্তরে নিজ গৃহে ফিরিলাম।"

অসাধারণ বিশ্বাসবলে গিরিশ ঐরূপ আচরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেও তাঁহার উদার হৃদয় কিন্তু তাঁহাকে ঐরূপে থাকিতে দেয় নাই। গিরিশ পরদিনই বুঝিলেন, ঠাকুরের নিকট অপরাধী বলিয়া পরিগণিত না হইলেও তাঁহার ভক্তদিগের প্রাণে তিনি ঐ ঘটনায় বিষমাঘাত প্রদান করিয়াছেন। পরে ভাবিলেন, সেটা বড় অন্যায়

কর্ম হইয়াছে। আরও ভাবিলেন, আহা, তাহারা কতরূপে ঠাকুরের সেবা করিয়াও যথেষ্ট হইল না ভাবিয়া কাতর হয়, আর আমি, ঠাকুরের অপার করুণাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও সুখী করিতে সচেষ্ট হই নাই। তাঁহার করুণার ও নিজ বিসদৃশ আচরণের এইরূপে যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই গিরিশের অন্তরে যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ঠাকুরের করুণায় গিরিশের সমস্ত দম্ভ বহুপূর্বে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এখন এই ঘটনায় ঐ দম্ভের সংস্কার পর্যন্তও তাঁহার অন্তর হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। গিরিশ উহাতে বিনীত, অনুতপ্ত এবং আপনার নিকটে আপনি অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়া, নিরন্তর ঐ কর্মের স্মৃতিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

আবার ঐ ঘটনায় গিরিশ নিজ পানাসক্তি যথাসাধ্য ত্যাগ করিতেও যে, কৃত-সংকল্প হন একথাও আমরা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। এখন হইতে যখন তখন পানদোষে রত হইতে কেহ কখনো তাঁহাকে দেখে নাই। এইরূপে দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের অলৌকিক কৃপায় গিরিশের জীবনে ততই অদৃষ্টপূর্ব পরিবর্তনসমূহ উপস্থিত হইয়া ক্রমে তাঁহাকে ভক্তাগ্রণী করিয়া তুলিয়াছিল। নিম্নের কয়েকটি ঘটনায় আমরা পাঠককে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থবার দর্শনকালে ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঠাকুরের দেহরক্ষার পূর্বে, গিরিশ যে কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তৎকৃত 'বুদ্ধদেব ও 'বিল্বমঙ্গল' গ্রন্থে সবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতের যে সকল রহস্য শেক্সপীয়রাদি জগতের কোনো জাতির কোনো মহাকবিই এ পর্যন্ত প্রকাশে সমর্থ হয়েন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণ পদাশ্রিত গিরিশের লেখনী নাট্যচরিত্র-সকলের ভিতর দিয়া সে সকল তত্ত্বের যথাযথ প্রকাশেও সমর্থ হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র শেষজীবনে নাটকসকল প্রণয়ন করিয়া, সমালোচকেরা উহা [দের] সু বা কু নয়নে দেখিলেও, স্থির নিশ্চিন্ত মনে বলিতেন, "উহারা না বুঝিলে আমি কি করিতে পারি? আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি, যাহা জীবনে কখনও দেখি নাই বা অনুভব করি নাই, তাহা কখনও লিখি না, কিন্তু সকলে আমার মতো দৃষ্টি কোথায় পাইবে? ঠাকুরের কৃপায় আমি যে, অবতার পুরুষের অদ্ভুত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃণ্য বারনারীকুলের জীবন পর্যন্ত দেখিবার অবসর পাইয়াছি। সংসারের সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্বনিম্নের স্তর পর্যন্ত এইরূপে ঘনিষ্ঠ-ভাবে দেখা আর কাহার ভাগ্যে হইয়াছে? অতএব আমার পুস্তকসকল সাধারণে না বুঝিলেও আমি তাহাদের দোষ দিতে পারি না। সাধারণে বুঝিতে ও গ্রহণ

করিতে পারিবে না বলিয়া আমি আমার সর্বোচ্চ চিন্তা ও কল্পনাসমূহ লইয়া অনেক সময়ে আমার পুস্তকের চরিত্রসকল গঠন করি না। তাহা করিলে, সাধারণে আমার পুস্তকসকল একেবারেই বুঝিতে পারিত না বলিয়া বোধ হয়।" বিন্দুমাত্র দম্ভের সহিত গিরিশচন্দ্র ঐ কথাগুলি বলিতেন না এবং ঐ ধারণাই তাঁহাকে খ্যাতি অখ্যাতির পরপারে অবস্থান করিতে সক্ষম করিয়াছিল।

অকপট আন্তরিক বিশ্বাস ও হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতাবলে গিরিশ অনেক বিষয় ভক্তদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে বুঝিতে পারিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিজ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকটে আমরা শুনিয়াছি। ঐ বিষয়ের অন্য একটি কথা এই প্রসঙ্গে আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে। উহাতে শ্রীযুত গিরিশের লোকচরিত্র বুঝিবার এবং মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের মনোমালিন্য দূর করিবার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি সেজন্য আমরা উল্লেখ করিতেছি—

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাশীপুর বাগানে অবস্থানকালে তাঁহার সেবার জন্য যে-সকল যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের খরচপত্র ঠাকুরের গৃহীভক্তগণই প্রদান করিতেন। ঠাকুর ঐ স্থানে অবস্থান করায়, তাঁহার দর্শনার্থী অনেক নূতন লোকের সমাগম হইত এবং তাহাতে অনেক সময় ব্যযাধিক্য হইয়া যাইত। ঠাকুরের সমীপাবস্থিত সন্ন্যাসী ভক্তগণ ঠাকুরের পরিচর্যা ও সাধন ভজনে নিবিষ্ট থাকায়, অনেক সময়ে ঐ ব্যয়াধিক্য খাতাপত্রে লিখিয়া রাখিতে পারিতেন না। গৃহী ভক্তগণের অনেকে তাহাতে বিরক্ত হইতেন এবং প্রতি মাসে ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী ভক্তগণকেই দোষী সাব্যস্ত করিতেন। সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাহাতে মর্মাহত হইয়া সংকল্প করিয়া বসিলেন, তাঁহারা এখন হইতে আর কোনোরূপ হিসাবপত্র লিখিয়া রাখিতে পারিবেন না, তাঁহারা ঠাকুরের সেবার জন্যই ঘর দ্বার ছাড়িয়াছেন, অতএব তাহাই যথাসাধ্য করিবেন। ঐরূপে উভয় পক্ষের ভিতর একটা মনোমালিন্য দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, এমন সময় গিরিশ ঐ বিষয় জানিতে পারিলেন। পরস্পরের উদ্দেশ্য না বুঝাতেই ঐরূপ হইয়াছে, একথা স্থির নিশ্চয় করিয়া তিনি কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলেন। গিরিশ সর্বাগ্রেই সন্ন্যাসী ভক্তগণের সম্মুখে বিবাদের মূলীভূত হিসাবের খাতাখানি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, গৃহী ভক্তদিগকে, যাঁহার যথাসাধ্য তাঁহার হস্তে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে হিসাব লইতে অনুরোধ করিলেন, এবং নির্ধারিত ব্যয়াপেক্ষা অধিক যাহা লাগিত, তাহা এখন হইতে স্বয়ং যেরূপে হউক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। ফলে, এখন হইতে হিসাবপত্র আর লিখিয়া রাখিতে হইল না, অথচ সকল কার্য

পূর্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল।

গিরিশ যাহাকে, বা যে বিষয় বিশ্বাস করিতেন, তাহা এত সর্বান্তঃকরণে করিতেন যে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তিবর্গে ঐ বিশ্বাস তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে সংক্রামিত হইয়া যাইত। ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া তিনি এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সর্বত্র সকল সময় ঐ বিশ্বাসের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইত, এবং তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহার কর্মস্থলের (রঙ্গালয়ের) অনেকেই—তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে না বলিলেও ঐরূপ করিতে শিখিয়াছিল। শ্রীযুত গিরিশ কিন্তু তাহাতে ভুলিতেন না—তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি স্বল্পকালেই বুঝিয়া লইত, উহাদিগের মধ্যে কাহারা ঠাকুরকে বাস্তবিক বিশ্বাস করে এবং কাহারাই বা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া গিরিশ যেদিন হইতে স্বয়ং শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতেই তাঁহার মহত্হৃদয় প্রাণ নিত্য প্রার্থনা করিত, যাহাতে তাঁহার পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তিই ঠাকুরকে ধরিয়া তাঁহার ন্যায় শান্তিলাভ করেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন রঙ্গালয়ে কোনো পুস্তকের অভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন, তখন গিরিশের বিশ্বাস তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে বলিত, পতিতদিগকে উদ্ধার করিতেই পতিতপাবনের আগমন—অভিনয় দেখাটা একটা ভাণমাত্র। গিরিশের সেদিন আর বিরাম থাকিত না, কোথায় কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রাণে ঠাকুরের প্রতি একটু বিশ্বাস হইয়াছে জানিয়াছেন, কোথায় কোন্ নিম্নপদস্থ কর্মচারী-যুবক ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিবার প্রার্থনা সভয়ে তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছে—তাহাদিগের সকলকে একত্রিত করিয়া অবসর বুঝিয়া ঠাকুরের সমীপে আগমন করিয়া মনে-মনে তাহাদের উদ্ধার কামনা করত তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিতেন। গিরিশের প্রাণে তখন আর উল্লাসের অবধি থাকিত না। তিনি স্থির ধারণা করিতেন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইল এবং এইজন্যই ঠাকুর তাঁহাকে রঙ্গালয়ে এইসকল হীনব্যক্তির মধ্যে রাখিয়াছেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসীভক্তগণ কখনো কখনো তাঁহার ঐ ধারণার বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপিত করিয়া যদি বলিতেন "বাসনার ঠেলায় পুস্তক রচনা ও থিয়েটারাদি করিতেছ, আর, বলিতেছ কি-না, ঠাকুর আমাকে পতিতোদ্ধারের জন্য এইরূপ সাজে তাহাদের ভিতর রাখিয়াছেন—ঐরূপ বলিতে লজ্জা করে না?"—গিরিশের বিশ্বাস তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তরে বলিতেন, "আচ্ছা রোস্, তোদের দেখাচ্ছি এইবার—এইবার দেখা হলেই ঠাকুরকে ধরে বসছি যে, প্রতিবারেই আমি জগাই-মাধাইয়ের সাজে কেন আসবো? আগামী বারে আমায় ভালোছেলের সাজে আনতে হবে, এবার যাদের সন্ন্যাসীর সাজে এনেছ,

তাদের ভিতর কাউকে আগামীবারে জগাই-মাধাইয়ের সাজে এনো—হাম্ হ্রদ্ দুফে জগাই-মাধাই নেহি হোঙ্গে।" বাস্তবিকই গিরিশ ভাবিতেন যে, ঠাকুর তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা সাজে সাজাইয়া সংসারক্ষেত্রে পতিতোদ্ধারের জন্ত আবশুক মতো আগমন করাইয়া থাকেন, লীলাময়ের ঐরূপ লীলায় অন্ত কাহারও কিছুমাত্র হস্ত নাই!

গিরিশের প্রবল বিশ্বাসের সংক্রামক শক্তিতে রঙ্গালয়ের সকল ব্যক্তিই প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মান্ত করিতে শিখিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা নহে, আমরা তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের মুখে শুনিয়াছি, গিরিশ, ঠাকুরের বর্তমানকালে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ধারণা বা বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুরের গৃহীভক্তগণের অনেকের ভিতর ঐরূপ ধারণা ও বিশ্বাসের আবির্ভাব অনেক সময়ে হইতে দেখা যাইত। গিরিশ—ঈশ্বরাবতার ঠাকুরের শরীর চিন্ময় বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন—অপরে অনেকেও ঐরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি—ঠাকুরের চিন্ময় দেহে রোগাধিকার নাই, অতএব ঠাকুরের গলরোগ একটা ভাণমাত্র, বলিয়া স্থির করিলেন—অনেকে উহাই তাঁহাদিগেরও বিশ্বাস বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি, বকল্‌মা দিয়া সাধনভজন করাটা তাঁহার পক্ষে অনাবশুক বলিয়া স্থির করিলেন—অপরে কেহ কেহ উহাই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ঐজন্ত গিরিশকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাসের সকল কথা নির্বিচারে সকলের নিকট প্রকাশে অপরের অকল্যাণের সম্ভাবনা বুঝাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়ে দেন—একথা আমরা গিরিশচন্দ্রের নিজমুখে শুনিয়াছি। গিরিশ বলিতেন, ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুকাল পরে স্বামীজী তাঁহাকে ঐরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন।

ক্রমে ঠাকুরের দেহরক্ষার কাল উপস্থিত হইল, গিরিশ উহা শুনিলেন, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বা হইতে পারে। গিরিশ ঐ ঘটনার কিছু পূর্ব হইতে কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট গমন করেন নাই, এখন ভক্তদিগের মুখে ঠাকুরের দেহরক্ষার কথা জানিতে পারিয়াও তথায় যাইলেন না। শোকাকুল ভক্তেরা গিরিশের ঐরূপ আচরণে বিশেষ ব্যথিত হইলেন, অনেকে অনেক কথা বলিয়া তাঁহার দোষদর্শনও করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐরূপ আচরণের জন্ত তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। গিরিশ কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাঁহাদিগকে নিজ মনোগত ভাব বুঝাইয়া বলিলেন—"দেখ ভাই, আমার নিশ্চিত ধারণা, ঠাকুরের চিন্ময় শরীরকে জরা, ব্যাধি বা মৃত্যুর স্পর্শ করিবার অধিকার নাই, উহা নিত্য। কিন্তু সংসারে নরাকারে আসিয়া সাধারণ নরের ন্তায় সকল কার্য ঠাকুরকে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইতে হইয়াছে, দেহ-

রক্ষাটাও সেইরূপ দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিন্ময় শরীরের দ্বারা দেহরক্ষার অভিনয় দেখানো অসম্ভব বলিয়া, আমার ধারণা, তিনি মায়াগঠিত অন্য একটা শরীর আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া চিন্ময় শরীরের অন্তর্ধান করিয়াছেন। ঐরূপ করিবার কারণ, ঐ মায়ার শরীরটাকে মৃত দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিব—তাঁহারই [ঠাকুরেরই] মৃত্যু হইয়াছে। আমি উহা করিতে প্রস্তুত নহি। সেজন্যই দেহরক্ষার কথা শুনিয়াও কাশীপুরে যাই নাই। আমি ভাবিলাম, দুর্বল আমি, ঐ মৃত মায়ার শরীরটাকে দেখিলে আমার বিশ্বাস ঠিক রাখা কঠিন হইবে—উহা দেখিলেই আমার চক্ষু আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে, 'স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলি যে, তিনি মরিয়াছেন।' সেজন্য ইচ্ছা করিয়া ঠাকুরের দেহরক্ষা সম্বন্ধে চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে বিবাদ রাখিয়া দিলাম। এখন কর্ণ ঐ কথা শুনিয়াছি বলিলেও তাহাকে বলিতে পারিব, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ কত মিথ্যা কথা তো শুনিয়াছিস্, তাহাই বিশ্বাস করিবি না কি ? যে যাহা বলে বলুক না কেন, আমি তো ঐ ঘটনা দেখি নাই—আমি উহা বিশ্বাস করিব না।"

আমরা জানি, তিনি আজীবন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহরক্ষার ছবিখানি কখনো দর্শন করেন নাই।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের পত্নী একটিমাত্র শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোকগামিনী হইলেন। গিরিশচন্দ্রের ঐ শিশুসন্তান স্বল্পকালমাত্র জীবিত ছিল, কিন্তু ঐ কালের মধ্যেই অদ্ভুত ঐশী ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল—একথা আমরা পাঠককে পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের স্বর্গীয়া ভগিনী দক্ষিণাকালী এবং বাটীর অন্যসকল পরিবারবর্গের মুখে আমরা শুনিয়াছি, ঐ শিশু অন্যসকল খেলিবার দ্রব্য ফেলিয়া ঠাকুরের ছবি লইয়া খেলা করিত, উহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিবার মতো বসিয়া থাকিত এবং পূর্বে কখনও না দেখিলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ভক্তগণের নিকটেই পূর্বপরিচিতের ন্যায় আচরণ করিত। মাতৃহীন শিশু ঐজন্য সকলেরই একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। গিরিশ নিজ পুত্রের ঐরূপ ভক্তিপ্রকাশ দেখিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতেন—"কল্পতরু ঠাকুরের নিকটে মত্ততাবশে 'পুত্র হও' বলিয়া কামনা করিয়াছিলাম বলিয়াই কি তিনি কোনো যথার্থ ঈশ্বরভক্তকে পুত্ররূপে প্রদান করিয়া ঐরূপে আমার সেবা লইতেছেন ? কারণ তিনিই তো একথা নিজমুখে বারম্বার বলিয়াছেন, 'ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান—তিনে এক, একে তিন।'—এই পুত্র যদি বাঁচিয়া থাকে তো তাহাকে কখনো সংসারে নিবদ্ধ করিব না, ঠাকুরের সেবার জন্য প্রদান করিয়া সর্ববন্ধনবিমুক্ত সন্ন্যাসী করিব।" ঐ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হইয়া তিনি বাস্তবিকই ঐ পুত্র দুই বৎসর বয়স্ক হইতে না হইতে

তাঁহাকে পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছিলেন এবং সর্বদা দেবতাজ্ঞানে পুত্রের শুশ্রূষা করিতেন। পুত্র তিন বৎসর হইতে না হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কিন্তু তাহার ঐ ভাবে সেবা করিয়া গিরিশচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাস যে অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠিল, একথা বলা বাহুল্য। প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণসদৃশ পুত্রের মৃত্যুতে ক্রমে 'বকলমা' প্রদানের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, যখন ঠাকুরকে সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন উহাদিগের প্রাণভিক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। তাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত মঙ্গলময় ঠাকুর যাহাই বিধান করিবেন, তাহাই অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস অটল রাখিতে হইবে। গিরিশচন্দ্রের হৃদয় এককালে ছিন্ন ও দলিত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস পূর্ববৎ অটল অচলভাবে রাখিয়া স্থির হইয়া রহিলেন।—গিরিশের বিশ্বাস এইক্ষণ হইতে তাঁহাকে প্রায় সন্ন্যাস পদবীতে আরূঢ় করাইল। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, গিরিশচন্দ্রের উভয়পক্ষের সংসারই প্রায় স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইল। কিন্তু, ঠাকুর [যে] মঙ্গলময়—তাঁহার এই বিশ্বাস সর্বসময়ে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহার দৈনন্দিন প্রতি কার্যকলাপ পর্যন্ত অন্য আকারে ধারণ করিল এবং একমাত্র বিশ্বাস বশে গিরিশ, ভক্তির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিলেন। ঐ বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

পুত্রের মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত গিরিশ রঙ্গালয় সংক্রান্ত সর্ববিধ কর্ম হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রথম দিন দর্শনকালে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'এখন যাহা করিতেছ, তাহাই করিয়া যাও, পরে যখন একদিক (সংসার) ভাঙ্গিবে, তখন যাহা হয় হইবে ?'—গিরিশ এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে কি করাইবেন—তদ্বিষয়ে জানিতেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি এখন তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গেই নিরন্তর কালযাপন করিতেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী ও অপার করুণার কথা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াই উল্লসিত অন্তরে অবস্থান করিতেন। ঐরূপ চর্চাকালে তাঁহার সংসারের সর্বপ্রকার বিপদ ও প্রলোভনকে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান হইত, ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করাটা কিছুই মনে হইত না, এবং দিন রাত্র যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহার জ্ঞান থাকিত না। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামক তাঁহার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা একদিন ঐকালে তাঁহাকে বলেন—"ঠাকুর তো তোমায় সন্ন্যাসী করিয়াছেন, তুমি কি করিতে বাটীতে রহিয়াছ ? চলো, দুইজনে কোথাও চলিয়া যাই।" গিরিশ বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিবে, তাহা ঠাকুরের কথাজ্ঞানে আমি এখনি করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিয়া

সন্ন্যাসী হইতেও আমার সামর্থ্য নাই, কারণ ঠাকুরকে আমি যে, বকলমা দিয়াছি।" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "তবে চলিয়া আইস, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস, আমি বলিতেছি।" গিরিশও আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নগ্নপদে, এক বস্ত্রে, বাটী ছাড়িয়া তাঁহার সহিত বাহির হইলেন এবং ঐ বেশে অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন, এতকাল ভোগসুখে লালিত পালিত গিরিশের ভিক্ষাটনাদির [ভিক্ষানটনাদির ?] কষ্ট কখনো সহ্য হইবে না স্থির করিয়া এবং গিরিশের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্তের ঐরূপ পরিভ্রমণে শরীর নষ্ট করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া, তাঁহাকে ঐ কথা বুঝাইয়া বলিলেন এবং বাটীতে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে গমনকরত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিবার পরামর্শ দিলেন। গিরিশও তাঁহাদিগের ঐকথা ঠাকুরেরই কথাজ্ঞানে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মভূমি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিয়া গিরিশচন্দ্র নিজজীবন পরিচালনার জন্য নূতনালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে কৃষাণদিগের সহিত তাহাদিগের সুখদুঃখের আলোচনায়, তাহাদিগের সরল ধর্মবিশ্বাস, নির্ভরশীল জীবন ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অনুষ্ঠানে, ঠাকুর এইসকল দীন গ্রাম্য লোকের ভিতর আবির্ভূত হইয়া কিভাবে বাল্যে ও কৈশোরে ইহাদিগের জীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের চর্চায়, এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অকৃত্রিম ভালোবাসায়, গিরিশের বিশ্বাসী কবিহৃদয় এককালে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন এমনভাবে গিরিশ কখনও প্রাপ্ত হন নাই, হইবার চেষ্টাও করেন নাই। গিরিশ এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, বাস্তবিকই ইনি তাঁহার মাতা, অপরের সংসারে তাঁহাকে নানা কারণে কিছুকালের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া পিতার স্নেহের বালক হইয়া যাইতেন, এখানেও তদ্রূপ সকল কথা ভুলিয়া শ্রীশ্রীমার স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া বালকের ন্যায় কয়েক মাস নিশ্চিন্ত মনে কাটাইয়াছিলেন। দরিদ্র ভিখারী সুদূর গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা করিতে আসিয়া ভাঙ্গা বেহালার সহিত সুর মিলাইয়া যখন গান ধরিত—

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
ওমা লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে।
অপর্ণে যখন তোমায় অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী

আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে।
খ্যাপা খ্যাপা আমায় বলতো দিগম্বরে
গঞ্জনা সহেছি কত ঘরে পরে,
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
বিষয়-বুদ্ধি বটে বিশ্বাস হইল মনে
তা না হলে গৌরীর এতেক গৌরব ক্যানে
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে
মুখ বাঁকায়ে রয় রাধিকার নামে।

—তখন গিরিশ উহাতে ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার বাল্যজীবনের জ্বলন্ত ছবি দেখিতে পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা হইতেন। গিরিশ মাঠে ঘাটে সরল কৃষাণদের সহিত বেড়াইতেন, উদরপূর্ণ করিয়া মার নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা না করিয়া স্বত ই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথার আলোচনা করিয়া সর্বক্ষণ উচ্চ কবিত্ব বা অধ্যাত্ম-চিন্তায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। ফিরিবার কালে গিরিশ শ্রীশ্রীমাকে অকপটে অন্তরের সকল কথা খুলিয়া বলিয়া অত পর তাঁহার ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া গিরিশ কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষাদীক্ষা লইয়া পুস্তক সকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিরিশকে একসময়ে দশহরার দিনে গঙ্গাস্নান করাইয়াছিলেন। গিরিশের ইচ্ছা না থাকিলেও—'তোমরা এসব না মানিলে অপর কে আর মানিবে" —বলিয়া অনুরোধ করিয়া ঐ কার্য করাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন—অতএব আর কোনো বিচার না করিয়াই গিরিশ স্নান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শরীরত্যাগের পরেও গিরিশ সক্ষম হইলে পর্বদিনে গঙ্গায় স্নান করিতেন। একদিন সহসা তাঁহার মনে হইল, ঠাকুর তো আমার সমস্ত ভার লইয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তবে আবার গঙ্গাস্নান করিয়া নিষ্পাপ হইব কেমন করিযা? আবার ভাবিলেন, ঠাকুর তবে ঐরূপ অনুরোধ করিয়া গঙ্গায় স্নান করাইয়া গিয়াছেন কেন? সহসা তাঁহার বিশ্বাস ঐ প্রশ্নের অপূর্ব সমাধান করিয়া দিল। বিশ্বাস বলিল, মা গঙ্গা পাপীর পাপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ করিয়া দেন এবং নিষ্কাম পবিত্র লোকদিগকে স্নানকালে তৃপ্তিপ্রদান করত' নিজে পুণ্য অর্জন করেন। ঠাকুরের কৃপায় আমরা এক-কালে পবিত্র হইয়া গিয়াছি, সুতরাং আমরা স্নান করিলে মা গঙ্গার পাপীদিগকে

উদ্ধার করিবার শক্তি শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গিরিশ বলিতেন, "প্রশ্নের ঐরূপ সমাধানে মনে ভয়ও হইতে লাগিল। পূর্বসংস্কার ও অবিশ্বাস আসিয়া মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত করিল। ঠাকুরকে মনে-মনে চিন্তা করিলাম, দেখিলাম—তিনি যেন প্রসন্নমুখে হাস্য করিতেছেন। তখন আর কিছু না ভাবিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিয়া বলিলাম, 'মা গঙ্গা, ঠাকুরের কৃপায় তোমাকে পবিত্র করিবার জন্য তোমার জলে স্নান করিতেছি,' এই বলিয়া ডুব দিয়া প্রাণে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে-করিতে উঠিয়া আসিলাম। তদবধি গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেই মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইত।'

জীবনের শেষভাগে গিরিশ তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বলিতেন, 'ভাই, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল তোমরা সকলে, আশীর্বাদ করিও, যেন, ঠাকুর মঙ্গলময়—এই জ্ঞান কখনো কোনো অবস্থায় আমার লুপ্ত না হয়।' রোগশয্যায় পতিত হইয়া তিনি একদিন সদর্পে বলিয়াছিলেন, "তোরা ভাবিস কি, আমি এই সামান্য রোগের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি না? ঠাকুরকে জোর করে বলে পঞ্চবটীতলে গড়াগড়ি দিয়ে এসে তোদের এখনি দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর মঙ্গলময়, রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট—যা কিছু জীবনে অনুভব করাচ্ছেন, সকলই আমার মঙ্গলের জন্য, এই ধারণা মনে তাঁর কৃপায় এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, ঐরূপ করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। কল্পতরুতলে আমি যখন যাহা প্রার্থনা করেছি, তখনি তাই পেয়েছি।

গিরিশচন্দ্র যখন শেষ রোগশয্যায় পতিত রহিয়াছেন, তখন কতকগুলি যুবক ভক্ত তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিত্য আগমন করিতেন। ঐ সকল ভক্তদিগের ভাগ্যে ঠাকুরের দর্শন না হইলেও, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন লাভ হইয়াছিল। গিরিশ ইঁহাদের সহিত অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঠাকুরের অপার করুণার কথা আলোচনা করিতে করিতে উল্লাসে রোগের যন্ত্রণা এককালে বিস্মৃত হইতেন। ইঁহাদিগের ভিতর এক ব্যক্তির কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলেও, সুযোগ্য পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক অনুসন্ধানেও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন ঐ ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের উপর ঐ বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে রহিলেন। তাঁহার ঐরূপ আচরণে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ তাঁহাকে নিরন্তর তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পুরুষকার অবলম্বনে চেষ্টা না করিলে, ঠাকুর কি তোমার মেয়ের পাত্র বাড়িতে জুটাইয়া দিবেন? তুমি নিশ্চিতই যথাযথ চেষ্টা করো নাই।" গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে একদিন ঐ ব্যক্তির বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া নানা বাদানুবাদ উপস্থিত করিলেন। ঐ ব্যক্তিও তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন

যে, তিনি ঐ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হইয়াছেন, আবশ্যক অর্থাদিও এ পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টায় কিছুই হইবে না। কিন্তু তাঁহার সে কথা শুনে কে? সকলেই বলিতে লাগিলেন, "তুমি যথাযথ চেষ্টা করো নাই।" লোকচরিত্রজ্ঞ গিরিশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে তাঁহাদিগের ঐ সকল কথা শুনিলেন, পরে ঐ ব্যক্তি সত্যই আঁপনাকে নিরুপায় জ্ঞানে অকপটে ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছে বুঝিয়া, সহসা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন— তুই যদি মেয়ের বিবাহের জন্য আবার ভাবিস তো তোর দিব্য আছে, তোর দিব্য আছে, তোর দিব্য আছে। তুই অকপটে তাঁকে (ঠাকুরকে) ভার দিয়েছিস, দেখি ঠাকুর কেমন ক'রে তোকে এ দায় থেকে উদ্ধার না করেন। গিরিশচন্দ্রের ঐ প্রকার প্রবল "বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যের সম্মুখে সকলে এককালে নীরব হইলেন এবং ঐ ব্যক্তিও আশ্বাসিত হইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। এখন হইতে গিরিশচন্দ্র ঐ ব্যক্তিকে ঐ বিষয়ের জন্য ঠাকুরের উপর বিশ্বাস অবিচলিত রাখিতে নিত্য উৎসাহিত করিতেন। দেহত্যাগের আন্দাজ একমাসকাল পূর্বে তিনি ঐ ব্যক্তির বিশেষ পরিচিত জনৈক ডাক্তারকে নিকটে দেখিয়া বলিয়াছিলেন— "কালিশাল (কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির নাম করিয়া) কটীকে বলিস্ আমি তার কথা ভুলি নাই (অর্থাৎ ঠাকুরকে জানাইযাছি)।' ঠাকুর, তাঁহার [গিরিশের] কথা ঐ ঘটনার অল্পকাল পরেই এমন অদ্ভুতভাবে পূর্ণ করিলেন যে, তাহা শুনিযা বিস্মিত হইতে হয়। জনৈক ধনী ব্যক্তি কন্যাকে দেখিতে আসিয়া বিশেষ পছন্দ করিলেন এবং পিতা বিবাহকার্য সম্পাদনের উপযুক্ত টাকার যোগাড করিবার জন্য একমাস কাল বিবাহ স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি উহাতে স্বীকৃত না হইয়া কন্যার পিতার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়া আপন পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ভক্তগণ তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক প্রথম প্রথম কোনো বিশেষ দর্শন বা আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা লাভরূপ উদ্দেশ্যাবলম্বনে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিতেন, একথা আমরা তাঁদের নিকটে অবগত হইয়াছি। এজন্য শ্রীযুত গিরিশের সহিত তাঁহাদিগের অনেকের অনেক সময় ঐ বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত। আমরা শুনিয়াছি গিরিশচন্দ্র তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের প্রতি সর্বদা বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিলেও, কখনো কখনো তাঁহাদিগকেও ঐ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিতেন, "আচ্ছা ভাই, তোরা যে, মাঝে মাঝে 'কিছু হলনা, কিছু হলনা' বলে আক্ষেপ করিস ও পাহাড়ে-পর্বতে উপোস করে পড়ে থাকতে ছুটিস—এর মানে কি, আমি তো বুঝে উঠতে পারিনা। অথচ দেখি, ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে

ধারণা আমার চেয়ে তোদের বেশী বৈ কম নহে, উহাতে আমার আরও আশ্চর্য বোধ হয়। নিশ্চিতই তোরা ঐ বিষয়ে আমার চেয়ে কিছু-একটা উঁচু জিনিসের আভাস পেয়েছিস, তাই সেটা পূর্ণভাবে দেখবি বলে ঐরূপ করিস। কিন্তু পূর্বজীবনে মেজমেরিজম ও অধুনা হিপনোটিজম চর্চা করে আমার মনে হয়, ভাগ্যে আমি কিছু-একটা অদ্ভুত দেখে ঠাকুরকে বিশ্বাস করি নাই, তাহলেই এখন অকূল পাথার দেখতুম আর কি। মনে হত, ঠাকুর কোনোরূপ হিপনোটাইজ করে আমাকে ঐ অদ্ভুত দর্শন করিয়েছেন ও ফাঁকি দিয়েছেন। কাজেই ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার, এ বিশ্বাস ঠিক রাখা তখন কঠিন হত, নিশ্চয়। সেজন্যই ভাবি, তোরাও তো ঐ সব মানসিক শক্তির (hypnotism etc) কথা পড়েছিস্, অথচ অদ্ভুত দর্শন করতেও চাস্, আবার ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে বিশ্বাসও করিস্। বড় আশ্চর্য বলে, তোরা ঐ সব বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারিস। তাই মনকে বুঝাই যে, তোর ওপথ নয়, তুই কিছু দেখতে চাস্ না। তবে এটা মনে খুব বিশ্বাস আছে যদি ভাব, সমাধি বা কোনো দর্শনলাভ করবার কখনও শখ হয় তো ঠাকুরকে জোর করে ধরে বসলেই তিনি তৎক্ষণাৎ উহা নিজ শক্তিবলে করিয়ে দিবেন।'—ঐরূপে ভক্তিমান গিরিশ তাহার সরল একনিষ্ঠ বিশ্বাসের কথা বলিয়া তাহার গুরুভ্রাতাগণকে মোহিত করিতেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ, গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং নিজ নিজ দর্শনকে মিলাইয়া লইবার জন্য তখন ব্যাকুলভাবে পাহাড় পর্বতে ছুটাছুটি করিতেন।

আবার গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস যে কেবলমাত্র কথার বিশ্বাস ছিল না, উহার জন্য তিনি যে সাংসারিক ও আর্থিক সকল প্রকার ক্ষতিস্বীকার করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, তাহার প্রমাণও অনেক সময় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীর্ঘকাল ব্যাপী অসুস্থতার সময়ে কাশীপুরের উদ্যানে ভক্তগণ ব্যয়ভারে অবসন্ন ও হতোদ্যম হইয়া পড়িলে শ্রীযুত গিরিশই তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভাবনা কি?—(আমার) বাড়িখানা তো আছে। ইঁটের উপর ইঁট যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চিন্তার কারণ কি?—উহা বিক্রয় করিয়া প্রভুর সেবা চালাইব।'—একথা আমরা তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাসে আমরা কখনও ভাঁটা পড়িতে দেখি নাই। তবে, তাঁহার ও তদীয় গুরুভ্রাতাগণের মুখে শুনিয়াছি, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে কোনো সময়ে যখন তিনি ঠাকুরের প্রতি স্বল্পমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, একদিন এক পুরাতন অভিনেত্রীর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়। কয়েকজন বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশচন্দ্র সে-রাত্রি তথায়ই বাস করিতে বাধ্য হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভয় পদাশ্রয় গ্রহণের পূর্ব

হইতেই গিরিশচন্দ্র নিয়ম করিয়াছিলেন, ঐরূপ স্থানে রাত্রিবাস করিবেন না। অদ্য বাধ্য হইয়া উহার বিপরীতাচরণে তাঁহার মনে বিশেষ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রাত্রিবাস সম্বন্ধে যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বাধ্য হইয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক, অদ্য ভঙ্গ করিতে হইল, কল্য আবার কি করিয়া বসিবেন, কে বলিতে পারে? এবং ঐরূপে অবনতির কোন্ স্বয়ংসোপানে উপস্থিত হইবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ঠাকুর কি তবে তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন নাই, নতুবা এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিলেন কেন? চিন্তা ও সন্দেহে অস্থির হইয়া তিনি রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে নির্গত হইলেন এবং একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া পূর্বরাত্রের ও মনের সমস্ত সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহার কথা ধীরভাবে শুনিতে-শুনিতে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"শালা! তুই ভেবেছিস্ তোকে ঢ্যামনা সাপে ধরেছে বুঝি, যে পালিয়ে যাবি, তা নয়, এ জাত সাপের (বিষধর সর্পের—যথা কেউটে গোখরো ইত্যাদি) ধরা, তিন ডাক ডেকেই চুপ করতে হবে, কোনোরকমে পালিয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে থাকতে হবে।' ঠাকুরের কথায় গিরিশ আশ্বস্ত হইলেন এবং তদবধি ঠাকুর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন একথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইলেন।

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে অন্য এক দিবসের অন্য একটি কথাও আমাদের এখানে মনে পড়িতেছে। দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্বে গিরিশচন্দ্র যখন বহুকাল যাবৎ কঠিন রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁহার মনে হইযাছিল—"মৃত্যু তো সন্নিকট, মৃত্যুর পরে কি হইবে বা কোথায় যাইব, তাহার তো কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই, এখন উপায়?" কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি ঐ বিষয়ে নানা আন্দোলন করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। পরে ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে ঐ সময়ে দেখিতে আসিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তিনি ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ভাই, আমায় ঘা কতক জুতো মেরে যাও তো, সত্যি-সত্যি ঘা-কতক জুতো মেরে যাও।" মহেন্দ্রবাবু হাসিতে হাসিতে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁ হে, জুতো খাওয়াই আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার রয়েছেন, তবু কিনা আমি ভাবি, মৃত্যুর পরে আমার কি হবে।"

ঈশ্বরবিশ্বাস যে বহুভাগ্যে প্রাণে উদয় হইয়া থাকে এবং উহাকে সর্বদা সযত্নে রক্ষা না করিলে যে উহার লোপ অবশ্যম্ভাবী, গিরিশচন্দ্র একথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন।

সেজন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৈবীশক্তিভিন্ন এবং তাঁহার আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর-ভিন্ন অপর কোনো বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয়স্বরূপে অবলম্বন করিবার তিলমাত্র ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে উদয় হইলে, তিনি আপনাকে বিশেষ তিরস্কার করিতেন এবং উহা-দিগের ঐরূপ আশ্রয়দান সম্বন্ধে শক্তিহীনতার কথা আলোচনা করিয়া উহাদিগকে সর্বতোভাবে দূরে পরিহার করিতেন। ঐ বিষয়ের একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের কথা আমরা তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। উহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ আলমবাজার বা উত্তর বরাহনগরে যখন অবস্থান করিতেন, তখন গিরিশচন্দ্র মধ্যে-মধ্যে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপে দিবারাত্রি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীগণ আপনা-দিগের মধ্যে ত্যাগের ভাব উদ্দীপিত রাখিবার জন্ত কখনো-কখনো বিশেষ পূজা ও হোমের অনুষ্ঠানপূর্বক তদন্তে ঐ নিজ নিজ বাসনাসংস্কারসমূহ দগ্ধীভূত হইতেছে ভাবিয়া আহুতি প্রদান করিতেন। ঐরূপ অনুষ্ঠানকালে তাহারা সচরাচর ঠাকুরের গৃহী শিষ্য বর্গের কাহাকেও তথায় প্রবেশ করিতে দিতেন না। কল্পনাপ্রবণ গিরিশের মন ঐরূপ হোমের কথা শুনিয়া বিশেষ উল্লসিত হয় এবং সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, তিনি একদিন উহা দেখিবার অনুমতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লন। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও পুত্রের মৃত্যু কিছুকাল পূর্বে হওয়ায়, তিনি তখন একপ্রকার সন্ন্যাসীর মতোই সংসারে অবস্থান করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, হোম দর্শন করিতে করিতে গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন এবং সন্ন্যাসিগণের আহুতিদান সাঙ্গ হইলে, তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নিজ সংস্কারবাসনাদি দগ্ধ করিতেছি চিন্তা করত কয়েকবার আহুতি স্বয় প্রদান করিলেন। পরে যথারীতি অগ্নি বিসর্জিত হইবার পরে অনেকে সেখান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকটি সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা ঐস্থানে বসিয়া কেহ মৌনাবলম্বনে তন্মনস্কভাবে রহিলেন এবং কেহ কেহ পরস্পর ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতাগণের সহিত পূর্বোক্ত প্রকারে আহুতি প্রদান করিয়া গিরিশ পূর্ব হইতে প্রাণে বিশেষ উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন, এখন আবার ইহপরকালে তাঁহার এক-মাত্র আশা-ভরসার নিদান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা পড়ায়, ঐ উল্লাস শতধারে উচ্ছলিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রগল্‌ভ করিয়া তুলিল। তিনি তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অশেষ করুণার নানা দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ উত্তেজিতভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে সহসা তাঁহার ভাবান্তর হইল এবং তিনি স্থির গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অপরে ভাবিল, তিনি ঠাকুরের চিন্তায় তন্ময় হইয়া ঐরূপ করিতেছেন। সেজন্ত কথা কহাইয়া তাঁহার ভাবভঙ্গ না করিয়া আপনারাই

পরস্পরে ঠাকুরের কথা পূর্বোক্ত প্রকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলে যখন ঐরূপে ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন একজন সহসা দেখিতে পাইলেন, গিরিশচন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে হোম স্থণ্ডিলের ভস্মাবশেষের উপর থু থু করিয়া বারত্রয় থূৎকার প্রদানপূর্বক পুনরায় দ্বিগুণোৎসাহে সকলের সহিত যোগ দিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। গিরিশচন্দ্রের ঐরূপ ব্যবহার অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পাছে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় ভাবিয়া, ঐ ব্যক্তি তখন ঐ কথা কাহাকেও না বলিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুত গিরিশকে অন্তরালে দেখিতে পাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশচন্দ্র উহাতে প্রথম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি উহা দেখিতে পাইয়াছ? উহার কারণ আর কিছুই নহে ভাই, কেবল ঠাকুরের কথা কহিতে কহিতে আমার সহসা মনে হইল, ঠাকুর তো আমাকে ঐরূপে হোম করিতে বলেন নাই, উহা তো আমি নিজের ইচ্ছাতেই করিলাম, তবে তো ঠাকুরকে ছাড়িয়া ঐরূপে আগুনে খানিক ঘি পোড়াইয়া আমি আমার মনের বাসনা সংস্কার দূর করিতে স্পর্ধা করিয়াছি—তাঁহার উপর বিশ্বাস না করিয়া হোমের উপর অথবা নিজের উপর বিশ্বাস করিয়া অপরাধী হইয়াছি? হায়! হায়! একপ দুর্বুদ্ধি আমার কেন হইল? ঐরূপ ভাবিয়া ঠাকুরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মন শালা এত বড় পাজি যে, ঐ সময়ে তোমাদের দেখাইয়া বলিল, তুই ঐ কর্মের জন্য আপনাকে যে অপরাধী জ্ঞান করিতেছিস, তাহা তোর ভ্রম মাত্র—ঐ ছাখ না, তোর গুরুভ্রাতারা কেহই তো ঐরূপ ভাবিতেছে না, বরং প্রাণে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উল্লাস অনুভব করিতেছে। তখন ঠাকুরের কৃপায় সুবুদ্ধির উদয় হইয়া বুঝাইয়া দিল যে, আমার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের নির্দেশে ঐরূপ করিয়াছেন, এজন্যই তাঁহারা ঐরূপ অনুষ্ঠানে দোষভাগী হন নাই, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। সেজন্যই ঐ কার্যে বিশেষ অপরাধী হইয়াছি। তখন মনে মনে তোমাদিগকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম এবং আমার অপরাধের নিদর্শনস্বরূপ সম্মুখে বর্তমান ঐ ভস্মাবশেষের উপর একটা বিষম ঘৃণার ভাব মনে উদয় হইয়া যেন জোর করিয়া আমাকে ঐরূপে থূৎকার প্রদান করাইয়া লইল। উহা করিয়া তবে যেন শান্তি পাইলাম। আমার ঐরূপ কার্যে তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না ভাই, আমি ঐরূপে আমার নিজের মন্দ বুদ্ধি ও কার্যের প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি ইহা ভাবিয়া সকলে এ দুর্বল গুরুভ্রাতার প্রতি কৃপা রাখিও এবং আশীর্বাদ করিও, যেন আর কখনও সে ঐরূপে তোমাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া অপরাধী না হয়।" গিরিশ-চন্দ্রের অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ পরে ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঐরূপ কার্যের জন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ না করিয়া, উহা দ্বারা তাঁহার অনন্যচিত্ত হইয়া ঠাকুরকে আশ্রয়-

স্বরূপে অবলম্বনের ইচ্ছাই সূচিত হইয়াছে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত বিশ্বাসভক্তির পরিচায়ক ঐরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ঐসকলের আলোচনায় নিশ্চিত বুঝা যায়, নি স্বার্থ সন্ন্যাসি-বৃন্দ গিরিশচন্দ্রকে কেন সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে অবলোকন করিতেন। হে পাঠক, এখনও কি তোমায় ব'লিবার প্রয়োজন হইবে—গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতায় কি অপূর্ব বিশেষত্ব ছিল? যদি হয়, তবে আইস, গিরিশচন্দ্রের শেষ দুর্গোৎসবের কথা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিই, যেদিন শ্বাসরোগে নির্দয়ভাবে আক্রান্ত হইয়াও তিনি উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া 'মা! এসো, অধম সন্তানের গৃহে একবার পদার্পণ করিয়া তাহার জীবন ধন্য করো' বলিয়া কাতর প্রার্থনায় নিযুক্ত, এবং তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া—একদিকে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী তাঁহার সতী সাধ্বী সঙ্গিনা কুলললনাগণসঙ্গে আগমন করিয়া তদীয় ভবন তীর্থীভূত করিয়াছিলেন—আবার অন্যদিকে তাঁহার সহানুভূতি ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা সমাজ বহির্ভূত, ঘৃণ্য, অভিনেত্রীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া প্রতিমাসম্মুখে ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রসাদ গ্রহণ করাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল। আর, স্মরণ করাইয়া দিই গিরিশচন্দ্রের ধরাধাম পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুর অভয়পদপ্রান্তে সঙ্গত হইবার দিন। যেদিন তাহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সন্ন্যাসী, ভক্ত সাহিত্যসেবক, দরিদ্র এবং রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ—সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিসকল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্নের পতিত আখ্যাপ্রাপ্ত স্তরের লোকসমূহ পর্যন্ত—প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতায়, সজলনয়নে পূত ভাগীরথীতীরে আগমনপূর্বক স্ব স্ব হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তিপুষ্পে তাহাকে অর্চনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে দেবদুর্লভ ঈশ্বরভক্তির যথার্থ বিকাশ না হইলে, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভামাত্র কখনো সর্বশ্রেণীর জনসঙ্ঘকে ঐরূপে আকৃষ্ট করিতে পারিত না—ধর্মৈকপ্রাণ ঋষিকুলের বাসভূমি ভারতে অন্তত ঐরূপ ঘটনা কখনো সম্ভবপর হইত না।

মায়ের কথায় গিরিশ

[শ্রীশ্রীমায়ের কথা থেকে সংকলিত]

মা—"যোগীন যখন দেহ রাখলে, নির্বাণ চাইলে। গিরিশবাবু বললেন, 'ভাখ যোগীন, নির্বাণ নিসনি, নিসনি, নিসনি। ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে—চন্দ্র সূর্য তাঁর চক্ষু—এত বড় ভাবিস্‌নি। যেমন ঠাকুরটি ছিলেন, তেমনটি ভেবে ভেবে তাঁর কাছে চলে যা।"

[চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা" গ্রন্থে এই বিষয়ে পাই—লাটু মহারাজ বলেছিলেন

"যোগীন ভাই [স্বামী যোগানন্দ] দেহ রাখলে। যোগীন ভাই দেহ ছাড়বার সময়ে নির্বাণ চাইছে শুনে গিরিশবাবু তাকে বলেছিলো—'ভাখ যোগে। তার কাছে ওসব চাসনি। তুই ও আকাঙ্ক্ষাটা ছেড়ে দে, তোর কষ্ট কমে যাবে।' গিরিশবাবুর কথা যোগীন ভাই খুব মানতো, তাই বললে—'আচ্ছা জি সি। তোমার কথাই মানবো, কিন্তু কি চাইবো আমায় বলে দিতে হবে।' গিরিশবাবু তখন কি বললে জানো? 'ওরে, তোরা ঠাকুরের সন্তান, তোদের তিনি নির্বাণ দেবেন না, দিতে পারেন না। তোদের যদি নির্বাণ দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর লীলা চলবে কি করে? যতবার তিনি আসবেন, ততবার যে তোদের আসতে হবে, তোরা যে তাঁর অন্তরঙ্গ। তাই বলছি, ওসব চাওয়া টাওয়া ছেড়ে বল—'চাই রামকৃষ্ণকে—চাই রামকৃষ্ণকে—চাই রামকৃষ্ণকে।' গিরিশবাবুও বলেন—যোগীন ভাইও সায় দেয়। এমন সময় কে যেন জিগ্‌গেস করলে—কি দেখছিস ভাই? তাতে যোগীন ভাই কি বললে। তখন স্বামীজী চটে গিয়ে, যে ঐকথা জিগ্‌গেস করেছিলো তাকে বললে, 'তোবা তো আচ্ছা। ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দে না, জি সি'র মতো ওকে তাঁর নাম শোনা না।' নাম শুনতে শুনতে যোগীন ভাই শরীর ছেড়ে দিলো।"]

মা—"পাপ গ্রহণ ক'রে তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] শরীরে ব্যাধি। বলতেন, 'গিরিশের পাপ। ও কষ্ট ভোগ করতে পারবে না।' তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ছিল।

আজ [২৮শে মাঘ, ১৩১৮] মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে বসতেই মা আক্ষেপ ক'রে বললেন "আহা, গিরিশবাবু মারা গেছেন—আজ চারদিন, চতুর্থীর কাজ,

আমায় নিতে এসেছিল। সে নেই—আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে? আহা একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল। কি ভক্তি বিশ্বাসই ছিল। গিরিশ ঘোষের সে-কথা শুনেছ? ঠাকুরকে পুত্রভাবে চেয়েছিল। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, 'হাঁ, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।' তা কে জানে মা, ঠাকুরের শরীর যাবার কিছু-কাল পরে গিরিশের এ ন একটি ছেলে হল, চার বছর হ'য়েও কারো সঙ্গে কথা বলেনি। হাবভাবে সব জানাত। ওরা তো তাকে ঠাকুরের মতো সেবা করত। তার কাপড় জামা, খাবার জন্য রেকাব, বাটি, গেলাস, সমস্ত জিনিসপত্র নূতন ক'রে দিলে—সেসব আর কাউকে ব্যবহার করতে দিত না। গিরিশ বলত, 'ঠাকুরই এসেছেন।' তা ভক্তের আবদার, কে জানে, মা। একদিন আমাকে দেখবার জন্য এমন অস্থির হল যে আমি উপরে যেখানে ছিলুম—সকলকে টেনে টেনে সেইদিকে "উ উ" ক'রে দেখিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে কেউ বোঝেনি। শেষে বুঝতে পেরে আমার কাছে নিয়ে গেল। তখন ঐটুকু ছেলে, আমার পায়ের তলায় পড়ে প্রণাম করলে। তারপর নীচে নেমে গিরিশকে ধরে টানাটানি—আমার কাছে নিয়ে আসবে বলে। সে তো হাউ হাউ ক'রে কাঁদে আর বলে, 'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী।' ছেলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। তখন ছেলে কোলে ক'রে কাঁপতে কাঁপতে, দু'চক্ষে জলধারা, এসে একেবারে আমার পায়ের তলায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে বললে, 'মা এ হতেই তোমার শ্রীচরণদর্শন হল আমার।'* ছেলেটি কিন্তু, মা, চার বছরেই মারা গেল।

এর আগে একদিন গিরিশ ও তার পরিবার তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিল। আমি তখন বলরামবাবুর বাড়িতে বিকেলবেলা ছাদে গেছি। গিরিশের ছাদ হতে তাকালে যে দেখা যায়, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি। পরে তার পরিবারের কাছে শুনলুম সে গিরিশকে বলেছিল, 'ঐ দে', মা ওবাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছেন।' গিরিশ ঐ কথা শুনে অমনি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'না না, আমার পাপ নেত্র, এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।' এই বলে নীচে নেমে গিছিল।"

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২

সুরেনবাবু—মা ধ্যান ট্যান তো কিছুই হয় না।

মা—তা নাই বা হল। ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ, কাশীপুরে। ছেলেরা পালা করে থাকত। তখন গোপাল রয়েছে। ঠাকুরকে ফেলে সে গিয়ে ধ্যান করতে বসেছে। অনেকক্ষণ ধ্যান করছে। গিরিশবাবু এসে শুনে

* মা তখন বরানগর কুটীঘাটায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন।

বললেন, 'চোখ বুজে যাঁর ধ্যান করছে তিনি এখানে রোগশয্যায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আর ও কিনা ধ্যান করতে গেল।'

মাতৃভক্ত গিরিশ

[স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

[১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে যান। সেখানেই প্রথম সরাসরি শ্রীমা সারদাদেবীকে দর্শন করেন এবং চমকিত হয়ে বলেন—'এ্যা, মা তুমি! এই বিস্ময়োক্তির মূলে যে ঘটনা, তার কথা পাঠক আগেই জেনেছেন যৌবনে বিসূচিকা রোগ থেকে যে মাতৃমূর্তির স্বপ্নাদেশ পেয়ে গিরিশের প্রাণরক্ষা হয়, গিরিশ মনে করেছিলেন, তিনি ইনি ছাড়া আর কেউ নন। তারপর—]

তবু মায়ের মুখে সত্য জানিবার জন্য বাহিরে থাকিয়া অপরের দ্বারা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন, শ্রীমা গিরিশকে পূর্বে এইভাবে কখনও দর্শন দিয়াছেন কিনা? মা তাহা স্বীকার করিলেন। তথাপি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় গিরিশ আর একদিন তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন, 'তুমি কি রকম মা?"

মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য, সত্য জননী।"

[১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে] মা যখন সরকারবাড়ি লেনে গুদামবাড়িতে ছিলেন, তখন গিরিশ প্রায়ই সেখানে তাঁহাকে প্রণাম জানাইতে যাইতেন। মা যেদিন সে বাড়ি হইতে দেশে ফিরিবেন, সেদিন কবিবর সেখানে আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুধু স্বামী যোগানন্দকে ডাকিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে উপরে চলিয়া গেলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। গিরিশ শ্রীমাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া যুক্তকরে বলিলেন, 'তোমার কাছে যখন আসি তখন আমার মনে হয় যেন আমি ছোট্ট শিশু, নিজ মায়ের কাছে যাচ্ছি। আমি বয়স্ক ছেলে হলেও মায়ের সেবা করতে পারতুম। কিন্তু সবই উল্টা ব্যাপার—তুমিই আমাদের সেবা করো, আর আমরা করি না। এই তো জয়রামবাটী যাচ্ছ, সেখানে পাড়াগাঁয়ের উনুনের পাশে বসে দেশের লোকের জন্য রাঁধবে, আর তাদের সেবা করবে। আমি কেমন করে তোমার সেবা করব? আর মহামায়ার সেবার কিই বা জানি।" বলিতে বলিতে

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ ও মুখ আরক্তিম হইল। একটু পরে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান ঠিক আমাদের মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পারো যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর স রকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।"

[শ্রীমা একবার দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরছেন। সঙ্গে যোগীন মা এবং গোলাপ মাও আছেন। দারুণ গ্রীষ্মকাল, হাওড়া স্টেশনে প্রায় তিন ঘণ্টা লেট করে গাড়ি পৌছেছে। স্টেশনে মায়ের দর্শনে গেছেন ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি। গোলাপ মা তাঁদের ধমক দিয়ে মাকে প্রণাম করতে দেননি 'হাঁ মহারাজ, তোমাদের কি আক্কেল নেই? এই রোদে মা তেতে পুড়ে এলেন—এখন তোমরাই যদি পেন্নাম করবার জন্য এখানে এসে বিভ্রাট কর, তাহলে অপরের কথা কি?' সুতরাং ওঁদের প্রণাম করা হয়নি। তারপর মাকে বাগবাজারে নিয়ে আসা হল।—]

এমন সময় গিরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত—ঘর্মাক্তকলেবর, গায়ে সামান্য একটা পিরান—তিনিও মায়ের দর্শনার্থী। মহারাজ প্রভৃতিকে নীচে দেখিয়া তিনি মায়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাসাধ্য নিম্নস্বরেই কথা কহিতেছিলেন। তথাপি গলার স্বাভাবিক গম্ভীর আওয়াজ উপরেও পৌছিতেছিল। ইহা শুনিয়া গোলাপ মা নীচে আসিয়া আবার হাওড়া স্টেশনেরই মতো ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার পট পরিবর্তন হইয়া গিয়েছে—আর নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন মহারাজের স্থলে গিরিশচন্দ্র। তাই গোলাপ-মা যেমন বলিলেন, "বলি হাবি যাই ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে। বলি গিরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছ। মা তেতে পুড়ে এলেন, কোথায় একটু জিরোবেন না এখানেও এলে কিনা জ্বালাতন করতে।" অমনি গিরিশবাবু সে কথায় কান না দিয়া সোজা উপরে চলিলেন, এবং স্বামীজীদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'চলো চলো, মহারাজ, বাবুরাম, মাকে দেখে আসি। গোলাপ মার শাসনবাণী পুনরুচ্চারিত হইলে, গিরিশ চাহিয়া বলিলেন, "বাঁজা মেয়ে বলে কিনা মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি। কোথায় এতদিন পরে এসে ছেলের মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আর ইনি মাতৃস্নেহ শেখাচ্ছেন।' তাঁহারা উপরে চলিয়া গেলেন, এবং মাও তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। গোলাপ মাও ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি সজলনয়নে

অভিযোগ করিলেন, "শেষে কিনা গিরিশবাবু আমাকে এরকম বললে।" শ্রীমা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে না অনেকবার বলেছি, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যেও না।" গিরিশবাবু জয়লাভ করিয়া সগর্বে নীচে নামিয়া আসিলেন।

১৩১৪ সালের শারদীয়া পূজার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ এবং তাঁহার দিদি শ্রীযুক্তা দক্ষিণা—স্বামী সারদানন্দের দ্বারা জয়রামবাটীতে পত্র লিখাইলেন, তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা শ্রীমা গিরিশবাবুর বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত থাকেন, তিনি না আসিলে পূজাই ব্যর্থ হইবে। [শ্রীমার শরীর ম্যালেরিয়ায় ভুগে অত্যন্ত খারাপ, তবু তিনি এলেন। গিরিশ বেঁকে বসেছিলেন, মা না এলে পূজা করবেন না।]

দিনকয়েক পরে গিরিশ ভবনে পূজা আরম্ভ হইল। শ্রীমায়ের সম্মুখেই কল্পারম্ভ হইল। এদিকে আবার বলরাম ভবনে আর এক পূজার সূত্রপাত হইল। সপ্তমীর দিন প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে ভক্ত আসিয়া শ্রীমায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি শত শত ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। পরে গিরিশ ভবন হইতে সংবাদ পাইয়া পূজা দর্শনার্থ তথায় গেলেন এবং পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রহিলেন। মহাষ্টমী দিনেও শ্রীমা বলরাম গৃহে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করিলেন। গিরিশ ভবনেও তাহাই করিতে হইল। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকিলেও চাদর মুড়ি দিয়া তিনি সকলের পূজা স্বীকার করিলেন, কাহাকেও বিফলমনোরথ করিলেন না। দুইদিন এইরূপ পরিশ্রমের পর স্থির হইল যে, সন্ধি পূজায় মা উপস্থিত থাকিবেন না। সেবার গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা। গিরিশ ও তাঁহার দিদি সংবাদ পাইয়া দুঃখে মুহ্যমান হইলেন, এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধিপূজার কিছু পূর্বে শ্রীমা বলিলেন যে, তিনি গিরিশ-ভবনে যাইবেন এবং তদনুসারে বলরামবাবুর বাটীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সরু গলি দিয়া তিনি ও স্ত্রীভক্তগণ হাঁটিয়া চলিলেন। গিরিশের খিড়কির দরজায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমা দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন—"আমি এসেছি।"

গিরিশ ভক্তদের সহিত উপরে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"যখন মা-ই আসিলেন না, তখন পূজামণ্ডপে যাওয়া বৃথা।" এখন মায়ের আগমন-সংবাদে সোল্লাসে গদগদস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আমার পূজাই হল না। এমন সময়, মা দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন—আমি এসেছি। তাড়াতাড়ি সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমা প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি

হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

নবমী পূজাও এইভাবেই কাটিয়া গেল। তিন দিনই শ্রীমা সকলের অর্ঘ্য লইলেন। গিরিশের আত্মীয়-স্বজন, এমন কি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত, কেহই বঞ্চিত হইল না।

শ্রীমায়ের গিরিশ নাট্য-দর্শন

[ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত শ্রীশ্রীসারদাদেবী গ্রন্থ হইতে স কলিত।]

আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে এই নাটকগুলির অভিনয় দেখার কথা জানা গিয়াছে

গিরিশচন্দ্রের—দক্ষযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, জনা, পাণ্ডবগৌরব, কালাপাহাড়, এবং অপরেশচন্দ্রের—রামানুজ।

দক্ষযজ্ঞ অভিনয় দর্শনে মা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে একরাত্রে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও জনা অভিনীত হয়—কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে। গিরিশবাবু সাধক ও বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করেন। ঐ একই রঙ্গমঞ্চে পাণ্ডব গৌরব অভিনয়ে গিরিশবাবু কঞ্চুকী সাজিয়াছিলেন। অভিনয়শেষে মা সমাধিস্থ হন। মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনের দিন কালাপাহাড় অভিনীত হয়। গিরিশবাবু তখন পরলোকে। মিনার্ভায় রামানুজ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত শ্রীরামানুজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া, সেই বেশে সজ্জিতা তারাসুন্দরী প্রণাম করিতে আসিলে 'আয় মা আয়' বলিয়া মা তাহাকে আদর করেন।

বিবেকানন্দ-গিরিশ সংবাদ

[শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত স্বামী শিষ্য স বাদ থেকে স কলিত।]

[দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব। মার্চ, ১৮৯৭]। পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশবাবু পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহু লোকের

সঙ্গে স্বামীজী গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া "এই যে ঘোষজা!" বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবুও তাঁহাকে করজোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশবাবুকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "তা বটে, তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।' এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে-সকল কথা হইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

[বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি। মার্চ, ১৮৯৭]। [স্বামীজীর সঙ্গে যখন বেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে] এইসকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—'বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় (ন্যায়দর্শনের গ্রন্থবিশেষ) এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে কিন্তু Terminology র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে।"

এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—"কি জি সি, এসব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।"

গিরিশবাবু— কি পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ওসব দরকার নেই।"

এইকথা বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুন পুন প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—"জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।"

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন—'হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছেন? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নী, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি, ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে, ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি করে বিধবার

সর্বস্ব হরণ করেছে—এ সকল রহিত করবার কোনো উপায় তোমার বেদে আছে কি ?"

গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখলি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ। তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না, কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।

শিষ্য—"মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল, আপনি মাঝার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।'

গিরিশবাবু—"জগতের এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সেদিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন। রেখে দে তোর বেদ বেদান্ত।

শিষ্য— আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান কি না। কিন্তু এইসব শাস্ত্র যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।"

গিরিশবাবু— বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দ্যাখ না তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না—'সৎ চিৎ আনন্দ'—তিনটে একই জিনিস ? এই দ্যাখ না, স্বামীজী কত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শোনা, ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদবেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো অমন বেদ বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।'

শিষ্য নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই তো গিরিশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কি রে তোদের কি কথা হচ্ছিল ?

শিষ্য—"এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক-ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।"

স্বামীজী—"গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওঁর (গিরিশবাবুর) মতো

যাদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওঁকে (গিরিশবাবুর) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখনো ওঁর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।"

শিষ্য—'আজ্ঞে হাঁ।'

স্বামীজী—"আজ্ঞে হাঁ নয়। যা বলি সেসব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদ্‌যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে এইসব নিয়ে পথে চলবি। বিচার করতে-করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি?'

শিষ্য—'হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, 'কি হবে ও-সব পড়ে?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?"

স্বামীজী— আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (দিক) থেকে আমাদের দু জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় 'মূকাস্বাদনবৎ।' আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠন পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি?

নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, শুনিলেন তো, স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।'

গিরিশবাবু—"তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'ওরে এই জি সি র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?

সদানন্দ—"মহারাজ। জো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী—'প্রথমে ছোটখাট scale এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরীব দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ—"জো হুকুম মহারাজ।"

স্বামীজী—"জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।'

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—'দেখো গিরিশবাবু, মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে?

গিরিশবাবু—"তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন।

এই বলিয়া গিরিশবাবু কাযান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

[১ মে ১৮৯৭। বলরাম ভবনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা সভা হয়েছে। তার-পর—] স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন 'জি সি মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি, সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বলো?'

গিরিশবাবু—"আমি আর কি বলব? তুমি তাঁর ভাবের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।"

স্বামীজী—'আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কাজ করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide (পরিচালনা) করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না।"

গিরিশবাবু—"তিনি বলেছিলেন, 'সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে'?"

এইরূপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ

জিজ্ঞাসা করায় গিরিশবাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি—ঐরূপ কথা বেশী কইতে কইতে ওর সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়—সে-যে কে, এ কথা যদি জানতে পারে, তবে আর এক মুহূর্তও তার দেহ থাকবে না।"

[ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে স্থাপিত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজার পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠে উপস্থিত হয়েছেন।]

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল।

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে যুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া 'কৃজন্তং রামরামেতি' স্তবটি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে, এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' এইকথা পুন পুন উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধনিমীলিত নেত্র, হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না। এইরূপে প্রায় অর্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোনো কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা।

রামনাম কীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।" স্বামী সারদানন্দ (অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত।) 'একরূপ অরূপ নাম বরণ" গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ, ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন—"পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার।' আমাদের সঙ্গে এঁর কোনো প্রভেদ নেই।"

গিরিশবাবু নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজি। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবাবুকে পরানো হইল। গিরিশ-বাবু কোনো আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন—"জি সি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শোনাবে। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বোস্।"

গিরিশবাবুর তখনও মুখে কোনো কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলব? কামকাঞ্চন ত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করুণা অনুভব করি।' কথাগুলি বলিতে-বলিতে গিরিশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না।

স্বামীজী কিন্নর কণ্ঠে গান ধরিলেন

"দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে॥ "

গিরিশবাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সবারে"—পদটি বারবার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর "মজলো আমার মন ভ্রমরা কালী পদ নীলকমলে ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোত্তমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধূম পড়িয়া গেল।

[১৮৯৮, বেলুড় মঠ নির্মাণকালে। কৃপাবাদ নিয়ে আলোচনাসূত্রে—]

শিষ্য—"কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতারজীবনে তো ইহাও দেখা যায়—যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধনভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বরলাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি?"

স্বামীজী—"জানবি, তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে-করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল, হৃদয়ে এত অভাব-বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে ঐ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।"

শিষ্য—"তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও তো তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?"

স্বামীজী—"হাঁ, তা হবেনা কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়িতে ঢোকা ভালো নয় কি? এবং ঐ পথেও তো 'কি করে মনের এ অশান্তি দূর করি'—এইরূপ একটা বিষম হাঁকপাকানি ও চেষ্টা আছে।"

শিষ্য—"তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী, এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরমপদ দেন।

স্বামীজী— হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল, সিদ্ধ হবার পর লোকে এদেরই 'কৃপা সিদ্ধ' বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত—এ উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য—'তাহাতে আর সন্দেহ কি। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, 'কৃপাপক্ষে কোনো নিয়ম নেই, যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে আইনী কারখানা'।

স্বামীজী— তা নয় রে, তা নয়। ঘোষজ যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশকাল নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা, সেখানে Law of Causation (কার্য কারণ সম্বন্ধ) নেই, কাজেই সেখানে কে কাবে কৃপা করবে? সেখানে সেবা সেবক, ধ্যাতা ধ্যেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।

[জুন, ১৯০১, বেলুড়মঠ] মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া [স্বামীজী] বলিলেন—"এ একটা অদ্ভুত জিনিয়াস তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদ বধে'র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"

শিষ্য—"কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

স্বামীজী—'তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। এই 'মেঘনাদবধ কাব্য'—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছুঁচোবধ কাব্য' লেখা হল। এই যে জি সি কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise (সমালোচনা) করছে—দোষ ধরছে। জি-সি কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোকে ঐসব বই appreciate (আদর) করবে।"

গিরিশ-স্মৃতিকথায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

[মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী (১ম ২য়) থেকে সংকলিত। মহেন্দ্রনাথ স্বয় গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্তের কাছে এই প্রসঙ্গে যা শুনেছেন তা পুনঃ পরিবেশন করেছেন উল্লিখিত গ্রন্থে]

গরমকাল—একদিন বৈকালবেলা যোগেন মহারাজের সহিত বর্তমান লেখক [মহেন্দ্রনাথ] গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে গেলেন। যোগেন মহারাজ সদর দোরের উপরে যে দুটি দরজা আছে পশ্চিমদিকের দরজার মধ্যস্থলের দেওয়ালেতে ঠেস দিয়া বসিলেন। গিরিশবাবু ঘরের মাঝখানটিতে বসিলেন এবং বর্তমান লেখক দক্ষিণ-দিকের দেওয়ালের কাছে ঠেস দিয়া ঠিক যোগেন মহারাজের সম্মুখে বসিলেন। ঘরে বোধহয় আরও কেহ কেহ ছিল। কিন্তু অনেক দিনের কথা, ঠিক নাম স্মরণ হচ্ছে না সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছিলেন কারণ তিনি তখন গিরিশবাবুর কাছে কাজ করিতেন। সেইসময় থিয়েটারে মামলা মকদ্দমা চলিতেছিল, বোধহয় কোনো সুখবর হইয়াছে তাই গিরিশবাবু সেদিন বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। গিরিশবাবুর পাতলা অল্প অল্প দাড়ি মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথে কাটা ও গা খালি ছিল। গিরিশবাবু মুখভঙ্গি করিয়া যোগেন মহারাজকে বলিলেন, 'হ্যাঁরে যোগে, তুই শালার মনে আছে সেদিন কি করে বাতি নিয়ে গিয়েছিলি?' যোগেন মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দূর শালা, সেদিন আমার কি বিপদই গেল! তিনি [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব] কিনা এক পাঁড় মাতালের কাছে ফেলে দিয়েছিলেন।' গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে যোগে, বল দেখি, তারপর কি হয়েছিল, সব ব্যাপারটা বল তো একবার।" যোগেন মহারাজ বলিতে শুরু করিলেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর [ঠাকুরের] ঘরের বাতি ফুরিয়ে গেছল, আমাকে বললেন 'যা, গিরিশের কাছ থেকে একটা বাতি নিয়ে আয়, আর গিরিশের সঙ্গে দেখা করে আয়।' আমি তখন কে গিরিশ কিছুই জানিনে, শুনেছি গিরিশ নামে থিয়েটারওয়ালা একটা পাঁড় মাতাল আছে। আমি তো বাড়ি খুঁজে খুঁজে এইখানে এসে বসলুম। ছেলেমানুষ অত শত বুঝি সুঝিনি।" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তারপর কি হল যোগে, বল তো।' যোগেন মহারাজ বলিলেন, 'তখন তুই তো মাতাল হয়েছিলি—আমার কেবল ভয় হতে লাগল পাছে তুই আমায় কামড়ে দিস। আর মনে-মনে করছি, বাতি

কি আর দোকানে পাওয়া যায় না, দু-পয়সা না-হয় তিন পয়সা দাম হবে। একটা বাতির জন্য এক রাজ্যি থেকে আর এক রাজ্যি আসা, আর এই শালা পাঁড় মাতা-লের সামনে আসা।" পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া গিরিশবাবু আরও হাসিয়া বলিলেন, "যোগেন, আরও কি হয়েছিল বল দেখি, একবার শুনি।" যোগেন মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "আরে আমি ছেলেমানুষ, আমার তখন অল্পবয়স, আমি ঘরের ঐখানটাতে বসে রইলুম, তুই শালা তখন চুর মাতাল হয়ে টলতে টলতেই ঘরে ঢুকলি। তোর সেই চেহারা দেখেই তো আমার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলি, 'কোত্থেকে এসেছ?' আমি বললুম, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই একটা বাতির জন্য আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' তুই বললি, 'একটা কেন, একটা প্যাকেট নিয়ে যাও।' তারপর থ্যাবড়ানি মেরে ঘরের মধ্যিখানে বসলি। তখন মাল টেনেছিলি কিনা, তোর মুখে যা আসতে লাগল তাই বলে তাঁকে গাল পাড়তে লাগলি। আর মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে মনে মনে কি ভেবে মেজেতে টিপ টিপ করে তিনটি গড় করতে লাগলি। আবার গাল শুরু করলি, মখের তো কোনো আঁট ছিল না। আবার দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে কি ভেবে আবার মেজেতে গড় করতে শুরু করলি। আমি যত উঠে পালাতে চাই, তুই শালা তত আমাকে বসিয়ে রাখিস। পালাতেও দিবিনি, আর বাতিও দিবিনি। তারপর সন্ধ্যার পর এক বাণ্ডিল বাতি আনিয়ে দিলি। আমি তো বাতি নিয়ে একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়। দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে বাতিটি দিয়ে বললুম, 'কোথায় পাঠিয়েছিলেন আমায় একটা বাতির জন্য। একটা ত্রিপণ্ড মাতাল, খালি গাল, খেউড় ওড়াতে লাগলো।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁরে, গাল তো দিয়েছিল, আর কি করেছিল বল দেখি?' তখন আমি বললাম, 'মাঝে মাঝে দক্ষিণে-শ্বরের দিকে মুখ করে কি বলতে লাগলো আর মেজেতে টিপ টিপ করে তিনটি করে গড় করলে।' তিনি আমার প্রতি একটু রাগ করে বললেন, 'তুই কেবল গালটা দেখলি, ভালটা দেখলিনি। কি ভক্তি, কি টান? ওরা এক থাকের ভক্ত, খুব উঁচুদরের ভক্ত, তবে পথটা অন্ত।' আমি মনে মনে বললুম—ভক্ত হয় হোকগে, ও শালা মাতালের কাছে আর আমি যাব না।" গিরিশবাবু শুনিয়া আনন্দে টুবুটুবু হইয়া উঠিলেন। আর যেন আনন্দ রাখতে পারলেন না। গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন, 'দেখ যোগে, সেদিন ভুনির (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু) ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ। গিয়ে তো খেতে বসলুম। জ্ঞাত-ভোজন, খুব ভাল খাইয়েছিল। তারপর বুঝলি কিনা খুব মাল টেনেছিলুম। কাচা-কোঁচা খুলে গেছে। এসেই তোকে দেখি। তিনি যে একটা বাতির জন্য আমার কাছে তোকে পাঠিয়েছেন, এই কথায় আমার একটা কি আহ্লাদ হল যে, সে আর বুকে চেপে রাখতে পারলুম না। আমি ভাবতে

লাগলুম, আমার উপর এত দয়া যে, সামান্য একটা বাতির জন্য আমার কাছে তিনি লোক পাঠিয়েছেন। আমার কি সৌভাগ্য! এই পাঁচ কথা ভেবে আমার এমন আহ্লাদ হল যে, সব ভুলে গেছলুম, তার উপর রং এ ছিলুম, কি করে আহ্লাদ প্রকাশ করব কিছু খুঁজে না পেয়ে যা মুখে এসেছে তাই বলেছি আর একটা করে প্রণাম করেছি। সেদিন এমন আহ্লাদ হয়েছিল যে, বহুদিন সেরকম আহ্লাদ আমার জীবনে হয়নি। সেদিন আমার ঠিক বিশ্বাস হল যে, তিনি আমায় নিশ্চয় কৃপা করেছেন ও গ্রহণ করেছেন।"

সে সময় রাস্তায় তত বাড়ি হয় নাই, তাই গিরিশবাবুর বৈঠকখানা থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্পষ্ট দেখা যাইত। গিরিশবাবু তাই মন্দিরটির দিকে দৃষ্টি করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন এবং যখন এই কথা হইতেছিল তখন গিরিশবাবু মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া জোড় হাতে মন্দিরের দিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের] প্রণামের কথা বলিতে বলিতে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন

"দেখো, রাম অবতারে ধনুকবাণে জগৎ জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে বংশীধ্বনিতে জগৎ জয় হয়েছিল, এবার প্রণাম অস্ত্রে জগৎ জয় হবে।

গিরিশবাবু কথাগুলি এমন ওজস্বিভাবে বলিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল গিরিশবাবু নূতনভাবে প্রণামের ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামে ও বিনয়ে যে একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল, এইটাই তিনি সেদিন সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

[গিরিশবাবু বলিলেন চৈতন্যলীলা লেখার পরে] ঠাকুর প্রীত হয়ে আমাকে বললেন, "এইবার তোমার মনের পর্দা উঠে যাবে।' তখন মাল টেনেছিলুম, কথাটার মর্ম বুঝতে পারলুম না। কিন্তু ভিতরে যেন একটা আশ্বাস আনন্দ উঠতে লাগল।

একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরামবাবুর বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তথায় অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরে যোগেন মহারাজ ও অপর দু'একজনকে সঙ্গে লইয়া গিরিশবাবুর বাড়ি গেলেন। গিরিশবাবু সম্ভবত একটু রংএ ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াই আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবেন, কি করিয়া আদর যত্ন করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া একেবারে এলোমেলো হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার চাকর ঈশানকে বাজার হইতে

লুচি ও আলুর দম আনিতে বলিলেন, এবং প্রত্যহ যে-কাঁসার থালায় খাইতেন সেই থালাখানি আনিতে বলিলেন। বৈঠকখানার ঘরে তোষক পাতা, তার উপর লম্বা জাজিম, তাহার উপর গিরিশবাবু কাঁসার থালায় লুচি ও আলুর দম রাখিলেন। জাজিমের উপর সকলে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ অপরের ব্যবহৃত থালায় ও অপরিষ্কৃত স্থানে খাইতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু তখন একটু গোলাপী অবস্থায় ছিলেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন বলরামের বাড়িতে খেতে পারেন আর এখানে খেতে যত আপত্তি ?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুর এইরূপ অকপট ভালবাসা, ও শুচি অশুচির কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই দেখিয়া, প্রীত হইয়া লুচি ও আলুর দম খাইতে লাগিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তখন ঈশানে চাকরকে বলিলেন, "দ্যাথ দিকিনি সকালে পুঁইশাক ও চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি হয়েছিল, সেটা খেতে বড় ভালো হয়েছিল—থাকে যদি নিয়ে আয়।' ঈশানে চাকর একটা পাত্র করে সকালকার পুঁই শাক চচ্চড়ি রান্নাঘর থেকে লইয়া আসিল ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের থালায় ঢালিয়া দিল। যিনি অপরে কেহ স্পর্শ করিলে বা কোনোপ্রকার অশুচি হইলে, আহার জিনিস খাইতে পারিতেন না, তিনি কোনো দ্বিধা না করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে পুঁইশাক চচ্চড়ি ও লুচি খাইতে লাগিলেন। যোগেন মহারাজ প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'বলরামের কাছে বলরামের ভাব, গিরিশের কাছে গিরিশের ভাব।"

গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন 'দক্ষিণেশ্বরে একদিন একথা ওকথার পর, সাধুদের আচরণের কথা উঠল। ঠাকুর মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলপ্রকার লোকের চরিত্র হাব ভাব ভঙ্গিমা বা কথাবার্তা তিনি হুবহু নকল করে দেখাতেন, এবং প্রত্যেক লোকের পোশাক পরিচ্ছদে কিরূপ মনের ভাবপরিবর্তন হয়, তাও তিনি বিশেষ করে বলতে পারতেন। অর্থাৎ নর চরিত্রের কোনো বিষয় তার নিকট অজ্ঞাত ছিল না, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝতেন ও দেখাতেন। এই প্রসঙ্গে একপ্রকারের ব্যবসায়ী সাধুদের কথা উঠল, যারা বেশভূষা বা বাহ্যিক আচারে পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'এসব লোকের কি জানো ? লম্বা জামা পরে, জামার আস্তিনটা কনুই পর্যন্ত থাকে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—সেগুলি আবার সোনার বা রুপার তারে গাঁথা, মাঝে মাঝে একটি প্রবাল বা অন্য দামী জিনিস দেয়। কথাবার্তায় তারা সবজান্তা, আর এইরূপ করে তারা হাত নাড়ে।" এই বলে তিনি ডান হাতের তর্জনী কিছু উঁচু করে এবং অবশিষ্ট

তিনটি আঙ্গুল নীচু করে হাতের পাতাটা ছুলিয়ে তাদের ভাব ভঙ্গী দেখাতে লাগলেন। গলা কি করে সঞ্চালন করতে হয়, কণ্ঠস্বর কিরূপ পরিবর্তন করতে হয়, চক্ষু ও মুখভঙ্গী কিরূপে নানাপ্রকার করতে হয়, তাই ঠাকুর সেইদিন হুবহু দেখাতে লাগলেন। আমি নিজে অভিনেতা, অভিনয় করাই আমার ব্যবসা, কিন্তু ঠাকুরের ব্যবসায়ী সাধুর অভিনয় করা এত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে, সেটা হুবহু শিখে নিনুম এবং অভিনয়কালে ঠিক সেইরকমই দেখাতুম।

গিরিশবাবু অনেক সময় কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদর্শিত ভাব ভঙ্গী ও হস্ত সঞ্চালন করিয়া সকলকে দেখাইতেন। গিরিশবাবু বলিতেন যে, তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সব বিষয়ে উৎকর্ষ ছিল। বিল্বমঙ্গলে [ভণ্ড] সাধকের পালা যে, এত উত্তম হইয়াছিল, কারণ তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদর্শিত পথের অনুসরণ ছিল, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক আত্মীয় সাক্ষাৎ করিতে আইসে। ব্যক্তিটি গ্রাম্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদবন্দনা বা প্রণাম না করিয়া বসিয়া রহিল। পূজ্যপাদ গিরিশবাবু লোকটিকে বলিলেন কি ঠাকুর, দেখছ কি, যদি উদ্ধার হতে চাও (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) ওঁর পায়ের ধুলো নাও, তবে উদ্ধার হবে।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, ওগো বলিস্ কি? ও যে আমার মামাশ্বশুর।" গিরিশবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। নরেন্দ্রনাথ চট করিয়া বলিলেন, 'রাখুন মশায় আপনার মামাশ্বশুর। আপনার বাপ এলেও তাঁর ঘাড় ধরে আপনাকে প্রণাম করিয়ে নেব।' গিরিশবাবু বলিলেন "তখন বাঁচলুম, নরেন আমার দিকে ওকালতি করলে।"

[শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পরে] জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অস্থির ঘড়াটি মাথায় লইয়া শশী মহারাজ রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি হইতে সংকীর্তনের দল সঙ্গে লইয়া কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে চলিলেন। প্রথম পথটা শশী মহারাজ ঘড়াটি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পথ অনেক দূর হওয়ায় শেষপথে গোপালদাদা ঘড়াটি মাথায় করিয়াছিলেন। নৃত্য গান কিছু তৈরি না হওয়ায় গিরিশবাবুর চৈতন্যলীলার শেষ গানটি সকলে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিলেন

হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়।

কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে, অকুলে ভাসি ,
হৃদবিদারী, কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় ।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে গিরিশবাবুর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবু) বিশেষ অসুখ হয়। গিরিশবাবু বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ঔষধাদির যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহা সমস্তই হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত সকলকে গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন

"দেখ দানীর অসুখের জন্য ঔষধপত্র যা করবার সব করেছি। আজ দুপুরবেলায় আর এক কাজ করেছি। বাড়ির ভিতর গিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকলুম, তখন কেউ ছিল না, একটা প্রণাম করে দাড়িয়ে উঠে সব অসুখের কথা তাঁকে বললুম। আর বললুম যে, আমার ছেলে তুমি ভাল করে দাও ? তারপর মুখে যা এলো সব বলে, গাল পাড়তে শুরু করলুম। তাঁর চৌদ্দপুরুষের অন্ত করে এলুম। তখন রেগে গিয়েছিলুম, মুখে যা এলো তাই বললুম—বললুম যে, তুই যদি অবতার হোস্ তো আমার ছেলেকে ভাল করে দে তা না হলে মুখ খারাপ করে গাল দেবো। এখন দেখো, আমার ছেলে নিশ্চয় ভাল হবে।'

এই বলিয়া গিরিশবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কথাগুলি যাহা হউক না কেন, গিরিশবাবু এমন নিষ্ঠা ও নির্ভরের ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিলেন।

গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন

'একদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্র ও আমি একটি আমগাছের তলাতে কাশীপুরের বাগানে ধ্যান করছি। ধ্যানটা জমে উঠেছে। কিন্তু আমবাগানের মশা ধ্যানের বড় অন্তরায় হল। আমি দু'চার বার হাত চাপড়ে তাড়াতে লাগলাম। কিন্তু মশার উৎপাত কমল না। আমি চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। নরেন্দ্রনাথ সম্মুখে পদ্মাসনে বসে আছে, তাকে কেমন করে ছেড়ে যাই। মৃদুভাবে তাকে দু'চার বার ডাকলাম। কোনও সাড়া পেলাম না। অবশেষে গাত্র স্পর্শ করে কিঞ্চিৎ দোলালাম। কোনও সাড়া শব্দ নাই। গায়ে কম্বলের মতো মশা বসে আছে। আমি দু' একটা মশার কামড় সহ্য করতে পারি নাই আর নরেন্দ্রের গায়ে অসংখ্য মশা বসে আছে। সাড়া শব্দ নাই। আমার তখন ভয় হল। এ আবার কি ব্যাপার। আমি

তাকে ধরে উল্টে ফেলে দিলাম। নরেন্দ্রনাথ পদ্মাসনে যেমন আসীন ছিল তেমনই উল্টে পড়ল, সংজ্ঞা নাই। অনেক কষ্টে নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞা আনালাম। নরেন্দ্রনাথ উঠে হেসে আমাকে বলল, "দূর শালা জি-সি, অত ভয় খাস কেন?"

গিরিশবাবু এই সময়ে "বিল্বমঙ্গল" নাটক লেখেন। "বিল্বমঙ্গল" নাটকখানি ভাল হইল কি মন্দ হইল, এ মতামত পাইতেছিলেন না। সাধারণ লোক নাচগান দেখে-শুনে আসে, তাহাতে কাব্যের কোনো গুণাগুণ পরিচয় হয় না। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বইখানা পড়িতে অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রনাথ চোরের পালাটা, অর্থাৎ ভিক্ষুকের পালাটা পড়িয়া বলিলেন—'জি সি, চোর ঠিক এই কাজ করে, চোরের স্বভাব ঠিক এই প্রকার। এবং আরও বলিলেন, "ছাখো আমি সংস্কৃত এবং ইংরাজিতে বহু কাব্য পড়েছি, মিল্টন, শেক্সপীয়র, কালিদাস আমার কণ্ঠস্থ রয়েছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গল-খানা কেমন আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে, অন্য বইগুলি তত ভাল লাগছে না। বিল্বমঙ্গলখানা আমার বড় ভাল লাগছে।'

'গিরিশবাবু সম্ভবত নরেন্দ্রনাথকে "বিল্বমঙ্গল' অভিনয় দেখাইবার জন্য লইয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে পর, দর্শকবৃন্দ সকলে চলিয়া গেলে, গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া রঙ্গমঞ্চে ঢুকিলেন। তখন ভিড় নাই—সকলেই একটু ঢিরিবিলি কথা-বার্তা কহিতেছেন, নর্তক নর্তকীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান আছে, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। নর্তক নর্তকীগণ মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল এবং আপনা আপনি কথা কহিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে বসিয়া একটি তানপুরা লইয়া স্থিরভাবে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার শক্তি জাগিয়া উঠিল। চক্ষু নিমীলিত, কণ্ঠ হইতে ভক্তিপূর্ণ স্বর উঠিতেছে এবং দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, ঠিক যেন নিজের প্রত্যক্ষ ইষ্টকে দর্শন করিয়া সুস্বরে আহ্বান করিতেছেন। স্থানটি নর্তকাগার হইতে দেবমন্দিরে পরিণত হইল, ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ চতুর্দিকে যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল। বায়ু যেন ধর্ম, পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চপলস্বভাব নর্তকীবৃন্দ তখন ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং কাহার সম্মুখে পূর্বে তাহারা চাপল্যভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এই চিন্তায় কম্পিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া করজোড়ে অতি বিনীতভাবে দূরে দণ্ডায়মান রহিল। গিরিশবাবু তখন নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ও গভীর চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একটু চিন্তিত ও উন্মনা হইলেন, এবং ঐরূপ ভাব আর যাহাতে পরিবর্ধিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের হাত হইতে তানপুরা উঠাইয়া

লইলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া নিজের গাড়িতে বসাইলেন এবং বাগবাজারে আনিলেন। নরেন্দ্রনাথের ইহাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই, বা তিনি এই ব্যাপারকে কিছু অস্বাভাবিক মনে করেন নাই। স্বভাবসিদ্ধ কাজই করিয়াছেন, ধ্যান ভজন করিয়াছেন—তাহা কোন্ স্থানে তাঁহার অত স্মরণ নাই। কিন্তু পরদিবস নর্তকীবৃন্দ গিরিশবাবুকে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি করিয়াছিলেন কি? আমরা চঞ্চলমতি নর্তকী, এরূপ শক্তিমান মহাপুরুষকে হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আনা আপনার ঠিক হয় নাই। যদি কোনো বিষয়ে আমাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত তাহা হইলে সেই পাপে আমরা একেবারেই ধ্বংস হইতাম। আমাদের ইহকাল তো গিয়াছেই, পরকালও ঐ সঙ্গে যাইত।'

বরাহনগরের মঠ স্থাপনের অল্পদিন পরে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনীত হয়। তৎপ্রণীত বিখ্যাত গীত

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই?
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায়? আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে, আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল?
কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা—কূল কি নাই?

কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
কে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই ॥

এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে গাহিতেন। [রাত্রে গাহিলে] পাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেন। সুর, তাল, রাগের কথা নহে, কিন্তু ভিতরের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্তভাবে গানটি গাহিতেন। যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন তাঁহাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না—সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন। এই গানটি বরাহনগর মঠে সর্বদাই গীত হইত।

সেই সময় নরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলার গান গাহিতেন

রাধা বই আর নাইকো আমার
রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,
তারে বড় ভালবাসি ॥

রাত্রে বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রাণের ভিতর থেকে, নিজেদের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই উল্লেখ করিয়া অতি মধুর করুণ স্বরে গাহিতেন। গানের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক শব্দটি শ্রোতার গাত্র বিদ্ধ করিয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিত। যথার্থই তো গায়ে ভস্ম মেখে নগ্নপদে ভিক্ষুক হইয়া ভগবান লাভের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। সেইজন্য এই গানটি সেইসময়ের উপযোগী হওয়ায় লোকের পক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ আর একটি চৈতন্যবিষয়ক গান গাহিতেন এবং তাঁহার দু চক্ষে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইত

তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ।

কত পাষণ্ড তনয়　　　　কত কথা কয়

তবু নাকি প্রেম যেচেছ ॥

গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেব-চরিত' রাত্রে অভিনীত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথের মাথা নেড়া, শুধু পা, রাত্রি জাগরণ ও অনবরত জপধ্যান করায় শরীর কৃশ, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল, গিরিশবাবুর উপরকার ঘরটিতে বারান্দার দিকের দ্বারের মধ্যে যে স্তম্ভটি আছে তাহাতে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, হাতে একটা কাগজ লইয়া কি দেখিতেছেন। অভিনয়ে যিনি বুদ্ধদেব সাজিয়াছিলেন তিনি, গিরিশবাবু ও নরেন্দ্রনাথের মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সময় গিরিশবাবুর পূর্বপরিচিত একজন মুন্সেফ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মুনসেফটি বলিলেন, "হ্যাঁ হে গিরিশ, বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল, ভগবান মানত না? আমি ইংরাজী পুস্তকে এই সব পড়েছি।' এই বলিয়া তিনি তাঁর ইংরাজী বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু একটু ব্যঙ্গ করিবার এবং মুনসেফটিকে বিশেষ আক্কেল দিবার ইচ্ছায় বলিলেন (নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) 'ঐ যে উনি বসে আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না।' তিনি গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও যুবকটি কে?' গিরিশবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—'একটি ভিখারী, দুটি ভাতের জন্য এখানে বসে আছে।' এই বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মুনসেফটি ভিখারীর সঙ্গে কথা কহিব, এটা হীনতা, এইজন্য গম্ভীর মাতব্বরী চালে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল?" নরেন্দ্রনাথ সব কথাই শুনিতেছিলেন, কাগজখানা শুধু মুখটি আড়াল দিবার জন্য দু'হাতে ধরিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পা দুটি ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন, মুনসেফ আসিলে তাহা গুটাইয়া লন নাই। ইহাতে মুনসেফ একটু মনে মনে চটিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ চট করিয়া উত্তর দিলেন, (অভিনেতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া), 'ঐ যে বুদ্ধদেব বসে রয়েছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন না।' কথাটা একটু ব্যঙ্গ কৌতুকের ছলে বলিলেন। অভিনেতা নরেন্দ্রনাথকে চিনিতেন ও বিশেষ সম্মান করিতেন। অভিনেতা ত্রস্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথের প্রতি করযোড় করিয়া বলিলেন, "আমি কিছু জানি না, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি থিয়েটারে সাজি, ভাড়ামো করি, এই পর্যন্ত।" গিরিশবাবু একটু একটু মুচকে হাসছেন ও তামাসা দেখছেন। মুনসেফটি চটিয়া বলিলেন, 'কি হে, বলো না, বুদ্ধের বিষয় কি জানো?" নরেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বুদ্ধ নাস্তিক ছিল, এটা নাকি 'হায়রে মজা শনিবার' কাগজে লিখেছে।' সেইসময় মাতালদের ভিতর একটা বোল উঠিয়াছিল 'হায়রে মজা শনিবার, বড় মজার রবিবার'। নরেন্দ্রনাথ সেইজন্য ঠাট্টা করিয়া ঐ কথা বলিলেন। মুনসেফ অগ্নিশর্মা হইয়া চটিয়া উঠিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "কি

হে, কি করো ? কাজকর্ম-করো না কেন?"—ইত্যাদি আরও মাতব্বরী কথা বলিতে লাগিলেন—"কেবল গিরিশের অন্ন ধ্বংস করতে এসেছ ? দেখছ, সকলে হাসছে ?" নরেন্দ্রনাথ চট করিয়া জবাব দিলেন, "আমার প্রতি কেউ হাসছে না, তোমার দুর্গতি দেখে হাসছে, তোমার স্ত্যাকামি বোকামি দেখে হাসছে।' মুনসেফ একটা ভেতুড়ে ভিখারী ছোড়ার কাছে এরু অপদস্থ হইতেছেন ও সকলে হাসিতেছে, ইহা তাঁহার নিকট যেন বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং কি উত্তর করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। মুনসেফকে শিক্ষা দেওয়াই গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য ছিল। তাহা বেশ রীতিমত হইয়াছে দেখিয়া গিরিশবাবুর ভারি আহ্লাদ। তখন তিনি মুনসেফকে বলিলেন, ওহে থামো থামো, ওর সঙ্গে অমন করো না। এক সময়ে ওঁর বিষয় বলব।" মুনসেফ রেগে তরতর করে চলে গেলেন।

১৮৯৭ সালে গরমকালে নাগ মহাশয় আসিয়া দিনকতক গিরিশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ, কালী বেদান্তী ও বর্তমান লেখক এক দিন বেলা সাড়ে চারটা কি পাঁচটার সময় বলরামবাবুর বাড়ি হইতে গিরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহাকে দেখিতে যান। সদর দরজার উপরে যে ঘরটি সেইখানে তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, অপর সকলে ঘরের পশ্চিমদিকের অংশে বসিলেন। গিরিশবাবু নাগ মহাশয়ের কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—'নাগ মহাশয় শুধু দুধ আর ভাত খান, আর কিছু খান না। তাহার পর যোগেন মহারাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্যাখ যোগেন, আমি কাল করলুম কি জানিস? নাগ মহাশয় মাছ খান না—আমি মাছ খাচ্ছিলুম। আমি করলুম কি, পাত থেকে ডিম তুলে নাগ মহাশয়ের পাতে ফেলে দিলুম। নাগ মহাশয় বললেন, 'আপনি দিচ্ছ্যান প্র সাদ—প্র-সাদ খাইলাম।' আমি খুব আহ্লাদ করতে লাগলুম। আর শ্যাখ, নাগ মহাশয়কে ওই সামান্য একখানা কম্বল দিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়েছি।' এই বলিয়া পাশে একখানা কম্বল দেখাইলেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, নাগ মহাশয় এই কম্বলখানি গায়ে না দিয়ে পুটুলি বেঁধে মাথায় করে নিয়ে বেড়ান। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'গিরিশবাবু দিয়েছেন, এ কম্বল কি গায়ে দিতে পারি। তাই মাথায় করে রাখি'।'

গিরিশবাবু বলিলেন

"একদিন সকালে নরেন্দ্রনাথ এসে বসল—বিভোর, কি যেন একটা গভীর চিন্তায়

নিমগ্ন, দেহের কোনো হুঁস নাই, জগৎকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। চেহারা ও মুখের ভাব দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। কোন কথা বলতে পারছিলাম না। নরেন্দ্রনাথ রাস্তার দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলতে আরম্ভ করল —'দেখ, জি-সি আমার ভগবান লাভ করা হল না। আমি সব ত্যাগ করেছি, আমি সব ভুলেছি, কিন্তু ঐ দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটাকে ভুলতে পারি না। ওই যে আমার কণ্টক হয়েছে।

গিরিশবাবু ভক্তলোক তাহার পক্ষে গুরু বিস্মৃত হওয়া অতি কষ্টকর কথা। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এমন উচ্চ অবস্থা হইতে কথা কহিতেছিলেন যে, গিরিশবাবু বলিলেন, "আমি আর কিছু জবাব দিতে পারলুম না এবং তার কি উচ্চ অবস্থা তা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। যা হোক আমি চুপ করে রইলুম।'

গিরিশবাবু একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে খাওয়ার কথা বলিতে লাগিলেন, "আমি ও নরেন পাশাপাশি বসেছি। যত আম আমার পাতে দিচ্ছে সবগুলি মিষ্টি, আর যেগুলো নরেনকে দিচ্ছে সব টক হচ্ছে। এইবার নরেন চটে গিয়ে আমাকে বললে, শালা জি. সি. তোর পাতে [illegible] মিষ্টি [illegible] আর আমার পাতে [illegible] টক, নিশ্চয়ই [illegible] বাড়ির [illegible] বন্দোবস্ত করে এসেছিস। আমি বললুম, [illegible] গেছ, [illegible] শালা, আমি [illegible] তুই সন্ন্যাসী ফকির লোক [illegible] তোদের কপালে [illegible] টকো আমই জুটবে।' এই [illegible] রেগে [illegible] তারপর ঝগড়া খুব [illegible] বেশ [illegible] যদি [illegible] মিষ্টি [illegible] কম [illegible] ঝগড়া করে এবার আর কাহারও সঙ্গে সুখ হবে না। সে [illegible] মিষ্টি লাগবে না।

তাহার পর গিরিশবাবু খানিকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া থাকিয়া কি ভাবিলেন, তাহার সমস্ত মুখে [illegible] ভাব দেখা গেল। পুনরায় অতি [illegible] বলিতে লাগিলেন, "কি অশুভক্ষণে দুজনে দেখা হয়েছিল যে একদিনও একটি মিষ্টি কথা বলতে পারলুম না, কেবল ঝগড়াই করলুম ও গালাগালি করলুম। তার সঙ্গে ঝগড়া গালমন্দ না করলে তো আমার সোয়াস্তি হত না, তারও তো সোয়াস্তি হত না। এমন লোক খুব কম পাওয়া যায় যে একটা কথা কয়ে সুখ হয়—মিষ্টি কথাই হোক আর রুক্ষ কথাই হোক সবই যেন মিষ্টি।'

একদিন গিরিশবাবু বর্তমান লেখক এবং আর দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠ হইতে বাগবাজারে আসিতেছিলেন। গিরিশবাবুর সেদিন মনটা বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নরেন্দ্রনাথকে অনেকদিন দেখেন

নাই, সেইজন্ত সমস্ত পথটা শোক প্রকাশ করিতে-করিতে আসিতেছিলেন। নরেন্দ্র-নাথের জননীর মনে পুত্র অদর্শনে কি কষ্ট হইতেছিল, সেইসমস্ত কথা বলিতে-বলিতে গিরিশবাবু যেন কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেদিনের মনের ভাব এমন নরম [illegible] যে নরেন্দ্রনাথ যদি [illegible]যোগে শীঘ্র উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেন তাঁহার মন [illegible] হয় [illegible] গিরিশবাবুর এইরূপ শোকের ভাব ও কাঁদ কাঁদ ভাব খুব কম দেখা [illegible] গিয়াছে। তিনি যেন ছোট শিশু অনেকদিন নিজের খেলুড়েকে দেখেন নাই, [illegible] করিতেছেন। গিরিশবাবু সমস্ত পথটি নরেন্দ্রনাথের নানারূপ গুণ [illegible] বলিলেন [illegible], নরেন ফিলজফি বোঝে, দেখ [illegible] (cerebrum) সেরিবেলাম (cerebellum) মেডুলা [illegible] (Medulla Oblongata) [illegible] কথা [illegible] তখন ভাব [illegible] অতি [illegible] কিছু নাই, তাই [illegible]।

[illegible] ফিরিয়া আসিতেছিলেন, যখন তাঁহার [illegible] হইতেছিল এবং আমেরিকার [illegible] স্বামীজীর যখন খুব সুখ্যাতি হইতেছিল, তখন [illegible] সকলেই নিজের নিজের মতপ্রকাশ [illegible] নানা মন্তব্য [illegible] বড় বড় বা সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কোনো মত [illegible] মুখে কথা শুনিয়া, ও সংবাদপত্রে স্বামীজীর [illegible] বলিয়াছিলেন, ওহে, [illegible] মিরাবল [illegible] শতাব্দীর [illegible] চোখের সামনে দেখছি। এ যে বুদ্ধি বিবেচনার [illegible] একটা [illegible] পেছনে না দাঁড়ালে এমন কাজ [illegible] বলিয়া [illegible] দিকে মুখ করিয়া প্রণাম করি[illegible] এবং [illegible] ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গিরিশবাবুর আত্মকথায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

[স্বামী শঙ্করানন্দের স গ্রহ থেকে উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩৫৮ সালের আশ্বিন, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ সংখ্যায় "গিরিশবাবুর আত্মকথা নামে যে রচনা প্রকাশিত হয় তার কিছু অ শ নিয়ে প্রবন্ধ হল।]

নেলো নামে একটি ছেলে এসে বললে, পরমহংসদেব আপনার সঙ্গে কথা কহিতে চান। আমি বলরামবাবুর বাটী উপস্থিত হইলাম। তথায় পরমহংসদেবের যথাচরিত প্রণামপর্ব শেষ হইলে তাঁহার সহিত নানাবিষয়ে কথা হইল। তন্মধ্যে আমার "চৈতন্যলীলা' রচনার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'জ্ঞানসূর্যের আলো তোমার উপর পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার মনের ময়লা পরিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে এব কথায় ভক্তির প্রজন্ম আরম্ভ হইযাছে,' ইত্যাদি। আমি বলিলাম যে, আমার মধ্যে এ সকল সদ্‌ভাবের কিছুই নাই। কেবল অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক লিখিয়াছি।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় পাইবার ৪।৫ দিন পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'তোর কি হইল ?" তাহাতে আমি এই উত্তর করি যে, "আমি আর কিছু গ্রহ করি না। তাহাতে তিনি হাসিলেন। রামকৃষ্ণ পদাশ্রয় যে কি তাহা বর্ণনা করা কঠিন। যেহেতু তাহাকে বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার যে কি বর্ণ তাহা এত দেখিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেক বর্ণ দেখিয়াছি। জানিনা তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, বলিতে পারিনা পুরুষ কি প্রকৃতি। তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া খাওয়াইতেন, আবার পিতার ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ দেখাইতেন। সুতরাং তাহার বর্ণনা কঠিন। হৃদয়ে ধারণা হয় না। তবে তিনি যে আশ্রয়দাতা ইহা আমার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানিনা, কিন্তু এই ধারণা ছিল যে আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আর এক বিষয় তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে আপনাকে দোষী জ্ঞান করিয়াছে তাহাকে তিনি ভালো করিয়াছেন। এই পরশপাথর স্পর্শে মহাপাপীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। আপনাকে দীন-

ভাবে ভাবিলে তিনি মহাপাপীকেও আশ্রয় দিতেন। কারণ দেখিয়াছি—থিয়েটারের বেশ্যাদিগকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। তিনি যেসব কথা বলিতেন, তাহা বুঝা কঠিন। যেমন বেশ্যা দেখিয়া বলিতেন, 'আনন্দময়ী' , কাশী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'সোনার কাশী'। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই সব সোনা হয়। তাঁহার ভক্তবৃন্দকে যদি কেহ একত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিতে যে সোনা হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমি যখন বিল্বমঙ্গল লিখি, তাঁহার ভক্তেরা প্রশ্ন করিলে আমি বলি—নাটক লেখাও তাঁর কাছে শেখা। নরেন্দ্র বলে—বিজ্ঞান তাঁর কাছে শেখা। মহেন্দ্র মাস্টার বলেন—মাস্টারী শেখা তাঁর কাছে। তাঁহার কেমন ভাব কি বলিব? একবারও স্থির করিতে পারি না। একমাত্র এই বলিতে পারি যে, যিনি রামকৃষ্ণ পদাশ্রয়ে আশ্রয় লইবেন, তিনি যে শান্তি পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই এবং তাঁহার সর্বকামনা সিদ্ধ হইবে। এখন বক্তব্য রামকৃষ্ণ কে? আমি জানিনা যে তিনি অবতার কিনা। যদি সকলকে দয়া করা পতিত উদ্ধার করা অবতারের কায হয় তাহা হইলে তিনি যে অবতার এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাঁহার দয়ার একটি উদাহরণ—একদিন তিনি কাঁদিতেছেন এই বলিয়া যে—গৌর নিতাই ঘরে ঘরে পায়ে হাঁটিয়া যাইতেন, কিন্তু আমি গাড়ি না হইলে যাইতে পারি না। তিনি সবরূপদাতা তাঁহাকে কি বলিয়া স্মরণ করিব? সেকারণ তাঁহার পূজার আকার নাই। নোংরা জায়গায় সরায় রসগোল্লা খাওয়াইয়াছেন, গাল দিলে কোলে তুলিয়াছেন। একমাত্র তাঁহাকে ডাকাই তাঁহার উপাসনা। অদ্য সকালে [২৫ জুলাই, ১৮৯৭] রাখাল মহারাজ আমাকে একঘণ্টা বক্তৃতা করিতে বলেন। তাহাতে আমি ইঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে সাহসী হই। কারণ ইঁহাদের উপর নির্ভর করিলে আর কোনো ভয় থাকে না। শেষে এইপর্যন্ত বলি যে, তিনি দয়াময় ঈশ্বর তাঁরে ডাকিলে হৃদয়ের অশান্তি ও পাপ দূর হয়।

আমি ব্যাভিচারী বারাঙ্গনার গৃহ হইতে তাঁহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বসিতে আসন দিয়াছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ থিয়েটার গৃহে মিঠাই লইয়া আসিয়াছেন। আমি এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার নিকট তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার। তাঁহার এককথায় আমার জীবনে যুগান্ত হইয়াছে। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হলধারী আমাকে গাছে বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে দেখিয়া ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়াছিল। যখনই আমার মনে সন্দেহের মূল দেখা যায়, এইকথা স্মরণ হওয়ামাত্র সন্দেহের উদয় হইতেই পারে না। তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন। [১৫ ৮ ১৮৯৭]

তিনি বলিতেন, "আমি কোনো জায়গায় আবদ্ধ নাই। কেবল দয়া। সব গেছে, কেবল এক দয়া আছে।" যেখানে সর্বজীবে দয়া, আমি তাঁহাকেই অবতার বলি। তিনি বলিতেন, "যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধার সাধন করিতে পারি তাহাও সার্থক বোধ করি।" স্বামীজী বলেন, যদি অন্যের উদ্ধারের জন্য নরকে যেতে হয় তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। ইহা [illegible] কথা নয়, ইহা সর্বজীবে দয়ার কথা। সকল প্রমাণের অপেক্ষা — [illegible], তার নিজ মুখের কথাই প্রমাণ। যখন রামচন্দ্র অবতার হন তখন সাতজন ঋষিমাত্র তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি না চিনাইলে চিনিবার উপায় নাই। হলধারীর তাঁকে ভূতে পাওয়ার কথা মনে করুন। যার চক্ষে তিনি ধূলা দেন, তার নিকট এরূপ প্রস্তাব [illegible] করে।

[প্রশ্ন — [illegible] যাঁরা গেছেন সকলকে কি [illegible]?]

আমার তাহাই বিশ্বাস। কিন্তু আমার দেখা [illegible] যে, [illegible] যাহা নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে হইয়াছে, [তাও] কিন্তু পরে [illegible] কাজ দেখিয়া [illegible], মহাশয়া। শশীকে একদিন [illegible] দিলেন [illegible] দিলেন না। অতি [illegible] হইয়াছে, কিন্তু [illegible] শশী যোগানন্দ [illegible]। আমি এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। [illegible]।

পাত্র ব্রহ্মানন্দ [illegible] প্রসঙ্গ

[illegible]

স্বামী [illegible]

[illegible] সান্নিধ্য গ্রহণ করেন [illegible] আমার [illegible] তাঁহার [illegible] সংবাদ [illegible]। আমার বাবা, [illegible] ভাগ্যবান। বাবাকে [illegible] [স্বামী ব্রহ্মানন্দের] [illegible] প্রাপ্ত হইবে, [illegible] ব্যতীত [illegible] কোনো মহাপুরুষ [illegible]? আমার যেখানে কেহ কেহ আসিয়া মহারাজের কথা [illegible], [illegible] কথা বলিতে বলিতে আমার মনে হয় যে, আমি কেবল মুখে কথা বলি। তাঁহার অপার করুণার অনুভব আমার হৃদয়ে কোথাও যদি কণামাত্র আবির্ভূত হইত, সেই প্রভাবে দ্রব হইয়া যাইতাম। তাঁহার ভক্ত-সম্বন্ধেও আমার মনে হয় যে, যদি কেহ তাঁহাদের

মহিমা অনুভব করিতে পারে, তাহার আর সামান্য নরত্ব থাকিবে না, তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে। কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়া আক্ষেপ করে যে, মহারাজের দর্শন পায় নাই। আমি তাহাদের বলি যে, মা গঙ্গা যেমন সগরবংশের উদ্ধারের নিমিত্ত [illegible] হইয়াছিলেন, মহারাজের প্রেমও সেইরূপ ভক্তপ্রণালী দিয়া শতধারে বহিতেছে, [illegible] দিবে। কিন্তু এসকল জানিয়া শুনিয়াও কি আশ্চর্য মায়ার প্রভাব—[illegible] সংশয় [illegible] রহিত হইল না।

আমি এ[illegible] আরোগ্য হই নাই—[illegible] নাই, এবং পূর্ণিমা অমাবস্যাতে [illegible]। এমন শক্তি নাই যে ছাদে [illegible]। গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ [illegible] মনে একটি সাধ [illegible] একটি [illegible] করি। অনেকে [illegible] ঠাকুরের [illegible]। আমার বড় ইচ্ছা এই [illegible]। [illegible] একরকম ঠাকুরের কৃপায় [illegible]

দাস [illegible]

[G C]

গিরি[illegible]লাপ : প্রসঙ্গ—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ [illegible]বাদর্শ

[[illegible]]

[illegible] কাজ [illegible] উন্নত [illegible] শিবাজী— [illegible] সমগ্র [illegible] এবং [illegible] শিবাজ[illegible] [illegible]সেবক— [illegible] স্বাধীন[illegible] মুক্তি শুধু কথায় [illegible] তাদের নিকট [illegible] বুঝো—[illegible] ধর্ম সমাজ, আচার, [illegible] পূর্ণ, আর না হলে বলবে, 'সাহেব। ভাগ্য তোমরা এসে-ছিলে তাই [illegible] থেকে [illegible] উদ্ধার করেছ।' এই তো তোমাদের জাতীয়তাবোধ।

আমি বলিলাম—মহাশয়। আপনি যা বলছেন তা ঠিক। তবে বর্তমান আন্দোলন

যে জাগরণের সূচনা—তা স্বীকার করতে হবে।

গিরিশচন্দ্র—তা তোমার কে অস্বীকার করছে। ভুল বুঝো না। আমার বিশ্বাস, এই আন্দোলন misdirected—কতকগুলি পেশাদার রাজনৈতিক নেতার হুজুগে ছেলেরা মেতে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বারবার দেশকে বলে গেছেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল, প্রাণ—ধর্ম। বারবার তিনি সাবধান করে গেছেন যে, বিদেশীয় অনুকরণে রাজনীতির আন্দোলনে দেশকে চালিত করো না—করলেই ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্ট হবে।

আমি বলিলাম—এই ধর্ম মানে কি? শুধু ঠাকুর পূজা, ধ্যানধারণা নিয়ে থাকার নাম কি ধর্ম? এটা শুধু আমার নয়—আমার মতো অনেকেরই গোলমাল ঠেকে, ধর্ম কি?

গিরিশচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—সেকি, তোমার গোলমাল ঠেকে? স্বামী বিবেকানন্দ তো তা বেশ বিশদভাবেই বুঝিয়েছেন।

আমি—স্বামীজী তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বলেছেন—মহা উৎসাহে ধন উপার্জন করো, দশজনকে পালন করো—তবে তুমি ধার্মিক। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—সামদান ভেদদণ্ডনীতি প্রকাশ করো, পৃথিবী ভোগ করো, তবে তুমি ধার্মিক।

গিরিশচন্দ্র—নিশ্চয়ই।

আমি—আচ্ছা মশায়, লোকে ধর্মের নাম শুনলে ক্ষেপে ওঠে, বলে, 'রাখো তোমার ধর্ম—এই ধর্ম ধর্ম করে হিন্দুজাত রসাতলে গিয়েছে। ভাবো তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা, তেত্রিশ কোটি জাতের বিচার, তেত্রিশ কোটি আচার বিচার—এই দিয়ে দেশ উঠবে?

গিরিশচন্দ্র—তুমি যা বললে—এই সমুদয় আমরা ইংরেজদের ইতিহাসে পড়ি, কিন্তু ধর্মের নামে সাম্যনীতি ও স্বাধীনতার প্রচার এদেশেই হয়েছে। চণ্ডাল গুহক রামচন্দ্রের আলিঙ্গনে বদ্ধ। শবরী দত্ত ফল শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়। রাজপূজ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাখালের প্রেমের অধীন। দাসীপুত্র নারদ ত্রিলোকপূজ্য—জাবালি পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণ মহিমায় আদৃত। শাস্ত্রপুরাণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজ চারশো বছর আগেও শ্রীচৈতন্যদেব 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ'—প্রচার করে গেছেন—তা এদেশেরই বাণী, ইউরোপ থেকে ধার করা নয়। গীতার 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'—তা এদেশেরই বাণী—ইউরোপের ধার করা নয়। এই ধরো, বাংলাদেশে সেদিনও মহাসাধক রামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন, 'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে'—এই catholicity এই দেশেরই, ইউরোপের ধার করা নয়। আর ভারতে—জগতের সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন নিরক্ষর দীন

ব্রাহ্মণ পূজারী বেশে—তোমাদের ইংরেজী শিক্ষায় পণ্ডিত হয়ে নয়। সব দেশে, কাল প্রভাবে আবর্জনাস্তূপ আসে, তাই বলে কেউ মূল বস্তুকে ত্যাগ করে না। ইউরোপের প্রত্যেক জাতির দুশ তিনশো বৎসর আগেকার ইতিহাস পড়ে দেখো দেখি। যে কারণগুলো বলছো সব তাদের বিদ্যমান ছিল কিনা দেখতে পাবে। আজও বর্ণ বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা পরহিংসা কিছু কম নয়। Anglo-Saxonদের সময় থেকে Wales, England, Scotland, Ireland এর পরস্পর কত যুদ্ধ, কত নর শোণিত পাতে আজ United Kingdom of Great Britain and Ireland হয়েছে—তাও Irishরা গা মোড়া দিচ্ছে। একটা common cause or grievance একতার সহায়ক। ভারতবর্ষের সেই common cause—ধর্ম। এই ধরো মুসলমান জাত। এরা সেদিনও বাদশা বা নবাবের জাত ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই জাতের সহিত একতা অসম্ভব।

আমি বলিলাম—ধর্মে আরও অসম্ভব। মুসলমানের চক্ষে হিন্দু কাফের—হিন্দুর চক্ষে মুসলমান যবন।

গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন—ঠিক বলা। কিন্তু এই যবন ফকীরের পদতলে হিন্দুর মস্তক বিলুণ্ঠিত—আজও লাখ লাখ হিন্দু নরনারী এই মুসলমান পীরের দরগায় সিন্নমানত করে, আর হিন্দু সাধুর পাদমূলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের শির লুণ্ঠিত। কবীর, নানক প্রভৃতি জীবন্ত এর জলন্ত উদাহরণ। দেখ, প্রেমে লোককে এক করে। প্রেম বিদ্বেষ হিংসা দূর করে। বাঁ চরণে মানুষের হৃদয়ে প্রেমপদ্ম বিকশিত হয়। সেই প্রেমে শাক্ত বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু মুসলমান, খ্রীস্টান ও পার্শী এক হবে। রাজনীতির আসরে মূলে একতা না থাকলে মোড়লগিরি নিয়ে, অধিকারের দাবি নিয়ে পরস্পরের লড়াই হবে। জেনে রেখো, সর্ববিধ একতার মূল প্রেম আর সেবা। যার ইচ্ছা স্বামীজীকে জ্ঞানী বৈদান্তিক বলুক, আমি দেখি, মহাবীর মহাপ্রেমিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। যেদিন জয়দৃপ্ত গর্বিত সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জাতের সমক্ষে এই নগ্ন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ভারতের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করে বিজয়মাল্য গ্রহণ করেছিলেন—জেনো সেই দিন থেকে জগতে ভারতের ডাক পড়েছে।

আমি বলিলাম—তবে সব ত্যাগ করে দেশ কি শুধু ধ্যান ধারণায় মত্ত হবে।

গিরিশচন্দ্র—স্বামীজী কি তাই বলেছেন। এখনকার বর্তমান কার্য—সেবা। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সেবা। এই সেবাধর্ম প্রকৃতভাবে পালন করলে সব হিংসাদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। দুস্থ, আর্ত, রুগ্ন, উৎপীড়িত মুসলমানের সেবা করে দেখ—সে তোমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন দেয় কি না। কিন্তু স্বামীজীর এই কথা মনে রেখ, 'চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সাধিত হয়না, প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায়

সকল কার্য সম্পন্ন হয়। Policy করে সেবা নয়—প্রকৃত সরল প্রেমানুরাগে সেবা করে দেখো। ঠাকুর একটা বিষয়ে সবাইকে বিশেষ সাবধান করে দিয়েছেন, সেটা 'ভাবের ঘরে চুরি করো না।' পলিসি দ্বারা কাজ করলে কথাও হবে না। দেখ বাবা, বিশ্বাস করো, জগতে মহাশক্তি সঞ্চার করতে, ভারতকে শ্রেষ্ঠ অধিকার দান করতে, ঠাকুর এসেছিলেন। দেশের মধ্যে এখন প্রধান কার্য, ঠাকুর যে ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তা প্রচার করা, যাতে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ দূর হয়। Solidarity of nations এর জন্য এটা বিশেষ দরকার। সেবাধর্ম ও শিক্ষার প্রচার বিশেষ আবশ্যক। যত narrowness, bigotry, meanness শিক্ষার বিমলালোকে তিরোহিত হবে। কষ্টসহিষ্ণু সাহস, বল, বীর্য চাই—তাই স্বামীজী ব্রহ্মচর্যের উপর এত জোর দিয়েছেন। স্বামীজির নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করাই বর্তমান [illegible]—[illegible] প্রধান কাজ। আমার [illegible] নাটকে দেশসেবায় কি আবশ্যক [illegible] দেখাতে চেষ্টা করেছি।

আমি বললাম, [illegible] কেউ কেউ মনে করেন, [illegible] হবে [illegible] নৈতিক চরিত্র [illegible] অধঃপাতে যাবে।

গিরিশচন্দ্র—দেখো, যা [illegible] বেশ্যা বা মু[illegible] [illegible] প্রশ্রয় দেওয়া [illegible] আমি এক [illegible] [illegible] পূর্ণ [illegible] [illegible] বুদ্ধ [illegible] দেখা [illegible] [illegible] অনুসন্ধান কর [illegible] [illegible] চা [illegible] [illegible] [illegible] দূর্গ [illegible] লোক—দেশে লোক। [illegible] করবেন [illegible] তাদের [illegible] সুগম পথ খুঁজে [illegible] আবৃত্তি ও অভিনয় [illegible] এইসব রুচিবাগীশগণ এর [illegible] কি চেষ্টা করেছেন? [illegible] এদের সঙ্গ বিষবৎ সর্পের [illegible] ভয়ংকর। কেন? এরা পাপ লালসার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বছরে বছরে যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তবে তার কি প্রতিকার? ব্যক্তিগতভাবে কুসঙ্গ ত্যাগ সর্বদা কর্তব্য কিন্তু সামাজিক

হিসাবে শুধু ত্যাগ বা ঘৃণা করলে চলবে না। রঙ্গালয়, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কোনও ভাবের প্রচার করতে হলে রঙ্গালয় একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। দেখো, যখন আমি ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই, তখন থিয়েটার ছাড়বার এক একবা[র] [illegible]। কিন্তু ঠাকুর ছাড়তে চাইলেই বলতেন, 'না না থাক—ওতে [illegible] অনেক উপকার হচ্ছে।' এখন [illegible] আমি [illegible]। এখন মনে হয়, আমি [illegible] কিছু করি না, তাঁরই কাজ [illegible]। নাটকে তাঁরই ভাবের প্রচার হচ্ছে। আর রঙ্গা[লয়] [illegible] পতিতার আশ্রয়। যে ছলনাময় জগতে [illegible] করে তা [illegible] যে একটা [illegible] জগতের আস্বাদ পায় তাই [illegible]।

[illegible] ঠাকুরের ভাবকে প্রধান করে আর [illegible]। একবার এই হলঘরে [illegible] অভিনেত্রী আসে—[illegible] (আমার [illegible] অনেক আগে) উপস্থিত [illegible] একবার সরল প্রাণে তাঁকে ডাক [illegible] কোনও [illegible]।' স্বামীজী আমাকে [illegible] আমি [illegible] যে পতিতপাবন [illegible] বলতে [illegible] আর কোনো ভয় নেই। [illegible] বললেন, [illegible] d[illegible] doctrine prea[ch] [illegible] জানি তাঁর [illegible] পতিতদের জন্যে [illegible]—'I love purity—[illegible]—

[illegible] আমার চোখের সামনে [illegible] পরম্মা গৃহে ফিরিয়া [illegible]।

[illegible] W[illegible] যুগে stage এর [illegible] im-provement [illegible]।

গি[রি]শবাবু হেসে বলিলেন—[illegible] দেখতে যেতে হবে না। এই মাথার ভিতর যা ছিল তাই দিয়ে যেতে পারছি না—দেশের লোকের apathy র জন্য—আবার বিলেত গিয়ে বিলেতী আইডিয়া! দেখো, আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক দেশের

মাটি বীজ জল আর হাওয়া নিয়ে যেমন ফল-ফুলের গাছ হয়, তেমনি প্রত্যেক জাতের —তার ভাবের সাধনানুযায়ী ভাষা ও শিল্প বিকাশ পায়। শেকস্‌পীয়ার যদিও আমার আদর্শ, তবুও আমার নিজের একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাব আছে। যে দেশে জন্মেছি, যে ভাবে বর্ধিত হয়েছি, যে আবহাওয়ায় বড় হয়েছি, ভাবতে শিখেছি, যে দেশের শিক্ষা, আদর্শ আর রস আমাদের হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছে—তার একটা ছাপ আছে। ঠাকুরের দর্শন পেয়েছি, স্বামীজীর দর্শন পেয়েছি, তাঁদের সঙ্গ করেছি—তার একটা ছাপ আছে।

আমি বলিলাম—আচ্ছা মশায়, অনেকে বলে আপনার নাটকে কতকগুলো character আছে যা overdrawn

গিরিশবাবু—যাঁরা বলেন তারা human character thorough study করেন নি। আমি চোখে না দেখে কিছু লিখিনি। আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিইনি। যেটা feel করেছি, যে সত্য practical life এ realise করেছি, যা জীবনে মরণে পরম সত্য বলে জেনেছি—তাই সবার ভিতরে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। তবে গর্ব করিনি। ঠাকুর বলেছেন, এতে অনেকের উপকার হবে, তা বিশ্বাস করি। তাঁর কথা বিশ্বাস করি। তাই জানি, যা কিছু করছি তাঁর কাজই করছি। তাঁর কাজ হলে নিশ্চয়ই তাতে লোকের কল্যাণ হবে। এই আমার বিশ্বাস —এই আমার যা confidence। নিজের শক্তিতে আমি কিছু করছি না বুঝেছ?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে হাঁ।

গিরিশবাবু—ঐ ভয় হয়। আমার ইচ্ছেতে কাজ করছি, না, তাঁর ইচ্ছেতে কাজ হচ্ছে? কে জানতো, বকলমা দেওয়া এত কঠিন। কি জানো—যারা ধ্যান করছে, জপ করছে, তারা আপনার খুশিতে করছে। হয়তো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা, নির্দিষ্ট সময় আছে। কিন্তু এতে [বকলমা দেওয়ার ক্ষেত্রে] অহর্নিশি তাঁর চিন্তা করতে হয়। নিশ্বাস ফেলা আমার ইচ্ছেতে, না তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, অনবরত এইটি লক্ষ্য রাখতে হয়।

আমি বলিলাম—আপনি যে নাটক লেখেন, তা যে inspiration এ লেখেন তা কি লেখবার সময় বোধ হয়।

গিরিশবাবু—বোধ কি হবে? আমি দেখেছি, আর কে যেন আমাকে লিখিয়ে দেয়। এই লাইনগুলো মা আমাকে হাত ধরে শিখিয়ে দিয়েছেন—

'বুঝ দেবি কলিযুগে কৃপা তব কত।
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে

বিফল প্রয়াণ তব,
নাহি জানি তবে
যবে "মা" বলে তোমাবে
ডাকিবে কলির নর।
ব্যাকুল অন্তর কত হবে হৈমবতি
ধন্যযুগ
যাহে নাম বলে মোক্ষধাম
লভিবে কীটাণু নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয়—
কোলে তুলে লবে তারে সতি।

গিরিশবাবু—দেখো একবাব ঠাকুব, স্বামীজীর এই 'অন্ধ বিশ্বাসের' উল্লেখে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তুই অন্ধ বিশ্বাস আর চোখওয়ালা বিশ্বাস কি বলছিস ? বিশ্বাস—বিশ্বাস। তা আবাব চোখওয়ালা বা অন্ধ কি ? স্বামীজী ঠাকুরের কাছে চেষ্টা করেও দেখাতে পারলেন না 'কোনটা চোখওয়ালা বিশ্বাস—আর কোনটা অন্ধ বিশ্বাস।' আর হৃদয়ে বোধ না মানলে কি বিশ্বাস করতে পারো ? মানুষের জ্ঞান কতটুকু—তার vision কতটুকু—পদে পদে যুক্তির অসারতা বুঝতে পারছে—পদে পদে নিজের ক্ষুদ্রতা অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারছে—তবুও সেই মহানের অলৌকিকত্ব অনির্বচনীয় শক্তির বিকাশ—অনন্ত অনন্ত ভাবের, অনন্ত রূপের রূপান্তর—মানতে চাইবে না। যে মহাপুরুষ—কর্মময় জগতের আকর্ষণ ত্যাগ করে—নিত্য সত্যের সন্ধানে বহি প্রকৃতির সঙ্গে বিপুল দ্বন্দ্ব ক'রে—সেই অনন্ত রহস্যময়, অনন্ত রসময়, অনন্ত আনন্দ উপলব্ধি ক'রে—মহাপ্রেমে জগৎকে সেই আনন্দ দান করবার জন্য তাপিত পতিতদের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়ান—তার জীবন—তাঁর সাধনা—তাঁর অনাবিল স্বচ্ছ নিষ্কাম প্রেম, তার জয়ধ্বজা—নাটকের বিষয় হতে পারে না—আর তুমি প্রলোভনে পতিত হ'য়ে, মোহে অভিভূত হয়ে, যে মদির স্বপ্নে হর্ষ-বিষাদে ভাসছ, তোমার সেই জীবন dramatic—নাটকের বিষয় ? এই angle of vision [দৃষ্টিকোণ] এর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। মানুষ যদি এইটুকুকে আর্ট বলে তবে সে আর্ট অসম্পূর্ণ। হতে পারে, সে মহান নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনা আঁকতে অনেকে অক্ষম। কিন্তু মহাপুরুষদের লীলাপূর্ণ নাটককে passion play বলে উড়িয়ে দিয়ে,

drama নয় বলে উপেক্ষা করা অজ্ঞানতা বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এটা নিশ্চয় জেনো, একদিন এমন দিন আসবে যখন এইসব মহাপুরুষদের জীবন—অলৌকিক ঘটনাবলী—উন্নততর আর্টের সম্পদ বলে গণ্য হবে।

গিরিশবাবু তাঁর নিজের ঘরে প্রবেশ করে—মিনিট দুই পরে আবার তাঁর আসনে এলেন। তিনি বলিলেন—দেখ 'শঙ্করাচার্য' নাটকে যা দেখানো হয়েছে তা ঠিক হয়েছে। আমি inspiration এ লিখেছি। ঠাকুর বলতেন, সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহাপুরুষ এক সত্যের প্রচার করে থাকেন। তবে স্বামীজীকে দেখে আমি শঙ্করের ছবি উপলব্ধি করেছি।

'শঙ্করাচার্য' বই যখন শেষ করে দিয়ে ছাপতে পাঠাই, তখন আমি তো বারাণসী ধামে। আমি যে বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম—তার ঠিক নিকটে একটু নির্জন জঙ্গলের ভিতর শঙ্করের একটি পুরাতন মঠ আছে। সেখানে শঙ্করের অপূর্ব সুন্দর প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমি সেই মূর্তির পাদপদ্মে স্পর্শ করিয়ে হাতের লেখা বই [পাণ্ডুলিপি] পাঠিয়ে দি। সে সময় আমার বিশ্বাস ছিল—শঙ্করের বই জমবে। শঙ্কর যথার্থ যা ছিলেন—যে ভাবে প্রচার করে গেছেন—শঙ্করের নাটকে ঠিক তাই লেখা হয়েছে। এই বই আমি নিজে লিখিনি—inspiration এ লেখা হয়েছে।

[গিরিশচন্দ্র বলিলেন—তিনি সর্বপ্রকার নেশা করেছেন, কিন্তু এখন সকলই ছেড়েছেন। [illegible]]

আমি বলিলাম—আচ্ছা, আপনার এখন কি কোনো কখনো সেই নেশা করতে ইচ্ছা হয় না?

গিরিশবাবু—ঠাকুরের ইচ্ছায় তা যায়। দেখ, আমি অনেক অকাজ কুকাজ করেছি—কোনও পাপ বা আমার বাকি নেই—সব রকম হয়েছে। কিন্তু তাই আমার গৌরবের বিষয় হয়েছে। এই ধুলোকাদা মেখেই আমি ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর নিষ্পাপ পুরাতন সন্তানেরা [illegible]—তাঁদের ভিতর [illegible] দেখিয়ে চলুন। কিন্তু আমার এই ধুলোকাদা মহাপাপ বা ভণ্ডামি জুয়াচুরি—সব নিয়ে—কলঙ্ক মেখে তাঁর সামনে এই গৌরব করে দাঁড়িয়েছি—প্রভু, আমার নিজের কোনো গৌরব নেই—গর্ব নেই। এই গৌরব ও গর্ব আছে যে, পাপ করতে আমি কিছু বাকি রাখিনি। এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা পুঁছে নাও, তো নাও—নইলে আমার আর কিছু উপায় নেই।' প্রভু সে কথা শুনেছেন—তাই অহেতুকী দয়ায় বকলম্ নিয়েছেন। পূর্বকার পাপকাহিনীর কথা আমার মুখে বারবার শুনে, খেলার

মতো স্নান করিয়ে দিয়ে, আনন্দ দান করেছেন। এখন কি দেখছি জানো—যত নেশাই করো না কেন—ভগবৎপ্রসঙ্গের নেশা—তাঁর স্মরণ মননের নেশার একবিন্দুর সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না। এমন নেশা থাকতে লোকে ঐ ছাইভস্ম খেয়ে নষ্ট হচ্ছে। ভারতবাসী—সমস্ত জগতের লোক এই আনন্দের নেশায় মেতে উঠুক—তবে ঐ সব ছাইভস্ম দূর হয়ে যাবে। এই মদ, ভাং, গাঁজা, আফিং প্রভৃতির নেশার বিষ যতদিন থাকবে—ততদিন জাতীয় জীবনে চেতনাসঞ্চার করা অসম্ভব।

গিরিশবাবু—সেদিন অরবিন্দবাবু [অরবিন্দ ঘোষ শিক্ষাবিদ] এসেছিলেন, তাঁকে আমি ঠাকুর স্বামীজীর কথাই প্রথম জিজ্ঞেস করলাম।

আমি বললাম—অরবিন্দবাবু কি বললেন?

গিরিশবাবু—দেখলাম ঠাকুরকে বিশ্বাস করেন। আমি তাকে বললাম—তবে তিনি যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন—স্বামীজী যা প্রচার করে গেছেন—সেই পথ অনুসরণ করে ভারতের কল্যাণ সাধন করা কি উচিত নয়?

আমি—অরবিন্দবাবু তার কি জবাব দিলেন?

গিরিশবাবু—চুপ করে রইলেন। আমি যা বললাম—তা বেশ চুপ করে শান্তভাবে শুনলেন।

আমি বলিলাম—সেদিন রবিবাবু "রূপ ও অরূপ" [illegible] গবেষণাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পড়েছেন। কিন্তু তিনি পরমহংসদেবের নাম স্পষ্ট না করে সেই এক রকম ইঙ্গিত করেছেন, আর শাক্ত হিসেবে তাকে কিছু আক্রমণ ও কটাক্ষ করেছেন।

গিরিশবাবু—রবিবাবু ঠাকুরকে আক্রমণ করেছেন? কেন?

আমি বললাম—রূপের বন্ধন মানুষকে কতদূর পর্যন্ত বন্দী করে, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি লিখেছেন যে তিনি শুনেছেন—শক্তি উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহ দেখে বিশেষ করে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন—কেননা সিংহ মায়ের বাহন। রবিবাবু বলেন যে শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করতে দোষ নেই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে দেখলে কল্পনার মহত্ত্বই চলে যায়।

গিরিশবাবু—যাক। এখানে সিঙ্গিকে শক্তিরূপে দেখা হল কোথায়?

আমি বলিলাম—ঐ যে পরমহংসদেব বলেছিলো, সিংহ মায়ের বাহন।

গিরিশবাবু—এর মানে কি সিঙ্গিই সেই মহাশক্তির রূপ? তুমি যে বললে, রবিবাবু বলেছেন যে—শক্তিকে সিঙ্গি রূপে কল্পনা করতে দোষ নেই, কিন্তু সিংহকেই

শক্তিরূপে দেখলে কল্পনার মহত্ত্ব চলেই যায়—এটা যে কি, তা তিনি বোধহয় নিজেই ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন নি। কোনও হিন্দু কি কখনও সিংহকেই স্বয়ং মহাশক্তি বলে কল্পনা করে থাকে?—পূজা করা তো দূরে থাক।

আমি বলিলাম—রবিবাবু প্রতিমার পূজাকেই দোষ দিচ্ছেন—মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম শত্রু মনে করছেন এবং পূজাকে ভাবের কল্পনা বলে স্বীকার করতে চান না। রবিবাবু বলেন, সে সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে যে-রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করতে থাকে—তা বদ্ধরূপ নয়—তা একরূপ নয়—তা প্রবাহশীল তা বহু।—কিন্তু সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখন কোনো লোক বিশেষ দেশকালপাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করতে যায়, তখনি তা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করে—তখনই সে অবনতির পথে যায়।

গিরিশবাবু—হিন্দুও তাই ভগবদ্‌বিগ্রহের রূপকে নিত্যরূপ বলে মনে করে—কেন না তা সত্য সুন্দর মঙ্গলকে ব্যক্ত করতে থাকে—তা বদ্ধরূপ নয়—তা একরূপ নয়—অনন্তের অনন্তরূপ। শুধু রূপকে তো একটা জড় রূপ বলে পূজা করা হয়না, সেই রূপের ভেতর অরূপেরই পূজা হয়। মৃন্ময় প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্মিত বিগ্রহকে সেবক চিন্ময়ভাবে গ্রহণ করে। পূজা তো কল্পনা ছাড়া নয়। তা তো প্রবাহশীল—তার শক্তি নানামুখী। ভাবগ্রাহী জনার্দন, এটা তো সবাই জানে। ভাব ছাড়া পূজা কোথায়? ভাব দিয়ে, কল্পনা দিয়ে পূজা হয়। শুধু জড়বস্তু আর চর্মচক্ষুর সম্বন্ধ নয়। যে-কোনো সাধক, প্রতিমাপূজক সাধকের, সাধনকাহিনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সাধকের পূজা—রূপ দিয়ে সাধকের চিত্তকে বিকাশ করে—নিত্য নূতন ভাবে নূতন কল্পনার প্রবাহে। সাধক পূজক তাই দেবমূর্তিতে নিত্যই নবভাবে উন্মত্ত হয়। কল্পনা ছাড়া কি পূজা কখনও করা যায়? মানস পূজাটা কি? মানস ধ্যান কি? ভাব ছাড়া কি ভাবময়কে ভাবা যায়? রবিবাবুর মতো ভাবুক কবি যে, রূপে অরূপের সন্ধান পান না, ব্যক্তের ভিতর অব্যক্তের আভাস দেখতে পান না—এটাই আশ্চর্য। আর ঠাকুরের সাধনার উপর, ভাবের উপর, রবিবাবুর এই নিরর্থক কটাক্ষ—একেবারে হাওয়ার উপর তাঁর কবিকল্পনা। যিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থকে সেই ব্রহ্মবস্তু—মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন—মহাভাবে সর্বদা সমাধিস্থ থাকতেন—শ্যামল তৃণরাশি পদদলিত দেখলে যিনি নিজের দেহে বেদনা বোধ করতেন—কোনো মূর্তি, কোনো মন্দির, সৃষ্টির যে কোনো স্থানে শক্তির, ভাবের বিকাশ দেখলে যিনি তৎক্ষণাৎ অরূপের ভাব সাগরে ডুবে যেতেন—ব্রাহ্ম ভক্তেরাও যাঁকে একাধারে শাক্ত বৈষ্ণব বৈদান্তিক যোগী বলে নির্দেশ করেন—তাঁকে শুধু শক্তির উপাসক ভক্ত বলে উল্লেখ করা উদারতার পরিচায়ক হয়নি। কেশববাবুর মতো মহাপুরুষ, নিরাকার

সাধকও যাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখে তাকে অনুসরণ করে—নিজের ভাবে মিশিয়ে নববিধান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তাঁকে একজন শাক্ত-ভক্ত-মাত্র বলা সমীচীন হয়নি। কবিত্বের অনুভূতি আর ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। [আর যার ভিত্তিতে] তিনি পরম হংসদেবের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—তা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন, মায়ের বাহন দেখলাম—আর কি দেখবো ? তার অর্থ কি রবিবাবু এমন নিজের মনগড়াভাবে গ্রহণ করতে পারেন ? যিনি নিখিল পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব বস্তুতে বিশেষ বিশেষ শক্তিপ্রকাশে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন, সেইভাবে যিনি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' দর্শন করতেন—তাঁর সেই অনুভূতির দোষ দেখানো, যিনি যত বড় সাহিত্যিক হোন না কেন, তা তাঁর অনধিকারচর্চা।

আমি বলিলাম—কিন্তু বিচার করতে দোষ কি।

গিরিশবাবু—বিচার করতে হলে প্রথমে তাঁর জীবন আগাগোড়া আলোচনা করতে হয়। তাঁর কিছু জানলাম না—আর মাঝখান থেকে একটা কথা টেনে নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করাকে সত্যানুসন্ধিৎসা বলে না। আর তিনি [রবীন্দ্রনাথ] যখন কবি তিনি তো নিজে প্রত্যহ এই প্রকৃতির ভিতর রূপের পূজা করে থাকেন। শিবের রূপে প্রকৃতির রূপ গড়ে কবিতা রচনা—তা কি রূপের পূজা নয় ? অধিকারিভেদে কেহ ক্ষুদ্র রূপে তন্ময়—কেহ বিরাট রূপে তন্ময়। কিন্তু অরূপসাগরে যেতে গেলে সেই রূপের ভিতর দিয়ে, সেই রূপের পূজা করে, অরূপকে খুঁজতে হবে—সেই রূপ দিয়ে অরূপকে পেতে হবে। সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে রূপ জেগে ওঠে—সেই রূপ অসীম বিরাট হয়ে অরূপে মিলিয়ে যায়। সবাই জ্ঞান জ্ঞান করে। কিন্তু একদিন আমি ঠাকুরের শ্রীমুখে এই জ্ঞানের আভাস পেয়েছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন—অনন্ত চিদানন্দ সাগর—তার হিল্লোলধ্বনি শুনে নারদাদি বিভোর, শুক সনক তটে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত—মহাদেব তিনগণ্ডুষ জলপানে শবের মত পড়ে আছেন।—এই যখন বললেন তখন আমার মাথার ভিতর সেই অসীম অনন্তের একটা ধারণা হতে লাগলো—আমার মাথা reel করতে লাগলো। আমার পরম শত্রুও বোধহয় আমার intellectual power-এ সন্দিহান হবে না, কিন্তু আমি সেই—অসীম অনন্ত বিরাট ভাব ধারণা করতে পারলাম না। আমি যখন ঠাকুরকে বলতে যাচ্ছি, আর ধারণা করতে পারছি না—তখন চেয়ে দেখি নিজে তিনি দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। কে চিনেছে তাঁকে —কে বুঝতে পারে তাঁকে ? এই সব সত্যকার অনুভূতি artificial intellectual jugglery নয়।—বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

গিরিশবাবু— এই দেখ না—এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত আকাশের দিকে তাকালে নিজেকে একটা ক্ষুদ্র কীটানুকীট মনে হয়, আর আমরা ঠিক করতে যাই, এই

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কেউ আছে কি না। যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর শক্তির আমরা সীমা করতে যাই। যিনি অণুর অণু—আবার বিরাট মহান, যিনি অনন্ত, যিনি সমস্ত ভাবের, রূপের রসের আধার—তাঁকে আমরা বোঝাতে যাই—এই হলে পাওয়া যাবে আর এই হলে পাওয়া যাবে না। কে তার সীমা করবে? তাই রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে। ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।"

কে তাঁকে বোঝাবে আর কে বুঝবে? আরামকেদারায় বসে ঠাকুরের ভাব বোঝা যায় না। তিনি ভাবঘনমূর্তি ছিলেন। সেই ভাবের ভাবুক না হলে কে তাঁর ভাব ধরতে পারে?

আমি বলিলাম—রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, মাধবেন্দ্রপুরী, রূপ সনাতন, রামপ্রসাদ ইত্যাদি যত মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন—তাঁরা সকলেই দেব মূর্তি স্বীকার করতেন, কেহ কেহ সেবা পূজা করতেন—রবিবাবু বলতে চান—তাঁরা সকলেই রূপে বদ্ধ ছিলেন—তাঁরা কেহই শিবসুন্দর সত্যকে ধরতে পারেননি। কেননা ঠাকুরের এই ভাবকে কটাক্ষ করা মানেই তাই।

গিরিশবাবু—ঠাকুর সব ভাবের আধার ছিলেন। তাই তিনি সব ভাবের সাধনা করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান শাক্ত বৈষ্ণব সাকারবাদী নিরাকারবাদী সকলেই তাঁর অদ্ভুত ভাবে বিস্মিত হয়েছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়—অর্থাৎ সব ধর্মই সেই এক মহাশক্তির উপাসনা—সব ধর্মই সত্য—সব ধর্মেই তাঁকে পাওয়া যায়—এই মহাবাণীই এই যুগের যুগবাণী, India's message to the world—এই ই প্রেম ও শান্তির বাণী। জগতের ভাবী সভ্যতা এই মহাবাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিদ্রোহ, অবজ্ঞা, পরধর্মদ্বেষ—এযুগে টিকবে না। যিনিই হোন—হিন্দু, ব্রাহ্ম খ্রীস্টান, মুসলমান—সংকীর্ণ তার গণ্ডী ছেড়ে তাঁকে যেতে হবে—প্রেমে উদারতায় সবাইকে আলিঙ্গন করতে হবে। যিনি এই পরম প্রেমের জীবন্ত মূর্তিকে চিনতে পারেননি তিনি যিনিই হোন—সাধু হোন, কবি হোন, দার্শনিক হোন, রাজনীতিজ্ঞ হোন, যিনিই হোন—তিনি এই যুগের যথার্থ বাণী দিতে পারবেন না—জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে স্থায়ী দান করতে পারবেন না।

গিরিশবাবু নিস্তব্ধ হয়ে গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করলাম।